অন্তঃশীলা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
'পূর্ব্বাশা'র পক্ষে সত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্ব্বাচল রোড, হালতু, কলকাতা-৭৮

প্রচ্ছদ :
যামিনী রায়ের মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে

মুদ্রাকর :
প্রদ্যুৎকুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১এ, আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : ১৯৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৬

সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়. চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, তবে হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে . তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি, খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙ্গে যায়, ঘটনাটি তেমন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনের নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথায় ঢেউ, কোথাও বা আবর্ত, এই ত জীবন। মোহানা কোথায় ? এরই প্রতিচ্ছবি—না প্রতিচ্ছবি ঠিক না, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিষ্টের কাজ—অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ। কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলছে—কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে ? তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভ হয়, বড় বড় গাছ সেই স্রোতের টানে মাটির সংস্রব ছাড়ে, মহারথী তারই টানে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, লোকে নিন্দে করে, অন্যায় করে, আদত কথা, মিথ্যার মাটি ধুয়ে যায়। কেবল শোনা যায় কুলকুল শব্দ কুল কুল কুল···কুল—

[অন্তঃশীলা]

উৎসর্গ

মা

তোমার কাছে আমি কত ঋণী তা আমিই জানি। সে ঋণের পরিশোধ হয় না। তাই উৎসর্গকে স্বীকারোক্তি ভেবো।

১লা আষাঢ়, ১৩৪২ — খুকু

॥ ভূমিকা ॥

অন্তঃশীলার উৎস তার প্রথম অধ্যায়। সেটি 'এই জীবন' নামে গল্পের আকারে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি বন্ধুরা গল্পটির সম্ভাব্যতা লক্ষ্য ক'রে তাকে পূর্ণায়তন নভেলের আকার দিতে আমাকে প্রবুদ্ধ করেন। একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হ'ল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব! নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলা দেবীর প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এইখানেই শেষ হয় নি। আবর্ত্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে।

বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নূতনত্ব আমার রচনাভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য। কিন্তু অন্তঃশীলার রচনাকালে দেখলাম বীরবলী ভাষা এতই সচেতন যে তার সাহায্যে খগেনবাবুর মনের নিম্ন-চেতন অংশের খবর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। অন্য ধারে এও বুঝেছিলাম যে 'চেতনা স্রোতে' গা ভাসিয়ে দিলে স্বপ্ন রাজ্যের কিংবা বাতুলতার আঘাটায় হাজির হব। অতএব দুটিকেই কিছু অদল-বদল করতে বাধ্য হই। অন্তঃশীলার ভাষাকে বীরবলী ও তার ভঙ্গীকে প্রুস্তীয়ান বলা ঠিক চলে না। মনের যদি অন্ততঃপক্ষে দুটি স্তর থাকে—একটিতে শিক্ষার্জিত ধ্যান ধারণা প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়, আর অন্যটিতে জৈব প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব যদি বেশী হয়, এবং যদি একই মানুষের পক্ষে দুটি স্তরকে পৃথক রাখা অসম্ভব হয়, তবে ভাষা ও ভঙ্গী কিছু ভিন্ন হবেই। সেই সঙ্গে ইন্‌টেলেকচুয়ালিজিমের অসার্থকতা, অবাস্তবতা সব কিছুই প্রমাণিত হয়ে যায়।

অর্থাৎ অন্তঃশীলা আমি ভাবের বসে লিখিনি। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সে-সব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভেতর দিয়েই চালুই হয়ে এসেছে। এবং মন যখন প্রধানত লেখকের তখন লেখকের মনোভঙ্গী ও ভাষা কিছু পরিমাণে তার

সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিল থাবে। আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি মাত্র। এই লেন দেন সব লেখকই করে থাকেন, কেউ বেশী আর কেউ কম, কারুর হার উঁচু কারুর নীচু। ব্যাপারটা মোটেই গুহ্য নয়।

আমি 'বাক্'-এর কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ। এই নতুন সংস্করণ প্রকাশ ক'রে তাঁরা আমাকে নতুন সাহিত্যিক জীবন দান করলেন। বিষ্ণু দে ও বিমলাপ্রসাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব হত না।

১মে, ১৯৫৬ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোলকাতা

যখন করোনার সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে রায় দিলেন, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন', তখন খগেনবাবু সব কথা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। সাহেব চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন ; কিন্তু খগেনবাবু চেয়ারে বসেই রয়েছেন দেখে উকীলবাবু তাঁর জামা ধরে টানলেন, খগেনবাবুর মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল, 'ধন্যবাদ'। সাহেব দুঃখ জানিয়ে চলে যাবার পর উকীল মহাশয় তাঁকে বাইরে এনে ট্যাক্সীতে তুলে দিলেন। গাড়ি ছাড়বার পূর্বে তিনি খগেনবাবুকে তাঁর একটি ছোট্ট প্রাপ্যের কথা লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করাতে বাধ্য হলেন। পকেট থেকে একখানি নোট বার করে উকীল বাবুকে দেওয়াতে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, চিরকাল আদর্শ নিয়ে থাকলে চলেনা, খগেনবাবু, আমরাও যুবাবয়সে ঐ রকম ছিলাম। কি আর বলব, তবে যদি কখনও উপকারে আসি সত্যি কৃতজ্ঞ হব , ভুলবেন না, আমি ঐ কোণের চেয়ারেই বসি। লোকে যে যাই বলুক্‌গে, আপনি তোয়াক্কা করবেন না ; আমি অন্ততঃ আপনাকে বুঝেছি, আমি উকীল, পুলিশকোর্টে দশ বছর ঘুরছি, মানুষ চিনতে আর বাকি নেই। মেয়েমানুষ হিংসেতে সব করতে পারে কিন্তু ছেলের মা হতে পারে না, এই দেখুন না, পাঁচ পাঁচটি মেয়ে! হ্যাঁ, এই নিন, রায়টা, নচেৎ মড়া ছাড়বে না।' গাড়ি ছুটল মেডিক্যাল কলেজের দিকে।

বৌবাজার ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর কোণে ট্রাফিক্ পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দিলে। এঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ হতে লাগল। পাশে একটি রিকশ'র ওপর একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পায়ের কাছে একটা মস্ত মোট, খুব বড় সতরঞ্চি হবে। রিকশওয়ালা হাঁফাচ্ছে, সারবন্দী গাড়ি, গড়ের মাঠের দিকে ছুটবে। দেরী দেখে রিকশ'র ভদ্রলোক আলাপ জমাতে গেলেন, 'এই যে, খগেনবাবু! আজ খেলা দেখতে যাবেন না? আমি যাই না, কেবল ভিড় খাও আর পয়সা খরচ কর! ট্যাক্সীতে বসে সিগারেট খাবেন না।' খগেনবাবু সিগারেটটা উল্‌টে পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। ফাঁক দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, হাতটা ট্যাক্সীর বাইরে রাখলেন। কোথায় যেন এঁকে দেখেছেন মনে হল, হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে—ভদ্রলোক বিবাহাদি শুভ কার্যে বাড়ি সাজান ;

তাঁর শ্বশুর বাড়ির পরিচিত, তাঁরই বিবাহে প্যাণ্ডেল সাজিয়েছিলেন, বিবাহের পূর্বরাত্রে সামিয়ানা পুড়ে যায়, পরের দিন নতুন আসরের কোণে গোটাকয়েক পোড়া বাঁশ জড় করা ছিল মনে আছে। ভদ্রলোকের অত লোক্‌সান হওয়াতে পরে মাথা খারাপ হয়ে যায়, বিকারের খেয়ালে 'আগুন, আগুন, সিগারেট্' বলে চেঁচাতেন না কি! সামান্য সিগারেটে অত ক্ষতি। পুলিশম্যান বাঁশি বাজালে, ট্যাক্সীর মীটারে এর মধ্যে বার আনা উঠেছে। গাড়ি বেঁকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে এল। তাঁরও মাথা খারাপ হবে না কি! না, তাঁর কেন হবে? তিনি তিল মাত্র দোষ করেন নি।

সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ। এধারে ভাল মানুষ ছিল, বিবাহের কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত ত কোন গোলমাল হয়নি, তারপর; তারপর কোথা থেকে তার দল জুটল, একেবারে গলাগলি ভাব। মাসীমা প্রথম প্রথম আপত্তি করতেন, খগেনবাবুই বরঞ্চ বলতেন, 'কেন মাসীমা, রমলা দেবী রীতিমত শিক্ষিতা, তাঁর মত স্বাবলম্বী পুরুষে যদি হতে পারত!' মাসীমা বলতেন, 'শিক্ষার মুখে ছাই, শিক্ষা দিয়ে ভালবাসতে শেখে না, পরকে ভালবাসাতে শেখায়। মেয়েদের আবার স্বাবলম্বন! দেখিস্ তুই!' মাসীমা অল্প কথার মধ্যেই জ্ঞানের সঙ্গে ভবিষ্যদবাণী মিশিয়ে দিতেন। সেই মাসীমারও অপবাদ! তিনি কিনা তাঁর বোনপোর সব দোষ ঢাকতেন, আর তাঁর কিনা নিজের বাড়ির বৌ-এর ওপর জাত ক্রোধ! কারণ কি? বোনপোর সঙ্গে দেওরঝির বিয়ে দিতে পারলে দুদিক থেকেই সুবিধে হত, রাজত্যি করতে পারতেন, সেটা হয় নি! ছি, ছি,—মাসীমার দোষ ছিল কেবল ছেলেকে পশুর মতন ভালবাসা, তাঁর স্নেহ ছিল অন্ধ। তাঁর সাবিত্রীর বন্ধুদের মত উচ্চশিক্ষা ছিল না, ছিল হৃদয়। হৃদয়ের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল, স্বাবলম্বী হওয়ার অবকাশ না পেয়েও, পরকে ভালবেসেই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ। তিনি কেবল ভালবাসতেই জানতেন, প্রথমে ছেলেকে, ছেলে বই বোনপো কখনও ভাবেন নি, তারপর ছেলের বৌকে। তবে ছেলের বৌ-এর সে ভালবাসা পছন্দ হতো না, তাই মাসীমা চুপ করেই ভালবাসতেন. সাবিত্রীর কোন কাজে বাধা দিতেন না, বৌ-এর সংক্রান্ত সব ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন, বিশেষ কৌশলের সঙ্গে। সেই মাসিমাকে শেষে কাশীবাসী হতে হল! ও ধরণের স্ত্রীলোক লোপ পাচ্ছে, আজকাল সকলে স্বাধিকার প্রমত্ত, অথচ ক্ষমতা নেই। অন্ততঃ সাবিত্রীর ছিলনা, রমলা দেবী না হলে তার এক পা চলত না। যার ধর্ম তারে সাজে অন্যেরে লাঠি বাজে। মাসীমার মত স্ত্রীলোক সযত্নে,

স্ব-যত্নে, নিজেকে ভালবাসার সামগ্রী ক'রে তোলে না, নানাপ্রকার মনোহারী সাজসজ্জার দ্বারা। আর সাবিত্রী ও তার বন্ধুরা, রমলা দেবীও! দামী সাড়ী, সেঁটে পরা, হাতকাটা ব্লাউস, ঢিলে খোঁপা, চোখে সুর্মা, পায়ে নাগ্‌রা, তাদের হৃদয় কোথায়? হৃদয় হয়ত আছে, তবে হিংসায় পোরা, মাৎসর্যে ভর্তি। এ শিক্ষার মুখে ছাই!

রমলা দেবী ছিলেন আধুনিক মহিলা। মাসিক-পত্রিকার মহিলা-প্রশস্তিতে বোধহয় তাঁর ফোটোও বেরিয়েছিল। এক কাপি ছিল সাবিত্রীর কাছে, কোণে বাঁকা ক'রে গোটা অক্ষরে লেখা ছিল, 'রমা'। ফোটো তোলবার সময় কায়দা করে দাঁড়ালে বিশ্রী দেখায় সকলকে, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে। ছবিটাতে রমলা দেবীকে খুব বিশ্রী দেখায় নি—তবে, সাবিত্রীর জন্য বলতে হত খুব ভাল হয় নি। অবশ্য মতগোপনের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। সাবিত্রী চাইত খগেনবাবু তার বন্ধুর সঙ্গে মেশেন, ঠিক মেশেন না, অল্প মিশেই সুখ্যাতি ও তারিফ করেন, সাবিত্রীকে আরো বেশী ক'রে মিশতে দেন। কিন্তু রমলা দেবীকে তাঁর বিশেষ ভাল লাগত না খগেনবাবু বরাবরই বলে এসেছেন। পুরুষত্ব ও দম্ভের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই মনেই হত না যে রমলা দেবী স্ত্রীজাতি, সাবিত্রী-জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ জীব। রমলা দেবীর বিপক্ষে এক আকৃতি ছাড়া বোধ হয় অন্য আপত্তি তাঁর বিশেষ ছিল না। তাঁকে দেখলেই খগেনবাবুর বুদ্ধি জাগ্রত হত, কদমফুলের রোঁয়ার মত, কিন্তু সাজসজ্জা দেখে সে প্রবৃত্তি আবার নিবৃত্ত হত, মন তাঁর কুঁকড়ে যেত। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করত, 'রমাদিকে দেখতে পার না কেন তুমি? আমার বন্ধু বলে, আমাকে ভালবাসে বলে?' খগেনবাবু উত্তর দিতেন, 'তোমার রমাদি স্ত্রীলোক নন্ পুরুষ, তাঁর দেহ ও মন বিপরীতধর্মী, ওঁর দেহগত কোন আকর্ষণ নেই আমার কাছে, ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে, প্রেম চলে না, ওঁকে শ্রদ্ধা করা যায় দূরে থেকে, ওঁর জন্যে পাগল হওয়া যায় না।' 'তবু ভাল, শ্রদ্ধা করা যায় বলছ!' 'হয়ত' যায়। ওঁর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটি মন্দ লাগে না, কিন্তু আধারের সঙ্গে আধেয়ের সম্বন্ধ নেই, সামঞ্জস্য নেই। ভগবান কি ভুলই করেছেন!' 'তোমার কাছে সবই ভুল, সবই উলটো পালটা!' 'আমার কাছে কেন? কাকে ওলট পালট বল? যেটি তোমার তৈরী, তোমারই বাঞ্ছিত রীতি, তারই বিপরীত কাজকে কোন্ অধিকারে ওলট পালট বল? শারীরিক চিহ্নের জন্য মেয়েদের মেয়ে মানুষ বলতে হবে? আমি পুরুষ ও স্ত্রীর দেহগত প্রভেদকে প্রধান করি না, চরিত্রগত প্রভেদকেই স্বীকার করি, কেউ বহির্মুখী,

কেউ অন্তর্মুখী, কেউ কড়ি, কেউ কোমল, পুরুষ-স্ত্রীর গঠননির্বিশেষে। রমলা দেবীর চরিত্রে যে বস্তুটি পাই সেটি পুরুষের সহজ শক্তি, স্ত্রীসুলভ খামখেয়াল নয়, যেটি তোমাকে অত লোভনীয় ক'রে তুলেছে।' সাবিত্রী হেসেছিল, কি বুঝে কি জানি! হয়ত সাবিত্রী বুঝতেই পারেনি যে খগেনবাবু নিজের চরিত্রগত কোন অভাব রমলা দেবীর চরিত্রে পূরণ হয়েছিল সন্দেহ করেই তিনি রমলা দেবীকে পছন্দ করতেন না, রমলা দেবীর উপর রাগতেন। রমা দেবী খগেনবাবুকে তাঁর অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, সাবিত্রী দিত দুর্বলতার কথা, সামাজিক কর্তব্যের কথা। আজ—আজ একটি স্মারক-লিপি ধুয়ে পুঁছে গেল। রইল বাকি নিজের অসম্পূর্ণতা, আর আফশোষ, বনাম ঘৃণার জের, সম্পূর্ণতার আকাঙ্খা। Ambivalence ভেঙ্গে যায় নাকি? পরমাণু বিভক্ত হলে যে শক্তি নির্গত হয় তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৌচির হয়ে যেতে পারে। ভাবতে ভয় হয়। পরিষ্কার ভাবে দেখাই অন্যায়; ঘোলাটে অবস্থাতেই সোয়াস্তি। ঘৃণা বরং ভাল, চিন্তার চেয়ে; ঘৃণা করা সহজ, সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখা শক্ত।

ট্যাক্সী মর্গের সামনে এল। ভাড়া চুকিয়ে খগেনবাবু নেমে পড়লেন! অঙ্গনে দুটি পাহারাওয়ালা, আর অনেকগুলি মোটর রয়েছে। সকলেরই কি এক দশা, এক ভাগ্য? গাড়ি নিশ্চয়ই ডাক্তারদের। একটি তার মধ্যে যেন পরিচিত। কিছুদিন পূর্বে ঐ ধরণের শেভ্রলে কিনলেন রমলা দেবী। সাবিত্রী নতুন গাড়ী চড়ে বেড়াতে গেল। বেড়িয়ে ফেরবার পর খগেনবাবু লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর চোখে সুর্মা, গালে ও ঠোঁটে রং, পরণে লাল ডগ্‌ডগে শাড়ি, শাড়িটা নিশ্চয়ই রমলা দেবীর। একবার রমলা দেবী ঐ শাড়ি পরে কোলকাতা সহরে আগুন লাগাতে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে রং ঢাক ফুলের রং-এর মত তীব্র: রমলা দেবীকে মন্দ দেখাচ্ছিল না! শীতের পর নির্জলা দেশের দিগন্তব্যাপী মাঠে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে, তারই একটি লেলিহান শিখা যেন মূর্তি নিয়েছে, সহরের মধ্যে, এই টুকুই অশোভনতা। খগেন বাবু ঘোর রং পছন্দ করতেন না, এবং সাবিত্রীর ঐ রকম সাজসজ্জার উগ্রতা তাঁকে পীড়া দিত। অযথা অনুকরণে সাবিত্রীর রুচিবিকার ঘটছে দেখে তিনি বরাবরই প্রতিবাদ করতেন, ফল হত না। এবার প্রতিবাদ করেছিলেন রমলা দেবীর সম্মুখেই। সাবিত্রীর কাছে উত্তর পান, 'তোমরা যখন মাছরাঙ্গা পাখী সেজে টেনিস খেলতে যাও, তার বেলা?' খগেনবাবু উত্তর করেন, 'কৈ আমার

'ব্লেজার নেই ত ?' জবাব পান, 'তোমার নেই বটে, কিন্তু তোমাদের থাকে, বিজনের দুটো তিনটে আছে। তুমি মিশুক নও, নিজের খেয়াল নিয়েই থাক, আপনভোলা শিবঠাকুর। যারা লোকজনের সঙ্গে মেশে তাদের ব্লেজার থাকে। তুমি নিজের সম্বন্ধে কেয়ারলেস বলে আমিও তাই হব ?' রমলা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, বাঁকা হাসি হেসে বলেন, 'আপনি সত্যিই সাবিত্রীকে ভালবাসেন, নিজের মত ক'রে গড়তে চান।' রমলা দেবীর হাসিমুখের মন্তব্যকে শ্লেষ ভেবে খগেনবাবু চুপ ক'রে যান, সাবিত্রীর ইঙ্গিতে রমলা দেবীকে বাড়িতে পদার্পণ করতে অনুরোধ করেন, রমলা দেবী গাড়ি থেকে নামেননি। সে রাত্রি কত মান অভিমানের পালা হল! আজ রমলা দেবী মোটর চড়ে এসেছেন তাঁর মৃত বন্ধুর দেহের প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করতে, খৃষ্টান হলে যেমন মালা নিয়ে যেতেন গোরস্থানে। পরনে সাদা শাড়ি, কাল শাড়ি পরলেই মানাত'। এ দুদিন খুবই করেছেন অবশ্য, কিন্তু আজ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করা উচিত হয়নি। আজ সাবিত্রীর সঙ্গে খগেনবাবুর অনেক কথা কইবার প্রয়োজন ছিল। আজ ভেবে-ছিলেন তিনি অনেক প্রাণের কথা কইবেন, মনে মনে তার সঙ্গে, কিন্তু গাড়িটা দেখেই তাঁর মন কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। আজ ওঁর আসবার দরকার ছিল না, আসাটা তাঁর অন্যায় হয়েছে। সাবিত্রীর বন্ধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেছিলেন আজও কি তাকে অপসৃত করার সুযোগ মিলবে না! ব্যবধান! ব্যবধান আবার কি ? সবই একটানা স্রোত। কার মধ্যে ব্যবধান ? কে সরায় ? রমলা দেবী ব্যবধান এনেছিলেন, না, সাবিত্রী আত্মহত্যা ক'রে খগেনবাবু ও তাঁর জগতের মধ্যের ব্যবধানটি স'রিয়ে দিলে ? এইবার তিনি পরিষ্কার দৃষ্টিতে সব বুঝতে পারবেন।

মর্গের মধ্যে কনকনে হাওয়া। চারধারে কাচের আলমারি, সর্বত্র সাদা পাথরের টেবিল, পায়াগুলো পর্যন্ত সাদা; একটার চারপাশে ডাক্তার ও ছাত্রের দল, সাদা ওভারঅল পরা, ডাক্তারের হাতে সাদা রবারের দস্তানা, ছাত্রদের মুখে একত্রে ব্যস্ততা ও অতিরিক্ত গাম্ভীর্য; সব মুখ বুজে কাজ করছে। ডাক্তার সাহেব খগেনবাবুকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। করোনারের রায় দেখে ডাক্তারসাহেব অ্যাসিষ্টাণ্টকে বল্লেন, 'মল্লিক, পাঁচ নম্বরের লাস খালাস হল, ছেলেদের তাহলে ছুটি, আবার এলে দেখা যাবে।' হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ডাক্তার সাহেব দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। পাশের একটা গা-আলমারী থেকে ডালা বেরিয়ে এল, পা দুটো হলদে, বাকী অঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢাকা, পায়ে সেই ছেলে

বয়সে গরম দুধ পড়ে যাওয়ার দাগ। একজন সিনীয়ার ছাত্র এগিয়ে এসে বল্লেন, 'লোকজন এনেছেন, না আমাদের সমিতিকে খবর দেব? পাঁচ টাকা চাঁদা দিলেই হবে।' পিছন থেকে একজন মহিলা—রমলা দেবী এগিয়ে এসে বল্লেন, 'না, প্রয়োজন নেই, আপনি গাড়িটা নিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনুন। চলুন, আমি না হয় যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।' 'না আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি একলাই নিয়ে আসছি।' খগেনবাবুর সঙ্গে রমলা দেবী বাইরে এলেন। 'লোকজন কোথায় পাবেন?' 'লোকজন, আচ্ছা, কজন চাই? আমার সব বন্ধুরা, কিন্তু—' 'তাদের খবর পরে দিলেই হবে, পরে তাঁরা খবর পেলেই চলবে, আমার সঙ্গে আসুন।' রমলা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে খগেনবাবু আপত্তি করলেন না; লোকই বা তিনি কোথায় পাবেন? বাইরে এসে খগেনবাবু গাড়িতে উঠলেন, সামনের সীটে নয়, রমলা দেবীর পাশে!

কি রকম অস্বস্তি হচ্ছিল, অথচ মজার, পরিহাসের। তিনি একবার সাবিত্রীর অপরিচিতা এক বন্ধুপত্নীকে বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যান, ট্যাক্সীতে যখন তাঁকে নিয়ে ফিরছেন তখন সাবিত্রীর একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়! সেই সামান্য ঘটনা থেকে কত না গণ্ডগোল হল; সাবিত্রী বলেছিল, 'কৈ, কোন্ সমাজে কোন্ পুরুষ অন্যের স্ত্রীকে স্বামীর অবর্তমানে থিয়েটার বায়স্কোপ পাশে বসিয়ে দেখাতে নিয়ে যায়?' সাবিত্রীর ভিন্ন-সমাজ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখে খগেনবাবু চমৎকৃত হন, চুপ করেই থাকেন। খগেনবাবু বিলেত ফেরৎ ছিলেন না, বিদেশী-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর পরোক্ষ অভিজ্ঞতা নভেল নাটক থেকেই আহৃত। হয়ত' সাবিত্রী রমলা দেবীর কাছ থেকেই শিখেছিল। রমলা দেবী উচ্চ শিক্ষিতা, বিলেত ফেরৎ সমাজে তাঁর অবাধ গতিবিধি, রুচিও তাঁর মার্জিত হয়েছিল, বোধ হয় জেন অষ্টেন পড়ে। আজ সেই রমলা দেবীর পাশে বসে চলেছেন, তবে বায়স্কোপ দেখাতে নয়, শবযাত্রার যোগাড় করতে। আনন্দ উপভোগের নিয়ম থেকে নিরানন্দ উৎসবের রীতি একটু ভিন্ন হবে বৈ কি!

গাড়ির এক কোণে খগেনবাবু যেন আলগোছে বসে রইলেন, দৃষ্টি তাঁর রাস্তার দিকে। পূর্ববঙ্গীয়দের জামা-কাপড়ের দোকান অতিক্রম ক'রে গাড়ি মির্জাপুরের এক গলিতে প্রবেশ করল। মোড়ের মাথায় একটি গান্ধীটুপী পরা ছেলে আনন্দবাজার বিক্রী করছিল। সকালের কাগজ পড়া হয় নি। কেনবার ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সাহস ছিল না, পাছে নিজের খবর নিজেকে পড়তে হয়। রমলা দেবী নিজের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন, খগেনবাবু নামলেন না।

খানিক পরে, রমলা দেবীর ফিরতে দেরী হবে ভেবে, তিনি মোড়ের ওপর এক চায়ের দোকানে এক কাপ চা তাড়াতাড়ি তৈরী করতে অর্ডার দেবার জন্য নামলেন। পাছে চা-এর নেশা রমলা দেবীর কাছে এই সময় বিসদৃশ ঠেকে এই লজ্জায় ডিশে ঢেলে অল্প সময়ের মধ্যেই চা-এর বাটি নিঃশেষ করলেন ; একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হতেই দেখলেন জন কয়েক সুদর্শন যুবক নেটের গেঞ্জী পরে, কাঁধে টার্কিস তোয়ালে ফেলে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ; নিমন্ত্রণ বাড়ির মেয়ে খাওয়ানর দিন তেতলায় ছাদের কোণে কর্মের অপেক্ষায় যেমন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। বেচারিরা ম্যাচ দেখতে যেতে পায় নি! রমলা দেবী একজনকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, 'বিজন, সুজন কোথায় গেল?' 'সুজনদা খাট নিয়ে আসছে।' রমলা দেবী ভেতর থেকে একটা ফরসা তোয়ালে জড়ান ধুতি এনে বিজনের হাতে দিলেন। একটি ছেলে, সুজন, মুটের মাথায় করে একটা খাট নিয়ে এল। হাল্‌কা জারুল কাঠ, দড়িগুলোর মধ্যে বড় ফাঁক ফাঁক। রমলা দেবী বল্লেন, 'আচ্ছা, সুজন, আর দেরী ক'রো না, খগেনবাবুর শরীর ভাল নয়। ওঁকে এখানেই নিয়ে এস।' 'বিজন তুমি বাড়ি যাও,' 'যাচ্ছি, সুজনদা। তোমার কাছে থাকি, রমাদি' 'থাক' 'বিমল, তুমি গাড়িতে ওঠ।' গাড়িতে চারজন যুবক উঠলেন। ছাড়বার সময় রমলা দেবী বিমলের হাতে কি একটা দিলেন। সুজন ও অন্য তিনজন খাট নিয়ে হেঁটে চল্‌ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মর্গের দরজায় উপস্থিত হল। বিমল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল, শেষে খগেনবাবু নামলেন। ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন, 'করোনারের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, আপনারাই বার করুন না?' 'আগে খাট আসুক' 'ততক্ষণ?' 'এখনি এসে পড়বে; ততক্ষণ আর কি করা যায়, কলেজের রেস্তরাঁতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, আপনিও আসুন, কিছু খেয়ে নিন, ভাল খাবার দেয়, ভেজাল দেবার জো নেই; এটা বেলগেছেও নয়, বাজারও নয়।' খগেনবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লেন 'বেশ ত' বেশ ত' চলুন না'। নিজের অজানিতে পকেটে হাত দিচ্ছেন দেখে একজন যুবক বল্লেন, 'আপনি থাকুন, আপনার শরীর খারাপ, আমরা এখনি আসছি।' 'ছেড়ে যাওয়াও উচিত হবে না বোধহয়'—ব'লে খগেনবাবু সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

যুবকবৃন্দ চলে গেলে খগেনবাবু আজ এই প্রথম একলা হলেন। একলা তিনি মনে মনে বহুদিনই হয়েছিলেন। হয়ত, জন্মেছিলেন ভীষণ একলা হয়ে, যমজ আত্মার একটি হয়ে নয়। মনে কেউ যমজ হয় না, দেহেই হয়। কবিরা কি ভীষণ

মিথ্যাকথাই না লিখতে পারেন! সেই মিথ্যাকথার জন্য কত লোকের সর্বনাশ হয়েছে যদি তাঁরা জানতেন, তা হলে তাঁরা……কি লেখা ছেড়ে দিতেন? কখনই নয়। তাঁরা নিতান্ত অ-সামাজিক, সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁরা বিনিদ্র নন। কেবল সমাজের কাছে সুখ্যাতি প্রশংসা করেন এইটুকু তাঁদের দোষ। মানুষ হল একলা, সজারুর মত সে থাকে গর্তের মধ্যে; গর্তের মুখে কত পাতা কত কুটো দিয়ে সে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করছে, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে। গর্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করল, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, ঐ বুঝি এল! এক নিঝুম গোধূলিতে সে বেরিয়ে পড়ল খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তার পা আর চলে না, গর্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায় না, ছুটোছুটি করে; কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে! আবার ভিতরে ছুটে যাওয়া, আবার—আবার ভয়ে বাইরে আসা, ক্ষুধার তাড়নায়। সেই বাইরে আসতেই হয়, সেই ঝমর্ ঝমর্ শব্দ সারাদেহ বেষ্টন ক'রে বাজতে থাকে, বাগানের কাঁটাবেড়ার কোন এক ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, মূল উপড়ে খেতেই হয়। কপালগুণে ফিরে আসে নিজ আবাসে, সেখানে সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্তরীণ-বাস; কপালদোষে আর ফিরে আসতে হয় না, বাগানের মালী কলাগাছের তেড়্ ছুঁড়ে তাকে মারে, কাঁটা গুটিয়ে নেবার পূর্বেই আটকে যায়, পালান তখন অসম্ভব তখন আবার সেই অন্ধকার! এই-ত' প্রকৃতির নিয়ম, এই বোধ হয় জীবন! মানুষের, বুদ্ধিমান মানুষের প্রকৃতিও এই নিয়মে আবদ্ধ, পার্থক্য শুধু মালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপনের আত্ম-প্রবঞ্চনায়, পার্থক্য কেবল কাঁটার ওপর সামাজিকতার নরম আভরণে। মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার; মানুষ সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মানবমাতা। অথচ, এই অন্ধকারের মধ্যে এক সহযাত্রী জুটল। নিজেই পথ পায় না আবার পথ দেখাতে হবে অন্যকে; সে আবার অন্য পথ খুঁজতে ব্যগ্র নয়, কেবল, নিছক নির্ভরশীলা, অর্থাৎ পথের কণ্টক। নিজেই এই গুহার মধ্যে ভয়েতে কাঁপছে, প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে, তার উপর এই গুহাবাসিনী, অন্ধকার-ধর্মিনীর দেহ, মন ও আত্মার কল্যাণ-কামনা করা! তাও যদি মন কিংবা আত্মা রয়েছে প্রমাণ পাওয়া যেত! আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে! তাও ডাকা যেত যদি তার অস্তিত্বেই শঙ্করীর ভয় দূর হত'। কেবল অস্তিত্বে হবে না, উপস্থিতি, হাজরী চাই, তারও বেশী, সান্নিধ্য। মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, সে আবার পরের ভাবনা ভাববে! কী ভীষণভাবে মানুষ ব্যস্ত! সঙ্গিনীর

পরিতোষবিধানের জন্য নয়, আরো আদিম, আরো দুর্নিবার যে প্রবৃত্তি সেই ভীতি দূর করতেই সে গুহার গায়ে ছবি আঁকছে, সেই দুরন্ত প্রকৃতির পরিতোষ-বিধান করতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করছে ; সে আবার পরের তৃপ্তিসাধন করবে কখন ও কতটুকু ? পারে না, শক্তির সীমা আছে সেইজন্যই পারে না, আর নিন্দে হয়, নিন্দে হয় জনসাধারণের কাছে। তাঁরা থাকেন হয়ত' গুহার বাইরে, গাছের ডালপালায়, অন্যান্য সামাজিক জীবজন্তুর মতন ; কিংবা থাকেন ফলের রসশোষণ করবার জন্য, ভেতরটা ভুয়ো, অন্তঃসারশূন্য ক'রে দেবার জন্য ; কিংবা তাঁরা পরাগ ছড়াবার জন্য ফুলে ফুলে মধু খেতেই ব্যস্ত। এঁদের উপদেশেই সাবিত্রী গুটি কেটে প্রজাপতি হয়েছিল। তাইত' এই অঘটন ঘটল। সাবিত্রী স্বধর্মেই যদি আত্মনিধন করত তা হলে কোন আপত্তি ছিল। পিনএ আটকান মরা প্রজা-পতি হওয়ার চেয়ে মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশী সামাজিক কাজ। খাট এল, শব নামান হল, খগেনবাবুকে শবের কপালে সিঁদুর পরাতে হল, সরু ক'রে পরাতে পারলেন না। মুখটা নীল, পা হলদে, পায়ের শিরগুলো নীল হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। কী ঠাণ্ডা! এক বিঘৎ ওপর থেকেই ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। সুজন নিজেই পায়ে আলতা পরিয়ে দিলে। এরা সব শিখলে কোথা থেকে? উল্‌টো মুখ ক'রে খাটে চড়ান হল। রঙিন বিস্রস্ত শাড়ির ওপর সুজন একটি খদ্দরের চাদর বিছিয়ে দিলে। ভৌতিক ক্রীড়ার মতন যেন সব আপ্‌না থেকেই হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবীর আত্মীয়স্বজন সব তাঁরই মত কর্মতৎপর। খাটটা কাঁধে তোলবার সময় মুণ্ডুটা নড়নড় ক'রে উঠল। একজন বাহক বলে উঠলেন, 'দোহাই মা জেগে উঠবেন না।' অগ্রবর্তী বাহকদের মধ্যে একজন ধমক দিলেন, 'কি ইয়ারকি কচ্ছিস্! সিগারেট নে—হরিবোল বলতে নেই জানিস্ ত'। খগেনবাবু কাঁধ দেন নি, তাই তাড়াতাড়ি দোকান থেকে একটিন সিগারেট কিনতে গেলেন। সুজন সঙ্গে গেল, নিজেই টিন কিন্‌লে। কি রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন গলাটা বন্ধ হয়ে আসছে। রসিকতা না করলেই চলত'! হরিবোলে আপত্তি কি? হরিবোলের আওয়াজটা যে মধুর তাও নয়, শুনলে ছেলেবেলা লেপমুড়ি দিতেন, বড় হবার সঙ্গে সে ভয়টা যায় নি, মনে হত' নীচু জাতেই হরিনাম নেয়, নামকীর্তন করে, ভদ্রলোক হয় শাক্ত, না হয় বৈদান্তিক, হয় ব্রাহ্ম, না হয় অবিশ্বাসী। কিন্তু হরিবোল বলতে নেই—এ যেন মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! যারা আত্মহত্যা করে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেই জন্য বোধহয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী শববাহিরা তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা-

করেন না। বিশ্বাসীদের ঈশ্বর বড়ই ছোট, প্রতিহিংসাপরায়ণ। নেটের গেঞ্জী, কাঁধের তোয়ালে, কেশের পশ্চাদভিমুখিনতা লক্ষ্য করলে মনেও হয় না যে এরা সকলেই বিশ্বাসী। এ যুগে কেই বা বিশ্বাসী? বিশ্বাসী কেউ হতে পারে না, বিশ্বাস বড় বোঝা। কাঁধ কি তাঁকে দিতেই হবে? না দিলে বড খারাপ দেখায়। দায় তাঁর, এদের নয়। না দিলে অশোভন দেখায়, রমলা দেবীর কানে উঠবে, নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করবেন তাঁকে নিয়ে, গোপনে এঁদের কাছে। জীবিত অবস্থায় স্ত্রীবহন, আবার মৃতস্ত্রীর শববহন, দুই কাজই কি রমলা দেবীর ইচ্ছায় করতে হবে না কি? সুজনের হাত থেকে টিনটা নিয়ে, খুলে, দ্রুতপায়ে, এক রকম ছুটতে ছুটতেই খগেনবাবু শবযাত্রীদের নাগাল ধরলেন। কর্তব্য বোধে তাঁদের সাহায্য করতে গেলেন, কাঁধ দিলেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, কাঁধে ব্যথা উঠল; খাটটা ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করছিল, ভয় হল এই বুঝি তাঁরই দোষে ভেঙ্গে পড়বে রাস্তার ওপর। কাতরভাবে চাইতেই সুজন এগিয়ে এল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে?' 'না, কষ্ট আর কি?' 'আপনি ছেড়ে দিন।' খগেনবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সুজনের মুখের হাঁসিটা বিদ্রূপের? না, স্বাভাবিক। পা-এর তলা জ্বালা করছিল, রাস্তার কলে হাত পা ও মুখ ধুয়ে নিলেন। বীড্‌ন স্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর পার হয়ে নিমতলায় পড়লেন। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে কি একটা রহস্য আছে, ডাক্তারের বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে কাঠের দোকান, মাল্‌সার দোকান পর্যন্ত সবই আছে এখানে, প্রত্যেক জিনিষটাই যেন শেষ মুহূর্তকে এগিয়ে আনছে। এ রাস্তায় বুড়োবুড়ি ভিন্ন অন্যলোক সহজে চোখে পড়ে না. বাকী সব হিন্দুস্থানী, মুস্‌কো মুস্‌কো দুষমনের মত চেহারা, বোধহয় চ্যারণের বংশধর মাঝিমাল্লা না হয়ে চিতের চালাকাঠ কাটে। নিমতলার ঘাটের এক অদ্ভুত ব্যস্ততা। আলো সতেজ জ্বলছে, কিন্তু গঙ্গাবক্ষের অন্ধকারে যেন আঘাত পেয়ে ফিরে আসছে; লোকজন শ্রমাবসানের আগেই শ্রান্তির আশায় যেন ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু শ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রত্যাখ্যানের খবর কেউ পায় না—না পাওয়ার নামই আশা। মুটে মজুর ছুটির আধঘণ্টা পূর্বে ভূতের মত খাটে, ক্ষিপ্র হয়, তার পর বাঁশী বাজল, আর মোড়ে মোড়ে তাড়ির দোকানে প্রবেশ! চমৎকার! তাড়ি না হলে চলেই না তাদের। কিন্তু জীবনটাকে যারা কলে পরিণত করে না, যাদের শক্তির অবশিষ্ট কিছু থাকে, তারা বরাবর বাড়ি চলে যায়, স্ত্রীপুত্রের কাছে। সেখানে শক্তি নিঃসাড়ে নিঃশেষিত হয়······সুজন ছেলেটি হাঁফাচ্ছে না।······ছুটছে······নড়ছে······ঘাট

এসেছে। খাট নামিয়ে সুজন কনেষ্টবলের সঙ্গে অফিসের দিকে গেল, খগেনবাবুর কাছে করোনারের রায়টি চেয়ে নিয়ে। অন্যান্য যুবকেরা খাট ছুঁয়ে বসে থাকতে তাঁকে অনুরোধ ক'রে একে একে অদৃশ্য হলেন। খগেনবাবু গোটাকয়েক সিগারেট রেখে টিনটা তাঁদের হাতে দিলেন।

'শবের মুখে পাংশুতা ভেদ ক'রে কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। মুখের এই কমনীয়তা ছিল সাবিত্রীর প্রধান আকর্ষণ। (এই শান্ত ও গম্ভীর মধুরিমায় সকলে মুগ্ধ হতেন)। ব্রাহ্মরা বলতেন, 'কি মিষ্টি', গিন্নীরা বলতেন 'কচিকচি', পুরুষরা বলতেন 'লাবণ্য'। খগেনবাবুর খরদৃষ্টিতে সাবিত্রীর যে প্রকৃতিটা ধরা পড়েছিল সেটি রূপে বিশুদ্ধ লাবণ্যময়ী ছিল না; তার ধাতু ছিল খানিকটা লোহা, খানিকটা সর্বসাধারণের সন্তোষবিধানের জন্য প্রচেষ্টার খাদ। এবং সে রূপের ওপর পড়েছিল অন্যের প্রকৃতির ছাপ, অর্থাৎ অনুকরণ। মুখের ওপর, বিশেষতঃ চোখে, একটা ভয়ের চিহ্ন থাকত', সেটা লক্ষ্য করে সাবিত্রীকে ক'বে কে একবার 'বনের হরিণ' বলেছিল, সাবিত্রীর মুখেই শুনেছিলেন। আজ সেটা পরিস্ফুট হয়েছে, ঠিক যেন মরা হরিণ। কিসের ভয়? হরিণের, আদুরে পোষা খরগোসের সন্দিগ্ধচিত্ততার, না মৃত্যুর মতন সত্যের সামনা-সামনি দাঁড়াবার? ভয়ে যেন সব ঢিলে হয়ে গিয়েছে। হাতের চুড়িটা ঢলঢলে হয়েছে, গলার হারটা উলটে গিয়েছে। একদিন না খেলেই রোগা হয়ে যেত, বেচারি দুদিন খায়নি। খগেনবাবু ধীরে ধীরে হারটা গুছিয়ে সোজা ক'রে দিলেন। এই হার নিয়ে একবার কত দীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাঁদের মধ্যে! সাবিত্রী বলেছিল, 'আমি হারটা পরলে সকলে বলে সুন্দর দেখাচ্ছে, তুমি ত' মুখ ফুটে একবারও ভাল দেখাচ্ছে বল না', খগেনবাবু উত্তর করেন, 'তোমাকে না প'রেই ভাল দেখায় কিনা, তাই বলিনা।' সাবিত্রী হঠাৎ রাগ ক'রে হারটা গলা থেকে টেনে খুলে ফেলে, আটকাবার পিনটা খারাপ হয়ে যায়, খগেনবাবু সারিয়ে দেবার জন্য পরের দিন নিজেই স্যাকরা ডাকেন। বাড়ীতে স্যাকরা এলে শোনেন, গহনাটা রমলা দেবীর নিজের পরিচিত ও আশ্রিত অন্য এক দোকানে ইতিমধ্যে নিজেই দিয়ে এসেছেন। খগেনবাবু অভিমানের ভান করেন; উত্তরে সাবিত্রীর মুখ থেকে এক অদ্ভুত জবাব পান, 'পরের বৌ-এর গয়না ভেঙ্গে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, নতুন গয়না গড়িয়ে দাওগে, আমার জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না।' খগেনবাবুর এক বন্ধুপত্নীর কোন এক গহনা খারাপ হয়ে যায়, পথে স্যাকরা-বাড়ি পড়ে, তাই গহনাটা স্যাকরা-বাড়ি পৌঁছে দেন, স্যাকরাটি রমলা দেবীরই আশ্রিত লোক। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়। ঘটনাটি মনে

পড়তেই খগেনবাবু উঠে পড়লেন। পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে! সুজনবাবু কোথায় গেলেন? খগেনবাবু সাবিত্রীর মুখ আড়াল করে দাঁড়ালেন। আচ্ছা ভদ্রলোক ত'! এই সমাজে মেয়েদের মুখ খুলে নিমতলায় নিয়ে যাবার উপায় নেই···। লোকটার ঠোঁট ভীষণ পুরু, হাতে পানের বোঁটায় চুণ, চোখের কোল মিশ্ কালা, খুব লম্বা কাল চুলের গোছা একটি চোখের ওপর এসে পড়েছে, বাকি চোখে জ্যোতি নেই। সব যেন তার ঘুমন্ত। কী দেখছে? অসভ্য ছোক্‌রা। খগেনবাবু তার চোখের দিকে এক দৃষ্টে চাইতে মুখ ফিরিয়ে নিলে। খগেনবাবু আবার বসলেন, খাটের এক কোণে, সাবিত্রীর মুখ আড়াল ক'রে। ভয় হল খাট ভেঙ্গে যাবে, নেমে উবু হয়ে মাটিতে বসলেন, খাট ছুঁতে ভুলে গেলেন। মনে হল লোকটি আর নেই সেখানে, দেখার প্রবৃত্তি ছিল না। নিশ্চয়ই কোকেন খায়, ভদ্রলোকের ছেলে তাই অত শঙ্কিত দৃষ্টি, 'শ্মশানচারীর মত খরদৃষ্টি নয়।' সাবিত্রীরও ঐ রকম শঙ্কিত দৃষ্টি কখনও কখনও তিনি লক্ষ্য করেছেন—কেন কে জানে? তাকে যেন কে যাদু করেছিল। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা কত বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র জানে, কিন্তু সে ত' পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ছিল না, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ঘৃণাই করত, তার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই সহুরে, হাল ফ্যাসানের ও এদেশের উচ্চশিক্ষিতা, অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিতা। কী আশ্চর্য! সাবিত্রী বেশীদূর পর্যন্ত স্কুলে পড়েনি, তবু সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। একজন খগেনবাবুকে মুখের ওপরই বলেছিলেন, 'আপনি পাসেরই কদর করেন, কিন্তু দেখুন দেখি সাবিত্রীকে, কলেজে পড়েনি দেখলে বোঝা যায়?' খগেনবাবু উত্তর দেন, 'সবই আপনাদের আশীর্বাদে।' সাবিত্রীর বন্ধুরা বুঝতেই পারতেন না কখন খগেনবাবু কি ভাবে কথা বলছেন, সেই জন্য তাঁরা খগেনবাবুকে সাবিত্রীর সামনে 'বিদ্বান, অতিশয় বুদ্ধিমান, আদর্শবাদী' ব'লে সুখ্যাতি করতেন, এবং দূরে স'রে যেতেন। সেই রাত্রে খগেনবাবু সাবিত্রীকে বলেন, ('তোমাকে ওঁরা অমন পেট্রনাইজ করেন সহ্য কর কেমন ক'রে? নিজেরা বেশ পাস্‌টাস ক'রে কাজ গুছিয়ে নিয়ে, অন্যের প্রতি যারা পাস করেনি তাদের ওপর অনুকম্পা সকলেই দেখাতে পারে। নিজেদের জন্য পয়সা, প্রতিপত্তি, অধিকার, আর গরীব মজুরদের জন্য গির্জা ও ধর্মের সান্ত্বনা, সতী সাবিত্রীর তুলনা, আমার ভারী রাগ হয়।') সাবিত্রী রাগটাকে হিংসাই বলেছিল। খগেনবাবু নামে আপত্তি জানান, সে আপত্তি নামঞ্জুর হয়। পূর্ব হতেই তিনি অন্য দুএকটি ঐ রকম গুণের অধিকারী বলে সুনাম অর্জন করে-ছিলেন, তাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি তাঁর লঘুভার মনে হয়েছিল। মৃদুস্বরে

কেবল বলেছিলেন, 'হিংসে কার আছে আর নেই ভগবানই জানেন!'
সেই সাবিত্রী আজ হলুদে হ'য়ে খাটের ওপর শুয়ে নিমতলায় খাটে প'ড়ে রয়েছে তার কারণও হিংসে। ব্যাপার কি? সামান্য, অন্ততঃ সামান্য ক'রে নেওয়া চলত'। খগেনবাবুর এক সম্পর্কে ছোট বোন বেড়াতে এল কোলকাতায়, সাবিত্রীরই সখী, সেই তাকে তার পাড়াগেঁয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে বলে সেই শেষে আফ্‌শোষ করেছে। খগেনবাবু গান ভালবাসতেন, মেয়েটির গলা ছিল ভারী মিষ্টি, যদিও গান শেখেনি, পাড়াগেঁয়ে বাংলা গান গাইত', অল্পদিনের মধ্যে সাবিত্রীর বন্ধুদের কাছে নতুন নতুন বাংলা গজল ও ঠুংরী শিখে তাদের চাইতে ভাল গাইত'। সাবিত্রী নিজে গান গাইতে জানত না, তার দলের কেউই জানত' না, চেষ্টা করতেন সকলে। রমলা দেবীর (বিফল প্রয়াসকে) সাবিত্রী (চরম সার্থকতা বিবেচনা করত',) খগেনবাবু করতেন না। ফলে রমলা দেবী তাঁর সামনে গাইতে চাইতেন না, এবং তাঁর বোনের আওয়াজ উঠেছিল ভীষণ নাকি, আর তাল ছন্নছাড়া। (সকলেই সমজদার, নির্মম সমালোচক!) সে সব কথা স্মরণ না করাই ভাল। স্ত্রীর সামনে স্ত্রীকণ্ঠের যথার্থ সমালোচনা অসম্ভব, দলের স্বার্থে, ভেস্‌টেড ইন্‌টারেষ্টে ঘা লাগে, আর না হয় অন্য ব্যাখ্যা হয়। উবু হয়ে বসে বসে খগেনবাবুর পা টনটন, শিরদাঁড়া ব্যথা করছিল; কাঁধ আড়ষ্ট, সমস্ত দেহ ক্লান্ত, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাতেই কাঁধ টিপতে আরম্ভ করলেন। কোলকাতা সহরেও কাঠ, ঘি, পুরুত যোগাড় করতে এত দেরী কেন? সহর হলেও এই দেশের সহর, (সব গজগমনে চলে।) প্রায়শ্চিত্ত করলে পুনর্জন্ম হয় না, সাবিত্রী যেন বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারে না জন্মায় আর। তাঁকে বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেটা শ্রাদ্ধের সময় করলেই হবে। নাঃ, তিনি করবেন না। শ্রাদ্ধ তিনি করবেন না, শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কি? এ দেশে এ সমাজে, এ যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কি দোষ করেছে! ধরা পড়েছে বিষ! যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে, আদালতে, লোকসমক্ষে, রমলা দেবীর কাছে সাহায্য নিয়ে। না নিলে কিন্তু চলত' না, কোথায় কাকে পেতেন?
কাঠের যোগাড়-যন্ত্র শেষ হল। সাবিত্রীকে ঘি মাখিয়ে স্নান করান হল। বড় বড় কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরী ক'রে তার ওপর শব তোলা হল। দেহটা কী শক্ত! তার মনের মতন। (নির্জীব বলেই কঠিন।) এবার মুখে আগুন দেবার

পালা। ঐ মুখের সঙ্গে এককালে, সে আজ থেকে বহু পূর্বে, অন্য জীবনে, তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। আজ গত কয়েক বৎসর ধরে ঐ মুখ থেকে নানা কথাই শুনে এসেছেন, সবগুলি মিষ্টি নয়, তবে সবই ভদ্রভাষায়, (মার্জিতরুচি ঐ ঠোঁট দুটো থেকে যেন ক্ষরত।) গলার আওয়াজ-ই দুরকমের। (বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় নরম, স্বামীর বেলা ঈষদুষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক, একটা আদরের ও আদর খাবার, অন্যটি আদর প্রত্যাখ্যানের; যেন আদর না পেয়ে পেয়ে অভিমানিনীর হৃদয় ও মন শুকিয়ে গেছে।) হাতে নুড়ো জ্বলছে, ওপর হাতে তাত লাগল, নুড়োটা উঁচু ক'রে ধরলেন। পুরুতঠাকুর বল্লেন, 'এইবার দিন, আর মন্তর বলুন, ঐ দেখুন না আমার আরো তিনটে কাজ পড়ে রয়েছে।' খগেনবাবু মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে চুলীতে আগুন ধরলেন। মুখে আগুনটা স্পর্শ করল না বোধ হয়। কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউ দাউ ক'রে। মাথার এক রাশ চুল গেল পুড়ে, কি দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল, তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন, 'যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না।' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়, 'এখান থেকে চলে যাও'। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে। ····· প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট্ পুট্ করে শব্দ হতে লাগল, গা ফেটে জল বেরোচ্ছে, কি রকম হলদে রং-এর রস, বার হওয়া মাত্রই উবে যাচ্ছিল। বিশ্রী ধোঁয়া, চাওয়া যায় না, চোখ জ্বালা করে, করকর করে। হঠাৎ দড়াম ক'রে একটা কাঠ ফাটল। চমকে উঠে খগেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। একজন লোক লাঠি দিয়ে নিবন্ত কাঠ উলটে দিলে, আগুন আবার উঠল জ্বলে। খগেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এই রকম কতবার হয়েছে! নানা রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাবিত্রীর মনে হয়ত' সন্দেহ কমান' গেল, সাবিত্রী নিজে ননদকে ডেকে তার গান শুনলে, সে-গানের প্রশংসা করলে, দিন কয়েকের জন্য সংসার সুখের হয়ে উঠল'। তারপর, তারপর হঠাৎ একদিন চা-পার্টি থেকে এসে সে কী কাণ্ড! সাবিত্রী ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই খগেনবাবু একটু চমকিত হয়েই বল্লেন, 'তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।' সাবিত্রী উত্তর দিলে, 'বল কি? তোমার আদরের বোনের চেয়ে? হঠাৎ চমকে উঠলে কেন? আর কেউ আসবে ভেবেছিলে বুঝি?' খগেনবাবুর মন মুসড়ে গেলেও হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'তুমি সুন্দর। এত সুন্দর কখনও ভাবিনি, তাই

হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে চমকে উঠলাম।' 'কখনও ভাবনি? অথচ, সেদিন রমলাদি বলেছিলেন···।' 'ত্যাখ, নজীরের প্রয়োজন নেই, আমার চোখ আছে। ঐ রমলাদিই তোমার মাথা খাবেন—তোমার সর্বনাশ করবেন।' 'তোমার আবার চোখ নেই! চোখ আছে, তবে পরস্ত্রীকে দেখবার জন্য, তাও যদি সম্পর্ক না হত! রমাদি যদি আমাকে একটু স্নেহ করেন তা হলে তোমার অত ঈর্ষা হয় কেন বলত? আমার মাথা ত গেছেই! আমার সর্বনাশ যদি যোগ্য পাত্রীর দ্বারা হত তবু ছিল ভাল। তুমি খুকীর মধ্যে কি পাও বলত?' 'ও সব কথা ছাড় লক্ষ্মীটি।' 'আদর করতে হবেনা আমাকে, তোমাকে বলতেই হবে আজ। না বলত মাথা খুঁড়ে এইখানে মরব। বল।' 'ওর মধ্যে ভদ্রতা আছে, স্নেহমমতা আছে, ভাল জিনিষকে ভাল বলতে জানে, সহজ মানুষটি, অনেকটা মাসীমার মত মনে হয়—এর বেশী বলতে পারি না।' 'মাসীমার মতন! তাঁর নাম আর করতে হবে না, তোমার সঙ্গে তাঁর দেওরঝির বিয়ে দিয়ে রাজরাণীগিরি করতে পারলেন না, তাই মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। তাঁর কথা আর বোলো না। প্রাণের বোন ভালকে ভাল বলতে জানে! জানে ও ছলাকলা। আমার আর জানতে বাকী নেই। কী রকম ব্যবহার করে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে, আমার জানা আছে—ওর ননদের বাড়ী রমলাদির বোনের বাড়ীর পাশেই—তুমি যদি ওর নাম আবার কর, তা হলে আমি আর ভদ্রতা রাখতে পারব না, বিষ খেয়ে মরব।' এই বলে সে কানের দুল খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিষ তখন খায়নি, তবে ঐ রকম তুচ্ছ ব্যাপারেই বিষ খাব ভয় দেখাত, ওর চেয়ে তুচ্ছতর ব্যাপারে বিষ খেয়েছিল।

আগুন প্রায় নিবে এল। রমলা দেবীর আত্মীয়েরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পুরোহিত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, 'এইবার শেষ কাজটি করতে হবে, নাভি-কুণ্ডলটি বার করুন, আত্মঘাতিনীর কার্যে দক্ষিণা আমরা বেশী নিয়ে থাকি।' সুজন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'সে হবে'খন, বিমল বার করত ভাই।' পুরোহিত ঠাকুর তখন অন্য একটি নবাগত শবের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'দেরী করবেন না।' বিমল ইতস্তত করছিল, পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রীর বুঝি সন্তান সম্ভাবনা? তা হলে এলেন কেন? আপনার দ্বারা হবেও না, এটা স্বামীর কর্তব্য; সহধর্মিণী ত?' খগেনবাবু তখন বাঁশের ডগা দিয়ে ছাই ঘেঁটে একটা পোড়া মাংসপিণ্ড বার করলেন। সাবিত্রীর শেষ চিহ্ন! ছুটো মালসার মধ্যে নাভিটা চাপা দিয়ে গঙ্গার ধারে অগ্রসর হলেন, সুজন সঙ্গে এল।

মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে মালসা দুটো যত দূরে পারেন জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনে মনে খগেনবাবু বল্লেন, 'তোমার আত্মা যদি থাকে, তবে তার তৃপ্তি হোক।' (মেয়েদের থাকে ভাব-গ্রন্থি। তাদের হিংসাদ্বেষও এই নাভিকুণ্ডল থেকেই ওঠে। এইটাই যোগসূত্র, বংশপরম্পরার। সবই এদের নাড়ির টানে।) কে জানে। পরজন্ম যদি থাকে তা হলে সাবিত্রী যেন মেয়েমানুষ না হয়ে জন্মায়, বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের মেয়ে হওয়ার চেয়ে পশুজন্মও বোধহয় ভালো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আত্মঘাতিনীর মানবজন্মও হয় না। মেয়েদের আত্মা! হিন্দুশাস্ত্রেই আছে—কি আছে খগেনবাবুর ঠিক মনে পড়ল না, তবে নিশ্চয়ই আছে ঐ ধরনের কথা। তারপর কলসী ক'রে জল এনে চুলী নেবাবার পালা, পুরোহিত বিদায়, বিছানা ভাগ, পোড়া গহনা খোঁজা, শ্মশানবন্ধু ও কনষ্টেবলকে বখশিসদান, তারপর স্নান। সুজন একটা ফরসা তোয়ালে ও ধুতী দিলেন খগেনবাবুকে। বেশ গন্ধ—কার তোয়ালে?

খগেনবাবুর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল—কাঁধে ভীষণ ব্যথা, কলসী বয়ে বয়ে হাত টন টন করছে, ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে গোছ ফুলে উঠেছে, পায়ের তলায় পাকা ফোড়ার মত ব্যথা, আগুনের তাপে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বলছে, করকর করছে ধোঁয়া লেগে। দু'খানা ট্যাক্সী আনতে বলে খগেনবাবু সিগারেট ধরালেন, জিব শুকনো, ভাল লাগেনা, (একটা মিঠা দোনা খেলে হয়) এখন এখানে খাওয়া যায় না, সিগারেটটা ফেলে দিলেন। একটা ট্যাক্সী এল, আর সেই (নতুন মডেলের শেভ্রলে, বনেটের সাদা ক্রোমিয়ম প্লেটগুলো গ্যাসের আলোয় ঝকঝক ক'রে উঠল।) খগেনবাবু ট্যাক্সীতে উঠতে যাচ্ছিলেন, সুজন বল্লে, 'না, এই গাড়িতে উঠুন।' খগেনবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মত শেভ্রলেতেই চড়লেন, সুজনবাবুও এলেন। (হুড ঢাকাই ছিল।)

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বিডন্ স্ট্রীটে পড়ল। দুধারের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় দু'একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে গান চলছে, ঢুলঢুল টুলটুল, ভরা যৌবন—ব্যথার ব্যথী—সব বাংলা—(সব গজলের চাল।) একটা ঘরের ভেতরকার বড় আলোকচিত্র চোখে পড়ল—মাথায় পাগড়ী বাঁধা কোন শিক্ষিত সাধুর। গাড়ি জোরে ছুটছে—রাস্তায় আলো এক একবার যাত্রীর মুখের উপর পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, আবার অন্ধকার। (চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর দক্ষিণে হাওয়া, শোভাবাজার, বাগবাজার অঞ্চলের বনেদী বাড়ীর বড় বড় গাড়ি পাল তোলা নৌকার মতন মন্থরগতিতে বাড়ী ফিরছে, এঞ্জিনের আওয়াজ নেই।)

(সাহেবদের গাড়ী তাদের অতিক্রম ক'রে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটছে।) সঙ্গের ট্যাক্সীটা এগিয়ে চলল। ট্যাক্সীর নম্বর একটু অন্য ধরণের বুঝি? সব T দেওয়া। খগেনবাবু গাড়ীতে ঠেস দিয়ে বসলেন, চোখ বুজতে পারছিলেন না, আগুন ও আলোর শিখা চোখ বুজলেই নেচে উঠছিল। চিরকালই জ্বলবে নাকি? একটু জ্বালা কমলে শান্তি পাওয়া যায়। কবে(চোখ স্নিগ্ধ হবে?)
গাড়ি সেই মির্জাপুরের গলির মধ্যে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। আগের গাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নেমে দরজার সামনে এক মালসা আগুনের উপর হাত তাতাচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে খগেনবাবু আগুনের দিকে গেলেন না। (সকলে নিমপাতা ও মটর ডাল চিবুলেন,)খগেনবাবু পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন, চাকরে জল ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুজন ইঙ্গিত করতে চাকর খগেন বাবুর কাছে এগিয়ে এল। খগেনবাবু হাত পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলেন— তোয়ালেটায় বেশ গন্ধ। রমলা দেবী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁকে নমস্কার করে যুবকেরা চলে গেল। রমলা দেবী সুজনকে বল্লেন, 'সুজন কাল সকালে জিরিয়ে একটু আসতে পারবে?' একটু আমতা আমতা করে সুজন উত্তর দিলে 'কাল সকালে একটু কাজ ছিল।' 'যখন সুবিধে হয় এস।' সুজন সব শেষে চলে গেল। এক গেলাস সরবৎ নিয়ে রমলা দেবী যখন এলেন তখন খগেনবাবু নীচের ঘরে শোফার ওপর শুয়ে। লাফিয়ে উঠে তিনি এক চুমুকে পুরো গেলাসটা নিঃশেষ করলেন। 'আর এক গেলাস এনে দিই?' 'না!' বুকটা তবু ঠাণ্ডা হচ্ছিল না, চোখে বড় কষ্ট হচ্ছিল, হাত দিয়ে ঢেকে বসলেন। 'গোলাপজল এনে দিই?' 'বড় ভাল হয়।' রমলা দেবী গোলাপজলের শিশি আনলেন, খগেনবাবু(হাতের কোষে গোলাপজল নিয়ে চোখ ধুলেন।) খানিকক্ষণের জন্য চোখ ঠাণ্ডা হল, খগেনবাবু চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। আবার জ্বলতে লাগল, চোখ খুলে দেখেন রমলা দেবী হাতে শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'এখনও কষ্ট হচ্ছে? একটু মাথায় দিন।' খগেনবাবু খানিকটা ঢেলে মাথায় দিলেন। 'চোখের ভেতর এমন জ্বলছে!' 'চোখ বুজে শুয়ে থাকুন, এখনি আসছি, আলো নিভিয়ে দেবো?' 'না।' রমলা দেবী উপর থেকে ড্রপার নিয়ে এলেন—খগেন বাবু উঠে বসতে চাইছিলেন। 'উঠে বসলে দেওয়া যাবে না, শুয়ে থাকুন।' হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন, আঙুল দিয়ে নিজের চোখের পাতা ফাঁক করলেন, রমলা দেবী ড্রপার দিয়ে ডান চোখে দু'ফোঁটা গোলাপজল ফেললেন। মাথার ওপর পাখাটা জোরে ঘুরছিল, বাঁ চোখে ফেলবার সময় মাথার ওপর

শাড়ির অংশটা উড়ে কাঁধের ওপর নেমে গেল, সামলাতে গিয়ে বাঁ চোখের ওপর দশ-বার ফোঁটা গোলাপজল পড়ে গেল। গড়িয়ে মুখের মধ্যে যাচ্ছিল। হাতের কাছে তোয়ালে না থাকার দরুণ রমলা দেবী 'আমি একটা অপদার্থ' বলে তাড়াতাড়ি শাড়িব আঁচলের কোণ দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। খানিকপরে বল্লেন, 'আবার ডান চোখটা খুলুন, ভাল পড়েনি।' 'পড়েছে।' 'না, মাত্র দু'এক ফোঁটা পড়েছে, লাগবে না, আরাম হবে, খুলুন।' বাঁ চোখটায় আরাম হচ্ছিল, ডান চোখে অস্বস্তি কমেনি। ডান চোখটা আবার আঙুল দিয়ে ফাঁক করলেন···ফোঁটা ফেলবার সময় রমলা দেবীর হাত কাঁপছিল। বেশ ফর্সা দেখাচ্ছিল হাতটা, চুড়ির রং এর সঙ্গে হাতের রং বেশ মিশে গিয়েছিল, (মনঃসংযোগের একাগ্রতায় মুখের আদরা স্পষ্ট হয়েছে।) চার পাঁচ ফোঁটা পড়বার পর খগেনবাবু বল্লেন, 'আর না।' তারপব চোখ বুজে ও হাত ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন।

২

খগেনবাবুর রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না। সর্বাঙ্গ ব্যথা, বিশেষত ডান কাঁধটা। পার তলা ও চোখ ভারী জ্বালা করছিল। (যে ক্লান্তিতে স্বপ্নবিহীন ঘুম আসে তার সীমা অতিক্রম করাতে দেহটা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।) সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করতে করতে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁর মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও ভোর। মিউনিসিপালিটির ময়লা গাড়ীর শব্দে তাঁর বিরক্তি হচ্ছিল। পূর্বে কতবার তিনি ভোরে শয্যাত্যাগ করেছেন, কিন্তু কৈ সহরের আওয়াজ ত এমন কর্কশ মনে হয় নি! স্বরাজ-পার্টির দোষ, না তাঁর দৈহিক অবস্থার দোষ? এ রকম কত কর্কশ আওয়াজ সহরের বাসিন্দারা নীরবে সহ্য করছে, কেউ ত আপত্তি করে না! (বোধ হয় তাদের স্নায়ুমণ্ডলী আরো শক্ত, কিম্বা তাদের সহ্য হয়ে গিয়েছে।) সহ্য হয়েছে না ছাই হয়েছে! লোকগুলো বোকা ভাল-মানুষ, আপত্তি করতে জানে না, অথচ আসে পাড়া গাঁ থেকে; ট্রাম, মোটর, বাস, লরির শব্দ, তাদের অজানিতে, দেহের প্রত্যেক স্নায়ুকে আক্রমণ করে, বিধ্বস্ত করে, তাই গলির মোড়ে মোড়ে চাএর দোকান নচেৎ সভ্যতার সঙ্গে লড়বে কি খেয়ে? বিবাহিত জীবনেও তাই। (এই যে গলিতে গলিতে কন্‌সার্টপার্টি, রাস্তায় রাস্তায় থিয়েটার পার্টি, কিসের জন্ম চলছে? বাড়ি থেকে

পালিয়ে প্রাণ বাঁচানর তাড়ায়, আত্মরক্ষার তাগিদে।) প্রাণের মায়া ভীষণ মায়া, যুবক-বৃন্দ ক্লাব করছেন, ছাত্রসঙ্ঘ তৈরী করছেন, মাসিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছেন, একই কারণে, বাড়ি থেকে, বাপ-মাএর নীচ কলহ-বিবাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। সব পালাচ্ছে, যা চায় না তা থেকে। যাবে কোথায় কেউ জানে না, তাই হট্টগোলে দিশেহারার দায়িত্বহীনতা ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোয়। জোরে রেডিও না ছাড়লে গৃহিনীদের দুপুরবেলার কাজ, অর্থাৎ ঘুম হয়না।)

খগেনবাবুর গলা শুকিয়ে আসছিল, কাঁধে ব্যথা, চোখ ও পায়ের জ্বালা যেন তাঁর শান্তির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছে। সাবিত্রী পরিত্রাণ পেলে। তার প্রাণের মায়া বড় বেশী ছিল না—কি থেকে পালিয়ে গেল? বলবে সে, স্বামীর অবহেলা থেকে। তা নয়, নিজের থেকে। কোথায় পালাল? কিসের ডাকে? কিছুই জানা নেই। নাভিকুণ্ডলটাও জলে ফেলা হল, পুড়ে ছাই হল, রইল কি? তাকে কে ডেকেছিল? মরণ, বড় কিছু নয়।

ডাক শোনবার কানই তার ছিল না। কান ছিল রং বেরং-এর দুল পরবার। কান দুটো তার দেখাই যেত না, চুলের থাকে ঢাকা পড়ত, দেখা যেত লম্বা দুল। লম্বা দুল তাকে মানাত না, মুখ ছিল তার লম্বা। একবার ছোট্ট একজোড়া পুরানো দুল খগেনবাবু কোথা থেকে যোগাড় করেন, সাবিত্রী অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করে, একবেলা পড়েছিল, তারপর আর পরেনি, খগেনবাবু ভগ্নীর বিবাহে তাকে পালিশ ক'রে যৌতুক দেয়,(গিন্নীপনার সুখ্যাতি-ট্যাক্সটি আদায় ক'রে।) নিশ্চয়ই সাবিত্রীর বন্ধুরা তাকে এ পরামর্শ দেন, নিশ্চয়ই রমলা দেবীই দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের মুখটা লম্বা ধরণের; পছন্দটাও সেকেলে নয়। কিন্তু (সৌন্দর্যটাও নিজস্ব বস্তু,) রমলা দেবীকে যা মানায় সাবিত্রীকে তা মানায় না। রমলা দেবী কি করে পুরাতন গহনার স্বাদ বুঝবেন? (তিনি জানেন বম্বেওয়ালার দোকান। তাঁর রুচি বিদেশী; (তাও বিদেশের মার্জিত রুচি নয়, যে রুচি কয়েক বৎসর পরে জাহাজের খোলের বন্ধ হাওয়ায় ভেপসে উঠে পচা অবস্থায় ভারতবর্ষে হাজির হয়, তারপর অন্দর মহলের খিড়কী দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে বৈঠকখানার হাওয়া কলুষিত করে।) বিলিতী সাজসজ্জা না পরলেই স্বদেশী হয় না, অথচ লোকে বলে মেয়েদের জন্যই হিন্দুস্থানের সভ্যতা অটুট রয়েছে!) (কারা জর্জেট কেনে, কারা পাউডার সেন্ট্ মাখে, কারা চা চপ কাটলেট তৈরী ক'রে পুরুষের মনোহরণ করে?) এই রমলারা। (কটা মেয়ে চন্দ্রকোণার শাড়ির নাম জানে,

কটা মেয়ে পুলিপিঠে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে পারে! নিশ্চয় রমলারা নন্।' (ধনে-পলতা-সেদ্ধ জলের বদলে, চুণের জল, তুলসী পাতার বদলে কারা দামী বিলেতী পেটেণ্ট ওষুধ খাওয়ায়?) খাওয়াবে কাকে? ছেলেমেয়েই হয় না এদের, অবশ্য না হওয়াই ভাল। রমলা দেবীরও হয়নি, সাবিত্রীরও না। পুরুষমানুষদের চা-এর কথা স্বতন্ত্র, হুঁকো কলকেও সর্বত্র পাওয়া যায় না। চা-টা স্বদেশী, চীনেদের। তা ছাড়া, আর ঘুম না হলে কি করা যায়? চা সিগারেট খেতেই হয়। সাবিত্রীও আপত্তি করত না, খগেনবাবুকে সিগার ও কফি খেতে বলত। করে কে? রমলা দেবীর কাছে কফি তৈরী করার কৌশলটা শিখে নিলেই হত, তা নয়, শেখা হত যত সব বদ অভ্যাস। যার যেটা ভাল সেটা নিলেই ত হয়! কফির কথা মনে উঠতে খগেনবাবুর তৃষ্ণা তীব্রতর হয়ে উঠল। এতক্ষণ নিশ্চয় কলেজ স্কোয়ারের পাশের দোকানগুলো খুলেছে। খগেনবাবু উঠে পড়লেন, বাথরুমের মগটা ধড়াস ক'রে পড়ে গেল, কলের জল তখন আসেনি, কোণের বালতির বাসি জল দিয়ে হাতমুখ ধুলেন, আরসিতে ছায়া পড়তে কামাবার ইচ্ছে হল! কামাতেই হবে তাকে, কিন্তু সরঞ্জাম কোথায়? চা খেয়ে কামালেই হবে। দাড়িটা এত বড় হল কি ক'রে? একেবারে করকর করছে যে! সেইজন্য গা গরম? এই রকম তাঁর বহুবার হয়েছে। জ্যাঠাইমা মারা যাবার জন্য তাঁর অশৌচ হয়, দুদিন কামান নি, বিকেলে মনে হয়েছিল জ্বর আসছে, কামিয়ে সুস্থ হন। কামালে দু'চারটে সাদা চুল থুতনিতে দেখা যেত, অথচ অন্য কোথাও পাকা চুল নেই। কামাতে হবে তাকে, তারপর চা। কখন রমলা দেবী এসে পড়বেন কে জানে? থা শব্দ হল! হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ঐ শব্দে। খুটখুট ক'রে যেন জুতোর শব্দ হল না! রমলা দেবী কি (বাড়ীতেও জুতো পরেন না কি?) (চাপলি পরেন নিশ্চয়ই, চাপলির শব্দ অন্য ধরণের।) খগেনবাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দরজার হুড়কোটা ভারী কড়া, দরজা খুলে রাখলে যদি চোর আসে। সকাল হয়ে গিয়েছে, এখন চোর আসবে না। (এ বাড়ীতে বাসন মাজার ঝি আসেনা না কি?) এলে ভাল হত, নচেৎ বাসনকোসন চুরি হতে পারে। না, কলতলায় বাসন নেই ত। বাঁচা গেল! খগেনবাবু বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—কিন্তু হাওয়া নেই।

(রাস্তায় তোলা উনুনে আগুন ধরান হয়েছে, ধোঁয়ার স্তম্ভ সোজা উঠছে।) চা-এর দোকানের বারাণ্ডায় উনুন, মুখ তার ফুটপাতের ওপর, ছাই পড়ে আছে রাস্তায়। একজন লোক পেয়ালা ধুচ্ছে, বড় সাদা পেয়ালা, কিনারা গোলাপী।

এরি মধ্যে কখন লোকটা স্নান ক'রে চুল আঁচড়েছে, দাড়ি কামিয়েছে। খগেনবাবু ধোঁয়া ভেদ ক'রে দোকানে প্রবেশ করলেন, জারুল কাঠের টেবিল, কালো অয়েল-ক্লথে মোড়া, ভেনেস্তা চেয়ার, কোণে তেকোনা পাথরের টেবিল রয়েছে, ঐ টেবিলে চা খেলে নিশ্চয়ই তিন পয়সা দিতে হয়। উনুন ধরাতে আর দেরী নেই, এই দশ মিনিটেই ধরে যাবে শুনে খগেনবাবু লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এখানে সেলুন নেই?' 'আছে, একটু আগে, কিন্তু এখনও খোলে নি। একটু পরেই রাস্তার মোড়ে হিন্দুস্থানী নাপিত বসবে—এখান থেকে দেখতে পাবেন।' 'আচ্ছা, ততক্ষণ এক কেৎলী চা তৈরী করুন, কিছু কেক আছে?' 'ভাল ডেভিল আছে মশাই, গরম ক'রে রাখব?' 'না থাক, কেক হলেই চলবে, এলাম বলে।' খগেনবাবু রাস্তা ঘুরে যখন ফিরে এলেন, তখন ধোঁয়া নেই, উনুনে কেৎলী বসান হয়েছে। শীঘ্রই জল তৈরী হল, লোহার চাটুর উপর একটু ঘি ছাড়া হল, লোকটি একটা বড় ডিমের মতন লেচি ছেড়ে দিলে। চা এল, ডেভিল ভাজা হল, খগেনবাবু লোকটির ব্যস্ততা দেখে আপত্তি করতে পারলেন না। ডিশের উপর ডেভিল, খানিকটা রাই ও একটি কেক, গরম চা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ডেভিলের চেহারা দেখে খগেনবাবুর গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল, একটা কামড় দিতেই কিসমিস মুখে এল! মন্দ নয় মোটের ওপর, কেকটা বাসি, চা-টা ভাল নয়, বাসি দুধের ধোঁয়ার গন্ধে বিস্বাদ ঠেকছিল। আর এক কাপ চা দেবার সময় লোকটি বল্লে, 'ঐ নাপিত এল, ডেকে দেব? এই পরামাণিক, ইধার আও।' লোকটির বাবরী কাটা চুল, গায়ে ফতুয়া, কানের পাশে লোহার কাটিতে তুলো, সযত্নে রক্ষিত গোঁফ, হাতে ন্যাকড়ার মোড়ক, তার ভেতর কত রকমের থলি। তার মুখে দারিদ্রের চিহ্ন নেই, বাঙ্গালী গরীব কেরানী-দের যেমন থাকে। তার পেতলের বাটিতে চা-এর দোকানের লোকটি খানিকটা গরম জল ঢেলে দিলে। খগেনবাবু ক্ষুরটাকে গরম জলে ধুয়ে নিতে বল্লেন, সাবান ব্যবহার করতে দিলেন না। ক্ষুরের বাট কাঠের, দেহাতী জিনিষ। নাপিত খগেনবাবুর জামা ঢাকার জন্য একটা কাপড় বার করলে, খগেনবাবু নিলেন না। নাপিত ভাঁজ ক'রে রেখে দিলে। তার হাত চলল গরম জল দিয়ে ধোয়া দাড়ির ওপর। সাবানের চেয়ে ঢের ভাল। সেই পনের বছর বয়সে লুকিয়ে দাড়ি কামিয়েছিলেন; আর বিবাহের দিন বিকেল পাঁচটায় একেবারেই ছুট, বাড়ির লোক ভেবেই অস্থির, বর কোথায় পালিয়ে গেল বুঝি। 'পালাবে কোথায়?' বড় ভগ্নীপতি ঠাট্টা করেছিল, 'পালাবার জো আছে! পরেও নেই, আগেও নেই।'

ছোট ভগ্নীপতি বলেছিল, 'পালিয়েই যদি থাকেন ত শ্বশুর বাড়িতেই, দাদার আর তর সইছে না।' বাস্তবিকই তার তর সইছিল না। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ হলেই সে বাঁচে। (প্রতীক্ষা করা তার ধাতে ছিল না, যা হবার এসপার ওসপার একটা হলেই হল।) ঠিক হলেই হল তা নয়, কেননা সে নিজে কনে দেখেছিল, পছন্দই হয়েছিল—অন্য মেয়েও তার পছন্দ হয়েছিল, একে যে বেশী তাও নয়, তবে বেশ কবিতা-কবিতা গোছের এই মেয়েটি। বিবাহ ক'রে রোমানস করবে, নতুন জীবন যাপন করবে এ ধারণা ছিল বলে মনে পড়ে না, মনে পড়ে এইটুকু যে সে শুধু অপেক্ষা করতে পারছিল না, মনে পড়ে যে সকলে তাকে নিয়ে মাতামাতি করছে, ঠাট্টা করছে, মন্দ লাগছিল না। হাঁ, এই ত তার মনোভাব ছিল ; তাছাড়া আর কিছু ছিল না ? কই, মনে আসছে না ত! হয়ত, আরো কিছু ছিল। সব মনে থাকে না, হয়ত আরো কিছু ছিল। সব মনে থাকে না, পরে তৈরী করে মানুষে, আর সুবিধা বুঝে পূর্বতনের স্কন্ধে চাপায়।

দাড়ি গোঁফ কামান হল ; নাপিত ক্ষুর ধুয়ে এক টুকরো শক্ত চামড়ায় শান দিয়ে ও হাতে পালিশ ক'রে থলিতে রাখলে। খগেনবাবু গরম জলে মুখ ধুলেন, একটা দু-আনী দিলেন নাপিতকে।) লোকটি কোন কথা না ব'লে দু-আনীটা মাথায় ঠেকিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখলে। (কাজের লোক, নাপিত জাতের মত বাজে কথা কয় না ত ? কেমন তাড়াতাড়ি নীরবে কাজ সারলে!)

ভারী আরাম বোধ হতে লাগল, যেন ঝরঝরে ;(মন খারাপ হলে লোকে দাড়ি কামায় না কেন ? বিধবা হবার পর যদি মেয়েরা একটু সাজতে পারত, তা হলে দুঃখবিলাস ও নিজের প্রতি অনুকম্পায় বিধবারা অমন অস্বাভাবিক হতেন না, আত্মীয়ারাও কেবল মুখে সহৃদয়তা ও সমবেদনা প্রকাশের সুবিধায় আত্মতৃপ্ত এবং মনে মনে বিরক্ত হতে পারতেন না, আর, আর, একনিষ্ঠতার আদর্শে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নপুংসক হয়ে উঠত না।) (অবশ্য, পুনর্বিবাহটাও ভাল নয় ; মুণ্ডিতমস্তকের পক্ষে বারবার বেলতলায় গমনাগমন মূর্খতারই পরিচায়ক।) কিন্তু (কি করা যায় ? দু'ধারেই বিপদ। আদর্শেরও দরকার আছে, স্বাভাবিকতারও প্রয়োজন রয়েছে, না হলে সংসার চলে না। দুই অনন্যসম্বন্ধ প্রয়োজনের বিরোধ মেটে না, তাই মিথ্যারও প্রয়োজন।) কল চলছে না, তাই তেল চাই। সাবিত্রীর মুখ থেকে তার মতে আদর্শ দাম্পত্যজীবনের কাহিনী শুনে বুঝেছিলেন যে বিবাহিত জীবনেও মিথ্যার একটি বিশেষ স্থান আছে ; অন্তত আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের ঠকান, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না। ভদ্রতারক্ষা সত্য আচরণের চেয়ে অনেক

মূল্যবান এই সমাজে, এই নতুন সমাজে। ভদ্রতা ও মিষ্টতার মধ্যে একটা ভীষণ মিথ্যা থাকে, থাকতে বাধ্য। সব সভ্যতার মূলেই তাই, ইগ্‌ড্র্যাসিলের তলায় কাঠবিড়ালীর বাসা; সত্য হল সহজ ও স্বাভাবিক, ভদ্রতা হল অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। তবে গোড়ার দিকে, সভ্যতার একটা তেজ থাকে, তখন দোষ অর্সায় না, পরে তেজ কমে আসে। প্রথম প্রথম সাবিত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্ত্তির বিকাশ পেত, পরে এল কুণ্ঠা। পরে তেজ কমে আসে সভ্যতার, তখন অন্তরের সত্য ম্রিয়মাণ হয়; তার চার পাশে মিথ্যার অন্ধকার, বনের মাঝে গোধূলির মতন ঘিরে আসে গোপন-সঞ্চারে, চারধার থেকে নেমে আসে গাছের পাতা থেকে ধীরে, অজানিতে, মুমূর্ষু প্রশ্বাসে। তখনও সভ্যতা ঘনতমসায় আবৃত হয় না, তখনও দীপ্তি থাকে। তাকেই বলে rococo, নিবে যাবার পূর্বে ঐশ্বর্যের ম্লান হাসি। রমলা দেবী সভ্য মানুষ, তাই হাঁপিয়ে পড়েছেন মিথ্যার অদৃশ্য বোঝা বয়ে বয়ে—তাঁর নাকি হাঁপানি! হাঁপানি না ছাই। অপরিণত হৃদযন্ত্রের ধুকধুকুনি, স্পিরিটের বোতলে সযত্নে রক্ষিত। সাবিত্রীর মধ্যে প্রথমে মিথ্যা ছিল না, পরে এসেছিল—সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সভ্যতা ও স্বাভাবিকতার বিরোধ সে ধারণ করতে পারলে না নিজের মধ্যে, করোনারসাহেব বুঝতেই পারেন নি ব্যাপারটা কি। সাবিত্রীর না মরে উপায় ছিল না। অতবড় বিরোধ হজম ক'রে নতুন সমন্বয়ে উপস্থিত হওয়া কি চারটিখানি কথা! অধিকার-ভেদ রয়েছে যে—সব আধার সমান নয়। সাবিত্রী ছিল ভিজে তুবড়ী—তাই ফস ক'রে জলেই নিবে গেল। কিন্তু ভিজে হলে চলবে না। রমলা দেবীর মধ্যে সত্য ও মিথ্যা নতুন ধরণের ফ্ল্যাটের বাসিন্দার মত ভদ্রভাবে, আলগোছে দিন কাটাচ্ছে। অন্যে কাটাচ্ছে কাটাক গে! তার কি! কিন্তু পরে টের পাবেন জীবনটা ফ্ল্যাট নয়। আর খগেনবাবু, নিজে? নিজে মিথ্যা আচরণ করতেই পারেন না। বরঞ্চ পালাবেন। তবে সাবিত্রীর উপায়ে নয়। (ভিনদেশে চলে যাবেন, না হয় সন্ন্যাসী হয়ে দিব্যি খাবেন দাবেন, মোটা হবেন, রং তামাটে হয়ে যাবে, পরকে উপদেশ দিয়ে চরিতার্থ হবেন।) লোকগুলো যা মূর্খ! উপদেশ, বিশেষতঃ ধর্মোপদেশ যেন তাদের খাদ্য, না হলে চলে না। যত শিক্ষা ততই বুজরুকীর প্রয়োজন। ছিঃ, ছ্যাঃ। সর্বদাই বিরোধ, না হয় মিথ্যা। আর ভাল লাগে না। (তার চেয়ে হাওড়া ষ্টেশন, একটি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ, একটি ভাল পাহাড়ি চাকর, একটা ভদ্র হোটেল, 'ভদ্রলোকের জন্য' নয়, ব্যস্! মণ্ডরী ভাল না লাগলে উটি, উটি না লাগলে এটি। নিজের বাজে রসিকতায় খগেনবাবুর মুখে

লজ্জার হাসি ফুটে উঠল।

বাড়ীতে প্রবেশ করেই খগেনবাবু রমলা দেবীকে দেখতে পেলেন। গরদের শাড়ি, লাল পাড়, ধোপদোরস্ত, খসখসে নয়, নরম, আঁচলটি গলায় জড়ান, নজর করলে ব্লাউসের খচিত পাড়টি দেখা যায়, নচেৎ শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিশে থাকে, সবুজ ঘাসের মধ্যে ফড়িং-এর মতন। একটু উঁচু ক'রে শাড়ি পরা, পায়ের গাঁট থেকে নীল শিরগুলো নেমে আঙ্গুলে প্রসারিত হয়েছে। (যেন পূজারিণীর ছবি, ভবানী লাহার, হেমেন মজুমদারের নয়।) চোখাচোখি হতে খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন, মনে হল যেন তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন, যিনি অত করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ভেবে, তাঁর রুচির সমালোচনা ক'রে। অত সকালে লুকিয়ে চা না খেয়ে এলেই হত, কিন্তু দেহের একটা ভদ্রতা আছে, নচেৎ দাঁড়ি কামান হতই না, অসভোর মুখ নিয়ে চায়ের টেবিলে বসতে হয়। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সারা রাত ঘুম হয়নি বুঝি?'

'ঘুম? ঘুম একরকম হয়েছে। এই একটু বাইরে গেছলাম।'—'চা আনি?' 'এরি মধ্যে চা তৈরী? আপনি ত খুব সকালে ওঠেন!' 'ওপরের ঘরে আসুন।' খগেনবাবু ওপরের ঘরে গেলেন। (ছিটের পর্দা টাঙ্গান, দরজায় তারের পা-পোশ, সতরঞ্চি মোড়া মেজে, তার ওপর দুটি ছোট রঙ্গীন কার্পেট, গদিঅলা চেয়ার, তেকোনা টেবিলের ওপর ফুলদানী, ফুল নেই, চেয়ারের পিঠে লেসের রুমাল, দেওয়ালে বিলিতী ছবি, জানালায় পর্দা দেওয়া। ঘরটি ছোট, আসবাবপত্র বর্ত্তমান লেখকদের লেখার মধ্যে মতামতগুলির মত ভিড় ক'রে রয়েছে, অবকাশ নেই, যেন হিংসেতে নিজের অধিকার বিস্তার করতেই ব্যগ্র। খগেনবাবু একটি মোটা চেয়ারে বসলেন, সামনের টেবিলে চায়ের বাসন সাজান।) রমলা দেবী এক কাপ খগেনবাবুকে দিলেন, এক কাপ নিজের জন্যে তৈরী করলেন। খগেনবাবু (এক টুকরো চিনি নিলেন, চা-পানের পূর্বে একটি টোষ্ট তাঁকে খেতে হল, পাতলা, মুড়মুড়ে ফিকে হলদে টোষ্ট, খালি পেটে চা খেয়ে খেয়ে নাকি তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।)

'এবার দেখুন নিজেকে যত্ন করতেই হবে।'

'আমার শরীর মোটেই খারাপ নয়।'

'নাঃ, মোটেই খারাপ হবে কেন? তবে ঐ যা, রাতে ঘুম হয় না, খেলে হজম হয় না, তাই কেবল মাছের ঝোল পথ্য, আর ওজনে একটু হাল্কা!'

'তাতে দেখুন কিছু আসে যায় না। আপনিও ত হাল্কা।'

'আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের আবার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কি?'

'সে কথা বলবেন না। আপনাদের স্বাস্থ্যের ওপরই আমাদের সুখশান্তি নির্ভর করছে। আপনাদের মাথাটি ধরলে আমাদের ভুগতে হয়।'

'সকলের নয়। আর একটু চা নিন। একি, গাল কাটলেন কি ক'রে!'

'না, কৈ? কাটিনিত?' গালের ওপরে হাত দিতেই আঙ্গুলে রক্তের দাগ লাগল।

'তাইত! নাপিতদের বিশ্বাস করতে নেই, তাইত।' রমলা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এক মিনিটের মধ্যে একটা সেলুলয়েডের বাকস ও একটি শিশি নিয়ে এলেন—'এই নিন, আগে আওডিন দিন, একটু জ্বলবে, তারপর পাউডার দিন, ভারি হলদে দাগ হয়!' খগেনবাবু আওডিন ও পাউডার লাগালেন। চা পান শেষ হবার পর রমলা দেবী তাঁকে বল্লেন, 'এখন এই ঘরেই বিশ্রাম করুন, না বলে যেন কোথাও চলে যাবেন না। ভাঁড়ার বার করে আসছি, ততক্ষণ কাগজটা পড়ুন না। কোন সঙ্কোচ বোধ করবেন না অনুগ্রহ ক'রে।' পিছনের আঁচলটা টেনে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলেন।

কাগজ পড়তে ভাল লাগছিল না, সঙ্কোচ হচ্ছিল। 'সঙ্কোচবোধ করবেন না'—না, সঙ্কোচ আর কি? হাজার হোক পূর্বপরিচিতা, সাবিত্রীর বন্ধু, সেই সূত্রে আলাপ। বন্ধু বলে বন্ধু! একেবারে হর-গৌরী! কে গৌরী, কে হর? রমলা দেবীই হর, তাঁর মধ্যে পুরুষের উপযুক্ত একটা সংহতি ছিল আর সাবিত্রীর মধ্যে ছিল গৌরীর বাপের বাড়ী যাবার আব্দারটা, গৌরীর অন্য কিছু থাক আর না থাক। আচ্ছা, সতীর যদি মানসিক বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তাঁর চরিত্রে পিতৃপ্রীতির আতিশয্য এবং স্বামীর অবস্থায় অসন্তোষ পাওয়া যায় না কি? বিশ্লেষণে যা চাই তাই মেলে। কিন্তু হর ঠাকুরটি বড় ভাল। তাঁর মধ্যে আছে শান্তি ও আত্মসমাহিত ভাব, তাঁর মধ্যে নেই ভাবের উত্তাপ, চিত্তের বৈকল্য, চিন্তার বিক্ষেপ; অথচ রাগ রয়েছে, এমন কি কামও আছে—বিষ্ণু কি জব্দটাই করেছিলেন মোহিনীমূর্তি ধারণ ক'রে! ভারি সরল, সহজ পুরুষ, যেমন সতী নিতান্তই সাধারণ মেয়ে। তাঁর দুই-ই চাই, বাপের বাড়ি যাওয়া চাই স্বামীকে আঁচলে বেঁধে, আবার সেখানে স্বামীর অপমান হলে রাগও হবে; তপস্যাও করা চাই ঐ স্বামী পাবার জন্য, আবার পেয়ে ঝগড়া করাও চাই। এই বোধ হয় জীবন, কেননা এই স্বাভাবিক। এই ভাল বোধ হয়! হরগৌরীর জীবনে কোন কৃত্রিমতার সঙ্কোচ ছিল না, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কিছুই ছিল না, প্রত্যেকেই সহজ ও সাধারণ ছিলেন, তাই হরগৌরীর মিলন আদর্শ বিবাহিত-

জীবনের প্রতীক। কিন্তু তুই মেয়েতে ভাব হয় কি? কেন হবে না?"
পুরুষদের মধ্যে ত হয়, তবে খারাপ নাম না দিলেই হল। 'বন্ধুত্বের মধ্যে সঙ্কোচ থাকে না। কিন্তু মেয়েরা সর্বদাই সঙ্কুচিত। কিসের সঙ্কোচ? সমাজ ভয় দেখায়, সেইজন্য, না দেহের জঘন্য দুর্বলতার জন্য? পুরুষেরা ত তার ক্ষতিপূরণ করেছে, সুন্দর বলে, ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, কবিতা লিখে, মিথ্যা ভাণ ক'রে! তবু কেন? তাঁরা মিথ্যার চেয়ে আরো বেশী কি চান? ভেবে কোন কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কেবল, কেবল সঙ্কোচ না থাকলেই হল, তা যে উপায়েই সঙ্কোচ দূর করা হোক না কেন! সঙ্কোচের জন্যই সাবিত্রী আত্মঘাতিনী হল, পোড়বার সময় দেহটা সঙ্কুচিত হচ্ছিল বলে দুঃখ হল কেন? তার পূর্বে, বহুপূর্বে মন তার সঙ্কুচিত হয়েছিল। আজ রমলা দেবী সঙ্কোচশূন্য হতে আহ্বান করছেন। এ আহ্বান সত্য নয়—নিশি-তে ডাকার মতন, 'খগেনবাবু আছেন, খগেনবাবু আছেন! আপনি আছেন, তুমি আছ, ওগো—।' প্রথম ডাকে উত্তর নেই, দ্বিতীয় ডাকেও নেই, কেবল উঠে বসতে হয়, তৃতীয় ডাকের পর উত্তর দিতে হয়, নচেৎ স্বপ্নাটন অবস্থায় শয্যাত্যাগ ক'রে অন্ধকারে অদৃশ্যশক্তির পশ্চাদ্ধাবন, তারপর খালবিলে ডুবে মরণ। পরের দিন সকালে মাঠের চাষী বলে অমুক লোক আত্মহত্যা করেছে—তারা বোঝে না, করোনার সাহেবও বোঝেন নি। তিন বারের পর চার বারের ডাকে উত্তর দিলে মোহ থাকে না, কেটে যায় —তখন উত্তর না দেওয়া বোধ হয় একটু অভদ্রতা। সঙ্কোচ এখন কাটবে না, উত্তর এখন দেওয়া হবে না।

গদির চেয়ারে বসে খগেনবাবুর ঘুম আসছিল, উঠে বসে জোর ক'রে ঘুম ভাঙ্গালেন। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে দেশবন্ধু সপ্তাহ— টাকা চাই। আজকাল পাঁজি পুঁথি সব উল্টে গিয়েছে, এখন স্মৃতি সপ্তাহ দিয়ে বৎসরের হিসেব হয়। কতদিন স্মৃতির পুঁজি নিয়ে চলবে? কলসীর জল গড়াতে গড়াতে খালি হয়, স্রোতের জল খালি হয় না, জোয়ার, আসে ভাঁটা। গচ্ছতি ইতি জগৎ। এই দু দিন আগে সাবিত্রী ছিল, আজ নেই, কিন্তু সূর্য বেশ উঠছে, সেই সূর্য থেকে আগত জীবনও রুদ্ধ হয় নি, যেমন ভূমিকম্পে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জীবনটা ঘড়ি নয়। জীবন-প্রবাহকে স্বীকার করতেই হয়। রমলা দেবী জীবনের প্রতীক না কি? প্রতীক ভাবতে ইচ্ছে হয় না, ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হয়। বরঞ্চ তার সঙ্গে সম্বন্ধটি জীবন-স্রোতের ছোট্ট ঊর্মি, কলধ্বনির রেশ মাত্র। তাঁর জীবন তাঁরই। প্রত্যেকেই পৃথক। কিন্তু পৃথক থাকা যায় কি? নিশ্চয়ই যায়,

না গেলেও থাকতে হবে, তবেই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হবে। সে জন্য প্রত্যাহার-সাধন শম, দম অভ্যাস করতে হবে। না করলে প্রকৃতি পুরুষকে গ্রাস ক'রে ফেলবে। প্রকৃতিগ্রস্ত পুরুষের কোন সার্থকতা নেই। সার্থকতার অর্থ কি? কে জানে? আজ না হয় সেই অর্থ নাই আবিষ্কৃত হল। আজ নিদ্রাতুর অবস্থাতেই কাটান যাক—নিদ্রা, ঘুম, সুষুপ্তি শাস্ত্রে কতই আছে! বর্তমান মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন নিয়ে মাতামাতি চলছে, নিদ্রা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কৈ? স্বপ্ন নাকি নিদ্রার সহায়তা করে? স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় তা হলে যেন মর্গের সাবিত্রীর ঐ করুণ রূপ না ভেসে ওঠে। তার চেয়ে ভেসে উঠুক সাবিত্রীর বিবাহের রাতের কিশোরী-শ্রী 'তার জলচুড়ীটির স্বপ্ন দেখে, শিউলী ঝরে লাখে লাখে......'

ঘড়িতে কটা বেজে গেল—চোখে দেখলেন এগারটা—ধড়মড়িয়ে খগেনবাবু উঠে বসলেন—চোখে পড়ল, কোণের চেয়ারে রমলা দেবী বসে আছেন, স্নানের পর শুভ্র দেখাচ্ছে, চুল ভিজে, নিশ্চয়ই খোলা। 'এইবার উঠুন, স্নান ক'রে নিন।'

'শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে; বসুন না, একটু দেরীতে নাইলে কি কষ্ট হবে আপনার?'

'আমার হবে না, আপনার হবে; খাবার জুড়িয়ে যাবে।'

'তা হোক, এখনি আসছি' বলে রমলা দেবী নীচে চলে গেলেন।

খগেনবাবু খবরের কাগজের পাতা সাজাতে না সাজাতেই রমলা দেবী প্রবেশ করলেন। 'কিন্তু বারটার মধ্যেই খেয়ে নিতে হবে!'

'সে হবে'খন। বসুন না!'

'এই ত বসে আছি।'

'কাজকর্ম শেষ হয়েছে?'

'অনেকক্ষণ। আমাকে বেশী কাজকর্ম করতে হয় না, চাকর-বাকর সবই পুরাণো।'

'আমি শুনেছি যে আপনি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন?'

'না, কাজ আর কৈ? একলার আবার কি কাজ? আমার হাতে বিস্তর অবসর!'

'অবসরে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ভারী কঠিন। এবার থেকে আমার অবসর খুব বেশী হবে......তাই ভাবছি শীঘ্র কোথাও বেরিয়ে পড়ব!'

'শীঘ্র যেতে পারছেন কি ক'রে? কাজ রয়েছে।'

'কাজ আমার আর কি?'

'কাজ রয়েছে বৈ কি।'

'ও'—খগেনবাবু খানিকক্ষণের জন্য চুপ ক'রে রইলেন! রমলা দেবীর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকেই করতে হবে?'

'না হলে কে করবে বলুন?'

'কেন, পুরুতে? তাঁদের টাকা দিলে ত সব কাজই হয় শুনেছি?'

'হয়, পূজা হয়, কিন্তু এ কাজ হয় না।'

'ও আমি পারব না।'

'জানি কত অপ্রিয়।'

'বেশ……আমি অপ্রিয় কাজ করতে কখনও দ্বিধা করিনি, নচেৎ এমন হয়!'

'তাকে অপ্রিয় কাজ বলে না। তাকে আপনার মনোমত ক'রে গড়ে তোলা আপনার নিতান্তই প্রিয় কাজ ছিল।'

'তবু আপনি গড়ার কথা তুললেন! সাবিত্রী বলত তাকে অযথা বকতেই আমার ভাল লাগে।'

'আমি তা কখনও বলিনি!'

'ঐ দেখুন! নানা মুনির নানা মত! আপনি বলতেন বলছি না, সেই নিজে বলত।'

'কেন—আপনার কি ধারণা নয় যে আমিই তাকে সব শেখাতাম?'

'আপনি শেখাতেন বলতাম না, সেই শিখত, তার স্বভাবটা একটু দুর্বল ছিল কিনা, তাই! আপনার দোষ আমি কখনও দেখাই নি।'

'ও সব আলোচনা পরে হবে, এইবার উঠুন, দেরী হবে।'

'এই উঠছি… একটু বসুন না…আমার খিদেই নেই।'

'খিদে আপনি বুঝতে পারেন না। ভাতের কাছে একবার বসুন ত, সেই সকালে একটুকরো টোষ্ট খেয়েছেন।'

'খাবই না ভাবছি, একটু চা হলে মন্দ হয় না, কি রকম জড়তা আসছে।'

'এখন চা খায় না। এই করেই শরীর মাটি করেছেন! চলুন, উঠুন, তার পর বিশ্রাম করবেন'খন।'

'আচ্ছা, চলুন, কিন্তু তার পরে বাড়ী যাব। চাকর-বাকর গুলো ভাবছে।'

'খবর পাঠিয়েছি।'

'পাঠিয়েছেন এরি মধ্যে। আপনি খুব……'

রমলা দেবী গম্ভীরমুখে উঠে দাঁড়ালেন। খগেনবাবুকেও উঠতে হল। পাশেই স্নানের ঘর। (কোলকাতা সহরের বাড়িতে ঐ রকম বড় স্নানের ঘর পাওয়াই

যায় না। বেশ বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তখনো, মেঝে বিলেতী টাইলের, স্নানের সব সরঞ্জামই রয়েছে, সল্‌টস্, স্পঞ্জ, শাওয়ার, আরসি, কেমন একটা গন্ধ ভরভর করছে···একটু উগ্র, তাও ভাল। উঃ কালকের গন্ধটা কি বিদঘুটে! উনুনের ওপর ফ্যান পড়ার মত! খগেনবাবু কল খুলে দিলেন—জল পড়ল না, দেরি হয়ে গিয়েছে। নাইবার টবে জল ভর্তি। মাথায় একটু সুগন্ধি তেল ঘসে টবের মধ্যে নেমে পড়লেন, ছলাৎ করে মেজের ওপর জল উপছে পড়ল, এই যাঃ মেজেটা ভিজে গেল! বেশ ঠাণ্ডা জল, নিশ্চয়ই সল্‌টস্ দেওয়া হয়েছে, বরফ বোধ হয়, না হলে অত ঠাণ্ডা! আঃ, শরীর জুড়িয়ে গেল। লাল এনামেলের ঘটি দিয়ে মাথায় জল ঢাললেন—সেই কাল রাত্রে গঙ্গার জল মাথায় ছেটান! ভাল করে সাবান মাখলেন। সাবিত্রী কখনও স্নানের ঘরে গান গেয়ে ওঠেনি, খগেন-বাবু গাইতেন, সাবিত্রী বলত দেরী হচ্ছে, বেরিয়ে এস, বাইরে এসে তিনি বলতেন 'তোমার বন্ধু গান না?' 'তোমরা ভাইবোনে গাওগে না, আমার কি?' কথা বন্ধ হয়ে যেত। নাঃ, আর দেরী করা চলে না, মেমসাহেবের দেরী হবে খানা খেতে। এমন বাথরুম না হলে স্নান ক'রে সুখ নেই। দেশী হোটেলে নাইবার বন্দোবস্ত নেই, বিদেশী হোটেলেই উঠতে হবে। পাড়াগাঁয়েই অবগাহন শোভা পায়। দু'দিন পরে—কতদিন পরে রমলা দেবী ও পুরুতঠাকুরই জানেন—কিছুকালের জন্য তিনি দূরদেশে চলে যাবেন। সাহেবী হোটেলে ঘণ্টা বাজলে খেতে হয়, খিদে পাক আর নাই পাক! সর্বক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে—সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী। তার চেয়ে চলে যাবেন, গ্রামে, নদীর ধারে, যেখানে অবগাহন ক'রে শুদ্ধ হবেন, মুক্ত হবেন; ছোট্ট নদীর ঐ ওপাশে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, যে আকাশের দিকে বলাকার দল ছুটলে ভয় হয় ধাক্কা খেয়ে হয়ত আবার তাদের ফিরে আসতে হবে—কোথায় আসবে? নীড়ে? নাঃ কোল-কাতায় থাকা তার পক্ষে অসম্ভব!

খগেনবাবু চুল আঁচড়ে, টার্কিস তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে, ফরসা ধুতি প'রে বাইরে এলেন। দরজার গোড়ায় রবারের পা-পোশের ওপর একজোড়া রঙ্গীন স্যাণ্ডল্। রমলা দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন একটা নেটের গেঞ্জী নিয়ে। কার গেঞ্জী? কিন্তু খালি গায়ে কি ক'রে খেতে বসবেন? গেঞ্জিটা স্নানের ঘরে গিয়ে পরলেন, টাবের প্লাগটা খুলে দিলেন—হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে গেল, মেজেতে জল থই থই করছে, পা দিয়ে বার করতে চেষ্টা করলেন, থাকগে দেরি হচ্ছে। খগেনবাবু বাইরে এলেন, রমলা দেবী তাঁকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। টেবিলে খেতে

হবে, পাশের টেবিলে কাঁচের বাসনে খাবার ঢাকা রয়েছে। রমলা দেবী বড় চামচে দিয়ে পরিবেশন করলেন—সরু চালের ভাত, শুকতো, মোচার ঘণ্ট, বিউলির ডাল, পুরের ভাজা, দই। পাতে ঘি, বেশ গন্ধ, বিউলির ডালে আদা ও জিরে ভাজার গন্ধ। মাছ নেই। রমলা দেবী তা হলে দেশী রান্নাও জানেন! সাবিত্রী তাই বলত, পুডিং শিখেছিল তাঁর কাছে। খগেনবাবুর খিদে পেয়েছিল, অভ্যাসও তাঁর তাড়াতাড়ি খাওয়া। রমলা দেবী তাঁকে তাড়াতাড়ি খেতে বারণ করলেন, শরীর খারাপ হবে। মুখে আপত্তি জানিয়ে ধীরে ধীরেই খেতে লাগলেন—'আমার চিরকালের অভ্যাস!'

'সেই জন্যই শরীর খারাপ।'

'সেজন্য নয়। খাওয়ার ব্যাপারটা যত শীঘ্র সমাপ্ত হয় ততই ভাল।'

'কেন?'

'ভারি ভাল্গার! লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া উচিৎ, যেমন গিন্নীরা খেতেন, রান্না ঘরে বসে, ভাল জিনিষও পেতেন। খাওয়া-দাওয়া অসূর্যম্পশ্যা হওয়াই উচিৎ। মাপ করবেন, আমি ভারি সেকেলে। সকলের সামনে স্নান করা যায় কি? অথচ স্নান ত একপ্রকারের শুদ্ধি! কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করছি না, কিন্তু ওটা আপনার খেয়াল। আর খেয়ালটা হয়েছে কেন তাও বলতে পারি!'

'বলুন না!'

'বুদ্ধির জন্য। বুদ্ধির চাষ করলে দেহকে ঘৃণা করতে শেখে।'

'ঠিক বলতে পারলেন না। ছেলেবেলায় উঠতে দেরি হত, পড়াশুনা শেষ করে খাবার সময় থাকত না, ছুটে স্কুল-কলেজে যেতাম।'

'বেশী রাত জাগতেন বুঝি?'

'জাগতেই হত। রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডাই দিতাম, কলেজে সুনাম বজায় রাখতে হবে ত!'

'সেই একই কথা! আচ্ছা, ছেলেবেলা থেকেই খুব পড়াশুনা করতেন বুঝি?'

'করতাম, স্কুলে মন্দ ছেলে ছিলাম না, কলেজে হলাম দুর্দান্ত, পাঠ্যপুস্তক ভাল লাগত না, পড়তাম বাজে বই, যা পেতাম তাই।'

'দুর্দান্ত! আপনি আবার দুর্দান্ত!'

'সত্যি, কি রকম হয়ে যাই ঐ সময়টায়। ঠিক খারাপ হওয়া যাকে বলে তা হই নি, তবু একটু বুনো হয়ে যাই—ওয়াইলড্ গোছের।'

'বুনো? বলুন না, আপনার ছেলেবেলার কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।'
'বলবার এমন কিছু নেই, তবে……'
'তা আবার নেই! আপনি ত কলেজের কীর্তিমান ছেলে!'
'পরীক্ষায় নয়। তেমন কীর্তি কিছু রেখে আসি নি—এক ম্যাগাজিন বার করা, থিয়েটার করা, ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক করা ছাড়া: আমাদের সময় ধর্মঘট ছিল না। লেকচার শুনতাম নির্বাচন ক'রে। বাকি সময়টা আড্ডা আর আড্ডা, তারপর গভীর রাতে পড়া, পাগলের মতন পড়তাম, বই কিনতাম আর পড়তাম, বই-এর সঙ্গে ফাঁকি দিই নি। মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখতাম ও করতাম।'
'আবার থিয়েটার করাও হত? কিসের পার্ট করতেন? বলব? মেয়েদের, নিশ্চয়···বেশ মানাত!'
'তা বুঝি মানায় কখনো! তবে দিত জোর ক'রে, ছোট ছিলাম তাই। মেয়ের পার্টও করেছি, ভাল লাগত না, লজ্জা করত, আপনাদের পার্ট আমি বুঝি না। একবার অমৃতলাল শেখাবার জন্য এসেছিলেন, তিনি অবশ্য ভাল বলেছিলেন—কিন্তু ও সুখ্যাতির মানে নেই!'
'তাঁর সুখ্যাতির মানে নেই ত থাকবে বুঝি আ-মাদের!'
'সেবার চন্দ্রগুপ্তে অ্যান্টিগোনাসের পার্ট করি, মন্দ হয় নি, কিন্তু সে কি বিপদ!'
'হেলেন ও ছায়া সেজেছিলেন কাঁরা?'
'কলেজেরই ছেলে। সেই ত বিপদ! সে ভারি মজা হয়েছিল—সে সব কথা আপনি বুঝবেন না, পুরুষদের ছেলেমানুষি কথা শুনে লজ্জা পাবেন!'
'আপনিই দেখছি লজ্জা পাচ্ছেন। বলুন না, যদি অন্যায় না ক'রে থাকেন!'
'না, আমি আর অন্যায় করলাম কোথায়? আচ্ছা, বলছি। আমি ত অ্যান্টিগোনাস, একজন ছায়া, আর একজন হেলেন, দু'জনে কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে ভাল না বেসে আমাকেই ভালবেসে ফেল্লে। ভারি বিরক্ত করত! স্টেজে নয়, বাইরে। শেষে চিঠি পর্যন্ত! হোটেলে যেতে হবে, সিনেমা যেতে হবে, অথচ তারা নীচের ক্লাসে পড়ত। ছেলেরা ঠাট্টা শুরু করলে। পড়া বলে দিন, বই ও নোট ধার দিন, এই ক'রে সূত্রপাত। বন্ধুরাও মজা পেলে। আমার সঙ্গে তাদের আলাপ গাঢ়তর করবার দোহাই-এ দুচারজন চালাক ছোকরা তাদের ঘাড় ভেঙে খেতে লাগল। ভারি দুঃখ হত, কিন্তু তখন তাদের বারণ করে কে? শেষে দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া, প্রাণ আমার যায় আর কি!'
'কি করলেন?'

'দুজনের মধ্যে ভাব করাতে গেলাম, ফল হল না, আলাদা ডেকে প্রত্যেককে বোঝালাম, ফল হল না, একজনকে ডেকে এনে নিজের ছবি দিলাম, বল্লে তা হবে না, এক সঙ্গে ছবি তুলিয়ে তবে ঠাণ্ডা। অন্যটিকে আর সন্তুষ্ট ক'রতে পারলাম না; ভয় দেখাত, নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, উচ্ছন্ন যাবে চোখের সামনে। ছোকরা গেলও তাই, আমার সামনে নয়, আমি তখন পশ্চিমে বেড়াতে যাই, আমার দোষেও নয়, নিজের দোষে। সে দিন দেখা হয়েছিল, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, চেনাই যায় না, কিন্তু চোখ তেমনি ঢুলু-ঢুলুই আছে। এমনি ক'রে চাইলে যে আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেই দে ছুট!'

'আপনার ভারি অন্যায়!'

'নিশ্চয়ই নয়, অমন ভাবপ্রবণ, না, না, আমাকে আর দেবেন না, দই খাব না, আচ্ছা—তাই দেবেন দুপুরে ঘোল ক'রে—চিনি দেবেন না···কোথায় অন্যায় বলুন? মানুষ নাকি ঐ কারণে আবার উচ্ছন্ন যায়! ও সব মেয়েমানুষে, I mean অশিক্ষিত মেয়েরাই করে, পুরুষ আর মেয়েতে তফাত কি তা হলে? আপনি বুঝি তফাত আছে মানেন না?'

'জানি না······আর নেবেন না? পাখীর আহার···এইবার চলুন একটু জিরুবেন। ন্যায় অন্যায় নিয়ে তর্ক করতে আপনার সঙ্গে পারব না, তবু কেমন ইচ্ছে হয় শুনতে। চলুন, আপনার বন্ধুদের গল্প শোনা যাক, যদি একান্ত অনুপযুক্ত পাত্রী না মনে করেন।'

খগেনবাবু উঠে পড়লেন। (মুখ ধুয়ে ডিশ থেকে শুপারি এলাচ তুলে নিলেন, পান খেতে নেই বুঝি, মুখশুদ্ধি বলে না?)একজনের মৃত্যু, অন্যের শুদ্ধি; ভাল ব্যবস্থা। ওপরেরই বসবার ঘরে এসে বসতে না বসতেই রমলা দেবী এসে পড়লেন।

'রোদ্দুরের ঝাঁজ আসবে, পশ্চিমের জানলা বন্ধ ক'রে দিই?' 'কিন্তু একটু পরেই আমি যাব।' 'বেশত! রোদ্দুর একটু ঢলুক, ততক্ষণ বিশ্রাম করুন, তারপর যা হয়···'

'যা হয় নয়, আমাকে যেতেই হবে······আমাকে ছেড়ে দিন···এবার যাই?'

'ছেড়ে দিন মানে?'

'না, না, আমি তা বলছি না, মাপ করুন আমাকে···মানে—আমার কাজ আছে তাই বলছি। অনেক ধন্যবাদ······এখনি যাচ্ছি না ত, আপনি ঘুমুবেন না?··· এখন একটু বিশ্রাম করুন গে······বিকেলে আবার হয়ত দেখা হবে···কোথায় বা যাব?'

'যাবার পূর্বে চা খেয়ে যাবেন, না সরবৎ? বাড়ীতে খবর দিয়েছি।'

'চা—আপনি একটু জিরিয়ে নিন গে······'

রমলা দেবী চলে যাবার পর খগেনবাবু বিশ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় সুজন ধীরে ধীরে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এলেন। 'বড্ড দেরী হয়ে গেল আসতে, আপনি বুঝি···' 'না, আমি বেশ ঘুমিয়েছি, আমার ঘুম পাবে না, আপনি বসুন না, উনি এইমাত্র শুতে গেলেন।' 'না, না, ডাকবেন না, এখন না হয় যাই?' 'বসুনই না'। সুজন এসে চুপ ক'রে বসে রইলেন। অপরিচয়ের শূন্য ব্যবধানে খগেনবাবু আড়ষ্ট বোধ করছিলেন, সুজনের মুখে ও চোখে সহজ ভাবটি লক্ষ্য ক'রে আশ্বস্ত হলেন···'আপনি সিগারেট খান?' 'সচরাচর খাই না, এখন খাব না।' 'এক গেলাস জল দেবো? বাইরে বড় রোদ্দুর, তাই গেলাম না'। 'এই মাত্র খেয়ে আসছি।' 'তা হলে কি দেবো?' সুজন একটু হেসে উত্তর দিলেন, 'এ বাড়ির সঙ্গে, রমলাদির সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ।' তাওত বটে!. ইচ্ছা হচ্ছিল কতদিনের আলাপ জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু ঐ ধরণের প্রশ্ন করাটা অসভ্যতা মনে হল। পরিচয়ের আবার ক্রমিক ইতিহাস কি? দুজনে চিরদিন একত্রে বসবাস করলেও পরিচয় হয় না, আবার এক মুহূর্তেই ব্যবধান অপসৃত হয়, সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, হঠাৎ যেন চোখ খোলে, ছানি খসে যায়। ছানি কাটাতে হয়, অস্ত্রের সাহায্যে, অতি ধারালো ও সূক্ষ্ম অস্ত্র, কয়েক সেকেণ্ডের অস্ত্রোপচার, তার পর চোখ বেঁধে কয়েক দিনের জন্য শুয়ে থাকতে হয়, শবের মতন, সে সময় কাসতে পর্যন্ত মানা। পরিচয়ের জন্য ধীর, শান্ত ও মৌন প্রতীক্ষার প্রয়োজন, চারপাশের ভিড় সরান দরকার, গোধূলির নীরব অবসরে একটি তারা ফোটার মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝড়ের মধ্যে—ভাবপ্রবণতার আবর্তে, তাই আলাপ জমল না। রমলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় শুরু ঝড়ের পরে, ভাব যখন নিঃশেষিত হয়েছে, তখনও ঝড়ের স্মৃতি রেশ টানছে। সুজনের সঙ্গে কখন পরিচয় ঘটবে? ধরিত্রী যখন শীতল হয়েছে, ঝড়ের চিহ্ন যখন লোপ পেয়েছে, বিশ্রামের পর যখন প্রাণটা, চোখটা জুড়িয়েছে। সুজনের মধ্যে একটা শীতলতা রয়েছে, বর্ষাস্নানের শীতলতা, বরফের কঠিন শৈত্য নয়।

সুজন বল্লেন, 'আপনার খুবই কষ্ট হয়েছিল কাল!'

'কষ্ট একটু হয়েছিল বৈকি!'

'চোখের জ্বালা কমেছে?'

'অনেকটা। আপনার বুঝি চোখ খারাপ?'

'বিশেষ নয়।'

'জল পড়ে, মাথা ধরে?'

'পড়ত, চশমা পরে সেরে গেছে, তাই এখন আর বেশী পরি না।'

'অস্বস্তি হত না?'

'খুব, পরে অভ্যাস হয়ে যায়। কৃত্রিম, তাই কষ্টকর।'

খগেনবাবু হেসে বল্লেন, 'কৃত্রিমতাকে বাদ দেওয়াও চলে না।'

'তা বটে, তবু...'

'তবু কি?'

'অভ্যাস হয়ে গেলেই সহজ।'

'অভ্যাসের মধ্যেও জোর জবরদস্তি রয়েছে। জোর করেই অভ্যাস করতে হবেত!'

'আজকের জোর, পরশুর অভ্যাস।'

'সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে জবরদস্তী কোথায়?'

'সহজ প্রবৃত্তি, instinct-টাই তাগিদ। তার চেয়ে অত্যাচারী, জবরদস্ত কে আছে? জোরকে সভ্যতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না কিছুতেই।'

'রূপান্তরিত করাও যায় না?'

'তাও বল প্রয়োগে।'

'একটা কোথায় যেন পার্থক্য আছে মনে হয়।'

খানিক চুপ ক'রে থেকে খগেনবাবু বল্লেন, 'তফাত ভেতরের জোরে আর বাইরের জোরে। তাও এমন বেশী কি?'

'নিজের বেলায় সংযম, পরের বেলা অত্যাচার।'

'দুইই এক। দুইই উদ্দেশ্যচালিত।'

'উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না?'

'স্বীকার করাটি কি অর্থে প্রয়োগ ক'রছেন? অস্তিত্ব মানা আর সহজে আপন হতে ভাল লাগা এক বস্তু নয়। যে ব্যক্তি সংযমী সেও একটি সত্য কিংবা মিথ্যা আদর্শ খাড়া করে, যার তাগিদে সে সাধনা করে।'

'যদি আদর্শটা সত্য হয় তা হলে ক্ষতি কি?'

খগেনবাবু একটু জোরে হেসে উঠলেন, 'তা হলে আপনার মতে আদর্শের শ্রেণী-ভেদ আছে। কিন্তু সত্য বাছবেন কি ক'রে? লোকের ব্যবহার দেখে মনে হয় মিথ্যা আদর্শকেও সত্যে পরিণত করা যায়। সফলকাম হবার জন্ত যে আদর্শ মানুষকে যত বেশী খাটিয়ে নিতে পারে সেই আদর্শই ততখানি বেশী সত্য। তা

ছাড়া, সকলেই ভাবে নিজের আদর্শের জন্য খুবই খাটছে, অতএব নিজের আদর্শই সত্য, এক মাত্র সত্য। আমারও তাই ধারণা, সঙ্গে অন্যের তফাত হল এই যে, আমার বেলাই ঐ ব্যক্তিগত ধারণাটা সত্য, আমার অন্যের বেলা যাচাই দরকার।' সুজনের মুখে স্মিতহাস্য দেখে খগেনবাবু একটু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে বল্লেন, 'আদর্শের অত্যাচার আপনি মাথা পেতে নিতে পারেন? নিজের আদর্শই বলছি।'

'পারতে হয়।

'অত শীঘ্র দুহাত তুলে পরাজয় স্বীকার করতে শিখলেন কি করে?' কথাবার্তায় একটা ছেদ পড়ে গেল। খগেনবাবু সুজনকে একটা সিগারেট দিলেন, সুজন নিলেন না, কেসে সেটা রেখে আর একটি বার ক'রে ধরালেন।

'আচ্ছা সুজনবাবু?'

'সুজন বলুন।'

'আচ্ছা, সুজন, আদর্শ বুকের মধ্যে নিতে এত কষ্ট হয় কেন?

'জেনে শুনে নিলে কষ্ট হয় না বোধ হয়।'

'ঠিক বলেছ। জানলেই কষ্ট থাকে না। যাঁরা বলেন—ভগবানকে না মেনে উপায় নেই তাই মানতে বাধ্য হয়েছি তাঁরা ভগবানকে ত অপমান করেনই, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মত অমন একটি নিষ্কাম জিনিষকে দৈহিক অভাবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিজের শুদ্ধ অংশকেও অপমান করেন। আমি অবশ্য কোন নিষ্কাম ভাবের ওপর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না। আদর্শকে গ্রহণ করলেই সেটা নিয়তি হল, কিন্তু নিয়তির নিয়ম জানাই স্বাধীনতা। কিন্তু সকলে নিয়ম না জানতে চেয়ে আদর্শকে অন্ধভাবেই গ্রহণ করেন, জানেন ত?—তাঁদের বেলা?'

'তাঁদেরই কষ্ট।'

'কষ্ট নয় কেবল, মৃত্যু, অপমৃত্যু, ধার্মিকসমাজ আবার তাঁদেরকে martyr বলে! যে বিষ খায় সেই কি কেবল আত্মঘাতী? আশ্রমে আশ্রমে যাদের অপমৃত্যু হচ্ছে তাদের হিসেব কে রাখে? কোন আদর্শের এমন ক্ষমতা নেই যে পরকে গড়ে তোলে! গড়ে তোলা যায় না, যদি পর নির্বোধ হয়।'

'এখানে বুদ্ধির প্রয়োজন কি?'

'প্রয়োজন, নিয়তির নিয়ম জানতে। আপনার রমলাদিকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'আপনিই বলুন না'

'তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি বুদ্ধিমতী।'

'জানি , আপনি বলুন।'

'আমি কিছুই ভেবে ঠিক্ করতে পারিনি। বোধ হয়, আপনিই ঠিক বলেছেন। রমলা দেবী থাকলে এই কথাই বেশী ভালভাবে গুছিয়ে বলতেন, ডাকুন না। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

'তার চেয়েও বেশী।'

'আর বেশী কি হতে পারে?'

'হৃদয় আছে।'

'নিজের হৃদয়েরই পরিচয় দিচ্ছেন।'

'আলাপ করলেই টের পাবেন।'

'পূর্ব হতেই সাহায্য করুন।'

'বন্ধুত্ব করাতে আমি খুবই তৎপর। আজ কিন্তু নয়, রমাদি আসবার আগেই যাই, কাজ আছে।'

'আপনার সকালে আসবার কথা ছিল না? আবার না দেখা করেই পালাচ্ছেন?'

'কাজ ছিল বল্লেই তিনি বুঝবেন।'

'আপনিও দেখছি খুব কাজের লোক!'

'কাজের নেশা আছে স্বীকার করি।'

'সত্যি! ঐ নেশাই বোধ হয় সব চেয়ে ভয়ঙ্কর! বোধ হয়, জীবনে কখনও কাজকে ছুঁইনি সেইজন্যে। কাজেব নেশার ভয়ে চিন্তাশীল হয়েছি।'

'চিন্তাব পিছনে ভাষা আছে এবং ভাষাব আদিতে ও অন্তে কাজ আছে এই শুনেছি, আপনি কি মনে করেন?'

'ঐ ধবণেব ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞানে বিস্তর গলদ আছে। এই ধরুন, একজনকে আমাব অন্যেব চেয়ে বেশী ভাল লাগছে। এই আপেক্ষিকতাব অন্তরে কাজের কোন বালাই নেহ। বেহাগ বাঁচিয়ে শঙ্কবা গাওয়া হচ্ছে, দুটো বাগিণীব মধ্যে পার্থক্য বেশ বুঝলাম, এই পার্থক্যানুভূতিব মধ্যে কাজের তাগিদ কোথায়?'

'তৃপ্তিসাধনেব ফলে দৈহিক সামঞ্জস্যবিধানে?'

খগেনবাবু একটু বিস্মিত নেত্রে সুজনেব দিকে চাইলেন, বেশ শান্তভাবটি, সুজন চোখ নামিয়ে নিলে—তাবপর আস্তে আস্তে বল্লে, 'অবশ্য, একে কাজ নাও বলা চলে।'

'সামঞ্জস্যবিধানও কাজ বটে। বোধ হয় সব চেয়ে বড কাজ।'

'আচ্ছা এখন আমি যাই, রমাদি উঠে পড়লে আমার যাওয়া হবে না।'

'চলুন আমিও যাই।'

'এই রোদ্দুরে! সে হতেই পারে না।'

'রমাদি বুঝি আটক করবেন? এলে যাওয়া হবে না কেন?'

'নিজেই আটক হব।'

সুজন আস্তে আস্তে দরজা খুলে চলে গেল। খগেনবাবু চুপ ক'রে শোফায় শুয়ে রইলেন। খানিকপরেই রমলা দেবী এলেন, পর্দা সরাতেই চোখাচোখি হয়েছিল। উঠে বসতে বসতে খগেনবাবু ধুতিটা পায়ের আঙুল পর্যন্ত টেনে দিলেন, 'বসুন'

'ঘুমিয়েছিলেন?'

'না, সকালে যা ঘুমিয়েছি, আপনি ঘুমোননি?

'দুপুরে ঘুমুই না।'

'মেয়েদের মধ্যে যাঁরা দুপুরে ঘুমোন না, তাঁরা সন্ধ্যাবেলাতেই ঢুলতে থাকেন। অবশ্য ঐ সময় আপনাদের পার্টি থাকে।'

রমলা দেবী একটু হাসলেন। খগেনবাবু বল্লেন, 'অবশ্য আপনার কথা নয়, আপনি (সুগৃহিনী,) নচেৎ এই শ্রী আসে কোথা থেকে?'

'চা এখনি দেবো? চলুন ঐ ঘরে।'

'এই ঘরেই আসুন—(চা-এর সময় অ-সময় নেই, বোধ হয় স্থান অস্থানও নেই,) পারছিনা উঠতে।'

রমলা দেবী নিজ হাতে (ট্রে সাজিয়ে আনলেন, কাচের টপ্ দেওয়া একটি ছোট টেবিলের ওপর ট্রে, আর একটির ওপর কিছু ফল রেখে চা ঢাললেন।)

'সুজন এসেছিল।'

'সুজন? চলে গেল বুঝি?

'কাজ আছে বল্লে, কাজ নেই বুঝি?'

'থাকবে না কেন? সরে যাওয়াই ওর কাজ; হয়ত বিজনের কাজে গিয়েছে, টেনিস র‍্যাকেট্ সারাতে।'

'সৎ ছেলে।'

রমলা দেবী চুপ ক'রে রইলেন দেখে খগেনবাবু প্রশ্ন করলেন,

'এটা বুঝি (গোয়ালিয়রর পটারির?')

'না'

'বিলিতী?'

'হুঁ, সেটটা পুরানো, গোয়ালিয়রের ফিনিশ, ভাল কি ?'

'চমৎকার হচ্ছে আজকাল। আপনি বুঝি বিলিতীর ভক্ত ?'

'না'

'না আবার! শাড়িতেই নন কেবল।'

'যার যেটুকু ভাল তার সেইটুকু নিতেই ভাল লাগে।'

'মানুষ হাঁস নয়।'

'আপনার ত তাই বিশ্বাস! গোটা মানুষকে নিতে পারেন? দোষগুণ মিশিয়ে ?'

খগেনবাবু নীরব রইলেন। সত্যি কথা, গুণই তিনি ভালবাসেন, মানুষকে নয়। কিন্তু বিলিতী জিনিষ ভালবাসি বলবার মধ্যে দাম্ভিকতা আছে। রমলা দেবী ফ্যাশানের বিপক্ষে গিয়ে ফ্যাশান করতে চান। সাবিত্রীর সঙ্গে এই জন্যই তাঁর রুচিবিরোধ ঘটত, শিষ্য আবার গুরুর চেয়ে এক কাটি সরেশ। এই গান্ধীর যুগে ভারি বিসদৃশ ঠেকে, একেবারে অসভ্যতা। সাবিত্রী বলত, খদ্দর পরাটাই ফ্যাসান, শীতকালে তবু চলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অচল। তা নয়, জর্জেটের ভেতর দিয়ে পেটীকোট দেখান যায়, খদ্দরের ভেতর দিয়ে যায় না—সাবিত্রী ঐ কথা শুনলে চটে যেত, কিন্তু হাসি চাপতে পারত না, চাপতে গিয়ে ভাষা বেশী ঝাঁজাল হত, বলত, 'ভারি অসভ্য, অভদ্র', খগেনবাবু তখন নব্যমনোবিজ্ঞানের নজীর উদ্ধৃত করতেন, পোষাকের ইতিহাস বলতেন, সাবিত্রী উত্তর দিত, 'ঐ সব অভদ্র ইঙ্গিতপূর্ণ বই পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে জাননা।' খগেনবাবু জবাব দিতেন, 'পরবে জর্জেট আর ব্রাসিয়ার, মাখবে পাউডার পমেটম, আর ফ্রয়েড্ ফ্লুগেলে আপত্তি! যদি না জানতাম!' 'কি জান, এখনি বল, বলতেই হবে, ছাড়ব না।' খগেনবাবুর মুখে প্রত্যুত্তর আসত অনেক, কিন্তু বহিষ্কৃত হতে না পেরে অস্ফুট উত্তরগুলি চিবুককে সুদৃঢ় করেই তুলত। জবাব না পেলে সাবিত্রী বেশী চটে যেত, তাই দেখে খগেনবাবু অপ্রস্তুতের হাসি হাসতেন, ভাবতেন, মেয়েরা কখনও বিজ্ঞানকে বরদাস্ত করতে পারে না, কারণ মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করতে পারে, পৌনঃপুনিক জননী হতেও আপত্তি করে না হয়ত, কিন্তু ভাববার কষ্ট সহ্য করতে পারে না; তারা সব অনুরোধ রক্ষা করবে, গভীর রাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে স্বামীর সিগরেট ধরাবার জন্যে দেশলাই এনে দেবে, কিন্তু ভাববার অনুরোধ পালন করবে না; চেষ্টা করবে ভ্রূ কুঁচকে, গালে হাত দিয়ে, ছোট্ট ফাউনটেনপেন ঠেকিয়ে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভাবা নয়, উদ্দেশ্য, আমি

ভাবছি, ভেবে তোমাকে কৃতার্থ করছি, আর ভাবতে ভাবতে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ, বল—উদ্দেশ্যটি এরি আমন্ত্রণ, পালটা অনুরোধ। রমলা দেবীও নিশ্চয়ই ঐ প্রকৃতির, (গান্ধী এসে ভাবিয়ে তুলেছেন বলেই তাঁর খদ্দর পরা হল না, জর্জেটে কোন ভাবনার খোঁচা নেই, বেশ মিহি। তাই, উলটে, খদ্দর পরার ফ্যাসানের নিন্দে, তার বিপক্ষে বিদ্রোহ, যার যেটি ভাল বেছে নেবার অজুহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা। এঁদের সঙ্গে কথা কওয়া চলে না, খোসামোদ. তাও চেহারার। কী অদ্ভুত ধারণা ছিল সাবিত্রীর! (কুরূপাই পড়াশুনা করে, বড় বড় কথা কয়, মেয়েদের অনুপযুক্ত ও অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করে, পাশ করলে চেহারা খ্যাংরাকাটির মত হয় মুখ আমসি হয়, চোখ কোটরে ঢোকে, চোখের কালি ঢাকতে চশমা পরতে হয়, হাতে চুড়ি ঢলঢল করে, গড়ন খারাপ হয়, মেজাজ রুক্ষ হয়, মেয়েলী মিষ্টত্ব লোপ পায়, সুখী হয় না · আরো কত কি? একলা সাবিত্রীদের দোষ কি? (বিদুষীরা সাজগোজ করেন না ঐ একই কারণে, সুন্দরী নন জেনে ও রেগে। সমাজের ওপর তাঁদের কি ভীষণ অভিমান!) (আজ যদি হেদোতে ডুব দিলে কুরূপা সুরূপা হতেন, তা হলে হেদোর পশ্চিম দিকের প্রতিষ্ঠানটি অনেক পূর্বে উঠে যেত!) মন্দ হত না, পৃথিবী সুন্দর হত। (হেদোর পূর্বদিক আনন্দময় হয়ে উঠত।) তখনই পড়াশুনার যথার্থ কদর হত, তখনই খদ্দর ও জর্জেটের পার্থক্য ধরা পড়ত। ইতিপূর্বে মুড়ি ও মিছরীর দরের তফাত দাম্ভিকতায়, সৌন্দর্যের আভিজাত্য-বোধে। মেয়েদের দাম্ভিকতা সহ্য হয় না, মানলে বেড়ে যায়, অথচ অভদ্রতা করা যায় না, মাত্র শ্লেষই চলে।

'আপনাকে কিন্তু খদ্দর পরলে মানাবে ভাল।'

'আমাকে মানাবার জন্য ব্যস্ত কেন?'

'আরো সুন্দর ভালবাসি বলে।'

'ওটা অভ্যাস-মাত্র।'

'অভ্যাস নয় অভাব।'

'ফল খান।'

'ফল খাই না, দেখি, দেখতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না। চোখেরও ভোগ আছে।'

'ফল খাওয়া ভাল।'

'ভিটামিনের উল্লেখ করবেন না। জোড় হাত করছি। চা-এর সঙ্গে ফল অচল। তা ছাড়া মনে হয় রোগী। সাবুর সঙ্গেই ফল, চা-এর সঙ্গে ডালমুট।'

'খাবেন? আনাব?'

'এখন থাক, অসুখ হবে বল্লেন না!'

'ভুল হয়েছে। অভাব কেন? সাবিত্রীত দেখতে খুব..... '

'সুন্দর ছিল। বলতে খটকা বাধে, নয়? কত শীঘ্র সময় কাটে! ঘণ্টায় ৩৬০০ সেকেণ্ড বেগে। অতীত অকস্মাৎ হাজির হয়, যেন রবাহুতের মত, আগন্তুকের মত, বাড়ির এক পাগলা খুড়োর মত, অসময়ে—নয়?'

'হাজির হয়, না চলে যায়? ভবিষ্যতই আসে...'

'আর বর্ত্তমান?'

'এই মুহূর্ত্তটুকু, ভারি পিচ্ছিল। নেই।'

খগেনবাবুর হাতে জ্বলন্ত দেশলাই কাটিটা নিবে গেল—চা-এর ডিশে ফেলে দিলেন...

'দেখুন, আমার সব গুলিয়ে যায় সময় সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই। পিছলে যায়ই বটে। কোনটাকে আঁকড়ে ধরব? এক অতীতকেই ধরা যায়, কিন্তু তার জন্য চোখ দুটো সামনে থেকে টেনে উপড়ে মাথার পিছনে বসাতে হয়, পা দুটোকে পিছনমুখো করতে হয়। ভূত হতে রাজী নই। অথচ, কি বিপদ! ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে পারি না, তার গায়ে আংটা নেই, টাকারই মতন। কি আর করি?...দিন এক কাপ চা।'

রমলা দেবী ডিশটা বদলে দিলেন। ফিকে হলদে চায়ে আপত্তি জানাতে রমলা দেবী পটে একটু চিনি ও দু'চামচ পাতা দিলেন। লালচে লিকার শীঘ্রই তৈরী হল। পেয়ালা হাতে নিয়ে খগেনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বর্ত্তমানটা কি?'

'জানি না। আপনিই বলুন না?'

'বর্ত্তমান দেখছি আপনি—অর্থাৎ আপনার সেবাযত্ন খাওয়া।'

'সেবাযত্ন নিতে জানা চাই।'

'আমি খুব নিতে ভালবাসি, আদর খেযেই মানুষ।'

'শুনেছি সব। আপনার মাসীমা আপনাকে যত্ন করতেন খুব।'

'খুব, ছেলেবেলার কথা মনে নেই। তার পর মাসীমা—মাসীমা আমার বড় ভাল ছিলেন। তার পর সাবিত্রী এল, সেও যত্ন করতে যেতো।'

'যেতো!'

'পারত না, আমার ভাল লাগত না।'

'কি রকম ভাল লাগে?'

খগেনবাবু মুখ নীচু ক'রে হেসে বল্লেন, 'এই যেমন আপনি করেন। অর্থাৎ নীরবে, দাবী না ক'রে: (প্রতিদিনের প্রত্যাশা না ক'রে যে আদর করে তাকেই ভাল লাগে, আমি বলছি, সেই আদরই ভাল লাগে।) ঠাট্টা করছি না। (দেহি দেহি করলে দিতে ইচ্ছা হয় না, প্রাণটা কৃপণ হয়ে যায়!') রমলা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'একমাত্র সুজনই দেহি দেহি করে না, সে কেবল দিতেই জানে, তাই সে যা পায়…'

'ও বুঝি খুব পায়? আপনি ত বল্লেন সুজন সর্বদাই ব্যস্ত। (যে লোক পরের জন্য জীবনধারণ করে তার নিজের অবশিষ্ট থাকে কতটুকু?) ঐ প্রকার চরিত্র ঠিক বুঝতে পারি না।'

'সুজনের নিজের জীবনও আছে, বড় চাপা, আপনি নিজেই দু'দিন পরে বুঝবেন।'

'গভীর ছেলে বলুন!'

'মোটেই না, অতি সরল।'

'পরমহংস দেব! মাপ করবেন, ঠাট্টা করছি না। কি বলছেন বোধ হয়ত বুঝতে পেরেছি। গিরীশ ঘোষের কালাপাহাড় পড়েছেন নিশ্চয়? গিরীশ ঘোষের নাটক পড়া কি দেখা ফ্যাশন নয় জানি, তবু যদি কখনও হঠাৎ হাতে এসে পড়ে থাকে তাই উল্লেখ করছি। কালাপাহাড়ে চিন্তামণি নামে একটি চরিত্র আছে, সে নিজে কিছুই করছে না, অথচ কেন্দ্রের চারধারে বৃত্ত যেমন ঘোরে তেমনি সব চরিত্রই তার চারধারে ঘুরছে, এবং সেই কেন্দ্রচরিত্রের সম্পর্কে এসেই তারা সার্থক হয়ে উঠছে। ঘরে-বাইরের মাস্টারমশাই, ক্যারামজভ্ ব্রাদার্সের অ্যালিয়শা ঐ ধরণেরই চরিত্র; বাকি চরিত্রের অভিব্যক্তি আছে, তাঁদের ক্রমবিকাশ নেই, গোড়া থেকেই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্ভু। ওঁরাই স্থির ও শান্ত, কারণ ওঁরাই আছেন, বাকি সকলে অস্থির, কেননা তাঁরা তৈরী হচ্ছেন।'

'আমি সুজনকে শ্রদ্ধা করি।' রমলা দেবীর স্বরে অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে খগেনবাবু একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। একখানা বিস্কুট চাইলেন, 'খালি পেটে চা-পান না অস্বাস্থ্যকর?'

'যার যা ধাত!'

'স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চাইনি, যত্ন পেতে চাই।'

'তা হলে যাই যাই করছিলেন কেন?'

'বাড়ি খালি পড়ে আছে। তা ছাড়া যোগাড়যন্ত্র করতে হবে, ঐ সব কাজের জন্য। বাড়িটা রাখব না ছেড়ে দেবো? চাবিপত্র সব কোথায় কে জানে?

সব লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে।' 'বাড়ি যেমন ছিল তেমনি আছে। ও সব কাজ বোধ হয় করতে নেই। সে চাবিপত্র কোথায় রাখত আমি জানি।'

'জানেন? তা হলে বাঁচা গেল। আপনি যদি—একবার কিছু যদি না মনে করেন, একবার যদি গোছান যায় আমার সুবিধায়, তা হলে আর গোল থাকে না। একবার চলুন না?'

'নিজে পারবেন না?'

'জানি না যে! গেলে খুব ভালই হোত! আচ্ছা, নিজে গিয়েই দেখি, তার পর না পারি আপনাকে একবার, ও সুজনকে নিয়ে যেতেই হবে। ভাবছি বাড়িটা ছেড়ে দেবো। যেতে ভাল লাগছে না, থাকতেও ভাল লাগবে না, অথচ অমন সুবিধা। বাড়িটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বইগুলো রাখবার জন্য গা আলমারি করিয়ে নিলাম এই সে দিন! তাই নিয়েই বা কত আপত্তি! বলছিল, প্রয়োজন নেই অত খরচ ক'রে ছোট বাড়িতে, অথচ না হলে চলছিল না, শোবার ঘরে বই-এর জন্য তার দম আটকাত। বই-এর জন্য কারুর দম আটকায়? আপনিই বলুন না? দম বন্ধ হয়, টেবিল চেয়ারে।'

'মেয়েরা অগোছ রাখতে ভালবাসে না।')

'মোটেই না, এমন অগোছাল মেয়ে দেখেছি যে কী বলব! (তার আপত্তি ছিল অগোছে নয়, বইএতে। আর, আমি বই গুছিয়েই রাখি।'

'তা বোঝা গেছে, চা খাওয়া দেখে।'

'সে এখানে; একটু হাত পা ছেড়ে বিশ্রাম করব না? মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল না হলে চলে না।'

'আমিও তাই বলি, হতে পারি না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়, নয়ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

'আমিও ঠিক ঐ কথা বলি, সাবিত্রী তা মানত না। তার ধারণা ছিল সর্বদাই মুখোমুখি ক'রে বুঝি স্বামী স্ত্রীতে বসে থাকতে হয়।'

'না বুঝে করত।'

'সে জন্য ক্ষমা করা যায় না, বয়েসও হয়েছিল। (যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি—) তার সমালোচনা ক'রে কোন লাভ নেই—এখন সে অতীত। ভাল লাগছে না ভাবতে····· এখনি বাড়ি যাই কাজ রয়েছে। আমার আরাম করা সাজে না। এইবার যাই? একবার সুজনকে নিয়ে, যদি ফুরসৎ পান···'

'এখনই?'

'না, না এখন না, যখন সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি কি ? নিজেই পারব বোধ হয়, যদি না পারি তখন না হয় দেখা যাবে। আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করলেন, কিন্তু ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করছি না।'

খগেনবাবু বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিচে দরজা পর্যন্ত কমলা দেবী নেমে এলেন।

'একটা অনুরোধ।

'কি ?

'এখানেই সন্ধ্যেবেলা খাবেন

'দেখি, যদি খাবার না জোটে আসতেই হবে। মুকুন্দের কৃপা।'

৩

খগেনবাবু কলেজ স্কোয়ারে এলেন। যুবকবৃন্দ দল বেঁধে ঘুরছে, ঘাসের ওপর ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। রং বেরং এর ফ্রক আর ফিতে। একটি যুবকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, খগেনবাবু নিজেকে সামলে নিলেন, যুবকটি ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল, পৃথিবীতে ছোকরা নাম রেখে যাবে। এই সেই তাল গাছ যার তলায় আড্ডা বসত, নাম ছিল পাম লীগ। সকলেই ইনষ্টিটিউটের সভ্য, কিন্তু সেখানকার সংযত আমোদে প্রাণ ভরত না, তাই সাড়ে আট-টার পর ইনষ্টিটিউট বন্ধ হলে সকলে এই তালগাছ তলায় আড্ডা জমাতেন। গান, আলোচনা, খোস গল্প, সবই হত। সেই দলের মধ্যে আবার ছোট্ট গণ্ডী ছিল, যার সঙ্গে যার ভাব বেশী তাদের নাম জুড়ে দেওয়া হত, একজন না এলে অন্যকে নিয়ে তামাসা চলত, তারপর রাত ন'টা দশটায় চা খাওয়া, থিয়েটারের আখড়া দেওয়া, বাড়ি ফেরার পথে বই ও নোট-সংগ্রহ করা তারপর চুপি চুপি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ, মাসীমা ঘুমিয়ে পড়তেন, তারপর পড়া সুরু হত, রাত দুটো পর্যন্ত —সূর্য উঠত সাড়ে আট-টায়, এগারটায় কলেজ, আবার আড্ডা, আবার কলেজ স্কোয়ার, কি না হত সেখানে। দিনগুলো সব উড়ে যেত, বন্ধুরা ছিল সব মজার! প্রত্যেকেরই জীবনে এসেছিল এক একটি অনন্ত মুহূর্ত, প্রত্যেকেরই সেই মুহূর্তটি ফসকে গিয়েছিল, তাই প্রাণে ছিল সকলেরই ব্যথা। প্রত্যেকেরই ঠিক নয়, এমন দু'একজন ছিল যাদের জীবন সার্থক, যারা না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করত, যাদের

দেখেই বৌদির বাপের বাড়ীর, বোনের শ্বশুর বাড়ীর, মেয়ে-কলেজের বাসগাড়ির সব অনূঢ়া কন্যা ও কিশোরী প্রেমে পডত, আত্মনিবেদন কবতে প্রস্তুত হত, চিঠিতেই তাব প্রমাণ, হাতের লেখা গোল ধরণেব···কিন্তু তারা 'ও-ধরণের' নয় বলেই কোন ব্যাপাব ঘটেনি·····(বিরক্ত) তারা যতদূব জানতে পেবেছে তাতে তাদেব প্রতীতি জন্মেছে এই যে সেই সব মেয়েদের জীবনে দাগ থেকে গেছে, কেউ বিবাহের দিন কেঁদে ভাসিয়েছে, কেউ বিবাহ না ক'বে মাষ্টারি নিয়েছে, কেউ বা সন্তানের মা হয়েও বুকে আগুন পুষে রেখেছে, তিব্বতী লামাব মত। ভাগ্যবানেব সংখ্যা কমই ছিল। খুব কম বন্ধুদের ভাগ্যে মেয়ে জুটত, জুটত যারা তারা ভিন্ন জাতির। সব গল্পই প্রায় মিথ্যা, নিছক মিথ্যা, তবে আত্মবিশ্বাসেব জোবে মিথ্যাও সত্য হয়ে উঠত, তাই মজা লাগত! মেয়ে পাওয়া যেত না, তাই ছেলের সঙ্গে প্রেমে পডতে হত। আজকালকার কত সুবিধা! সত্যের সন্ধান মেলেনা তাই মিথ্যা রচনা করতে হয়, মিথ্যায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তখন পাবা যেত, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা বোধ হয় যৌবনের ধর্ম। সাপের খোলশের মত মিথ্যা পরে খসে যায়, পুরাতন সবেরই মত, মাসীমাব স্নেহেব মত, সেগুলো সে-সময়-কারেরই উপযুক্ত। (সত্য চিরন্তন নয়, কালোপযোগিতার খাদে অশুদ্ধ।) আজকার সত্য, আসছেকালের মিথ্যে, ইতিমধ্যে জীবন চলেইছে। বেঙ্গলী ব্যাট্যালিয়নের স্মৃতিস্তম্ভে যাদের নাম খোদাই করা আছে তাদের মধ্যে দু'একজনকে খগেনবাবু চিনতেন। করাচী যাবার আগের দিনের কথাও মনে পড়ে, কি ফুর্তি, অন্যের, যারা যাচ্ছে না। তারা চলে গেলে পরের দিন সেই আড্ডা বসল, দু'একজন কেবল আসেনি! যে কে সেই! অথচ দুঃখ যে হয়নি কে বলবে!

খগেনবাবুব বন্ধু না হলে পড়া হত না, বন্ধু না হলে খেলা দেখা, ছবি দেখা হত না। চা-এর দোকানে তাঁর বিলই লম্বা হত, মাসীমা বিনা আপত্তিতে টাকা দিতেন। মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে একটি ছোট্ট সুন্দর ছেলে যেত, তাকে এক শিশি ল্যাভেণ্ডার দেবার জন্য কি বোকামিটাই না কবা গিয়েছে। খগেনবাবু আবার একটি ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, ছেলেটি সাঁতারেব পোষাক পরে বেডা ডিঙিয়ে ক্লাব রুমে ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ খগেনবাবুর গায়ে এসে পড়ল। বেশ বলিষ্ঠ গঠন, কিন্তু লাজুক, না হলে ছুটে যাচ্ছিল কেন? কলেজ স্কোয়ারে বড ভিড, হাঁটা যায় না, কোথা থেকে এত ছেলে এল? অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কোলকাতা সহরে ভিড থেকে পরিত্রাণ নেই। বাড়ি পৌছে সদর দরজায় খিল দেবেন, তাবপর নিজের ঘরে শুয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে দেখেন ইনষ্টিটিউটে এক সভা বসেছে,(মোটরের গাঁদি লেগেছে!) এঁদের সব সার্থক জীবন, কেউ স্মাইলস সাহেবের বই থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কেউ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সার্থকতা ভোগদখল করছেন। এঁদের বাড়ীতে সব বড় বড শোবার ঘর আছে, সেখানে বড় বড় খাট পালঙ, নেটের মশারি ঘেরা, তার মধ্যে ট্রাজেডী। কারুর ছেলে মাতাল, মা লুকিয়ে মদের টাকা জোগান, পিতা আপত্তি করেন, কারুর স্ত্রী চিররুগ্না, কেউ বা অভিযোগই শুনে আসছেন, এত রাত্তিরে বাড়ী এলে কেন? সকলের ব্যাঙ্কে টাকা থাকুক আর নাই থাকুক, সকলেই পরস্পরের মূল্য নিরূপণ করেন টাকা দিয়ে। এঁরাই কোলকাতার বড় লোক, সভাসমিতির প্যাণ্ডাল অলংকৃত করেন! খগেনবাবুর গা গুলিয়ে উঠল, ভারতবর্ষের আদর্শ কোথায় গেল? (এই দেশেই না মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়?) রমলা দেবী ত তাই বলছিলেন, ঠিকই বলেছেন, নিষ্কাম ধর্মের মর্মই তাই। কিন্তু পারা যায় না, দোষগুলিই প্রথমে চোখে পড়ে। সাবিত্রীর দোষ ছিল, হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই, গুণও যথেষ্ট ছিল। (নিষ্কামভাবে দেখার অর্থই হল গোটাভাবে দেখা, অংশ দেখে বিচার করা নয়।) ভারি শক্ত কাজ, সাধনার প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম কি উদ্দেশ্যবিবর্জিত? সুজনের সঙ্গে বৃথা তর্ক করলেন, অন্যে তাঁর মনের কথা বলছে শুনে, তাঁর মনেব গোপন কন্দরের সমর্থন করছে দেখে তাঁর বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি নেচে উঠছিল। আদর্শ মানতেই হয়, সেই আদর্শের মাপকাটিতে হবে নিষ্কাম কর্মের সাধনার বিচার। নচেৎ নিষ্কাম কর্ম ভয়ঙ্কর জিনিষ। মধ্য যুগের শেষে মার্টিন লুথার ও ক্যালভিনের আশীর্বাদে নিষ্কাম কর্ম-প্রবৃত্তি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে টাকা রোজগারে নিযুক্ত হল, সেই থেকে ধনিক-তন্ত্র, তাই ইনষ্টিটিউ-টের সামনে মোটরের ভিড়, যার জন্যে পথচলা যায় না।। টাকা রোজগার করতে গেলে সন্ন্যাসী হতে হয়, সংসারের অন্য কর্ম থেকে বিরত হতে হয়·· বড চাকরে হতে গেলেও তাই, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, আত্মসম্মান, সংসার, সব জলাঞ্জলি দাও! এ-যুগের সার্থকজীবন এক প্রকার বৈরাগ্য সাধন, তার মূলে থাকা চাই একরোখামী, গোঁড়ামি, পিউরিট্যানিজম। সেই মূলের অন্য কাণ্ড হল বিশেষজ্ঞের মূর্খ অর্থহীন আত্মাভিমান, আত্মপ্রসাদ। (আগে ছিল জ্ঞান, সর্বতোমুখী জ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞানে-নিবদ্ধ জ্ঞান, এখন আর বিজ্ঞান বিশদ জ্ঞান নয়, বিশেষজ্ঞের ষড়যন্ত্র। তাই বৈদগ্ধ্য গেছে লোপ পেয়ে, তার আসনে বসেছে দম্ভ।) তাই বলে এ-যুগে কোনপ্রকার ধর্মের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়াও যায় না। পূর্বেকার নিষ্কাম ধর্মও

ছিল ভয়ঙ্কর, ব্রাহ্মণেরা ছিলেন নিষ্কামভাবে ধার্মিক, এখনকার বিশেষজ্ঞেরা যেমন নিষ্কামভাবে বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক, দুই-ই অত্যাচারেব নামান্তর। আজ-কালকার ধনীরা নিষ্কামভাবে পবের উপকাব করছেন, সেবাশ্রমে উপকাবেব বন্যা ছোটাচ্ছেন, কিন্তু হচ্ছে কি? চার্লি চ্যাপলিনেব কিড ছবিখানায় তার মুখের মত জবাব আছে। এই ধবণের নিষ্কাম হিতসাধনের উত্তর দিয়েছিলেন এক ভদ্র মহিলা। কলেজে পডবার সময় দামোদরেব বাঁধ ভাঙে, কত গ্রাম যায় ভেসে, বন্যাপ্রপীডিতেব সেবার জন্য ছাত্রবৃন্দ টাবমিন্যাল পবীক্ষাব এক সপ্তাহ পূর্বে স্বেচ্ছাসেবকেব দল তৈবী করে, খগেনবাবুও যোগ দেন। সাবাদিন নৌকা ঠেলে, চা সিগাবেট খেয়ে, খিদের চোটে, মাথাব ব্যথায় সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্র গৃহস্থের বাডী উপস্থিত হন। সেখানে তখনি সাহায্য-প্রার্থী গবীব চাষাভূষো এসে হাজির হল। খগেনবাবুর বন্ধুবা চটে যান তাঁদেব দেখেই দলেব নেতা বলে ওঠেন—'ব্যাটারা আন্দাব পেযেছে, গন্ধে গন্ধে এসে হাজিব, এধাবে পেট বাপান্ত করছে।' বাড়িব অধিকারিণী ছিলেন একজন প্রৌঢা, বিধবা, তাঁর কাছে মাছেব ঝোল আর ভাত, লেবু আব দই খেয়ে কি তৃপ্তিই না হোলো। ঠিক মাসীমাব মতন দেখতে। সকালে না খাইযে ছাডলেন না, নমস্কাব কবে নৌকায় ওঠবাব সময মহিলাটিব মুখ থেকে একটি বাক্য নিঃসৃত হয়, 'বাবা তোমরা যদি এদের মানুষ না ভাব, তা হলে এদেব উপকার কবতে এলে কেন?' নৌকাতে উঠে সর্দার বলছিল, 'এমন ভাবপ্রবণ হলে চলে না, নিষ্কামভাবে কাজ কবে যাব, যা হয হবে।' মন্তব্যটি খগেনবাবুব খারাপ ঠেকেছিল, সেই মহিলাটি ঠিক বুঝে-ছিলেন, বমলা দেবীও তাই বল্লেন। পরকে গডতে যাওয়াও অন্যায, অধিকাব ত নেইই, আত্মাভিমান আছে, তবে নিষ্কাম ধর্মের রূপ নিযে। আসল কথা, একজন অন্যের ব্যবহারেব সামগ্রী নয়, উপকাবেব বিষয় নয়, উপকবণ নয়, প্রত্যেকেই শেষ, কেউ কারুর নিমিত্তমাত্র নয। এ ভিন্ন নিষ্কাম-ধর্ম কথার কথা। সুজন বোধ হয় ঐ ইঙ্গিতই কবছিল। আদর্শ না মানা গেলেও values মানতেই হয, মানুষ ছাড়া নিষ্কামধর্মও নিবর্থক—এই হল সুজনেব মত। সুজনেবও মত, রমলা দেবীরও মত। তার নিজের কি মত? মত এখনও তৈরী হযনি, তবে হচ্ছে, হবার সুযোগও হযেছে, সাবিত্রী থাকতে সুযোগ মেলোন। সাবিত্রী তাঁকে ভেবেছে তার সুখেব উপাদান হিসেবে, ভর্তা হিসেবে, সামাজিক স্থানেব আসন হিসেবে, মোটবের পাদানি হিসেবে। এতদিন একত্র বাস করা গেল, কৈ সাবিত্রী ত তাকে একান্ত করে দেখেনি, মানুষ মনে করেনি। স্বামী কি কেবল

সম্পত্তি, ভোগ্যমাত্র? অবশ্য দেখা শক্ত, তিনিও দেখেননি, তবে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মেয়েদের পক্ষে ঐ ভাবে দেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। কি করেই বা দেখা সম্ভব! খগেনবাবুর বীজ অন্য, সে-বীজের ব্যবস্থা ও বিন্যাস ভিন্ন, তাঁর ইতিহাস পৃথক, তাঁর শিক্ষা, তাঁর রুচি, তাঁর আশা ভরসা সবই তাঁর নিজের, অতএব আলাদা, অথচ প্রকৃতির নিয়ম, সমাজের হুকুম হল স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিতে হবে আদর্শ, স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হবার জন্য। এ কি জুলুম! চাপ পড়ে তারই উপর যার পার্থক্যানুভূতি বেশী, এখানে স্ত্রীপুরুষের কোন কথাই ওঠে না। বমলা দেবী আর সাবিত্রী সমশ্রেণীর নয়। সাবিত্রী ছিল ঐ প্রাকৃতিক ও সামাজিক জুলুমের যন্ত্র মাত্র, অতি সূক্ষ্ম, অতি সুন্দর, অতি লোভনীয় যন্ত্র। তার মধ্যে দিয়ে জুলুম করত সমাজ, সে ছিল অচেতন রাজ্যের রানী, তাই তার চোখে মুখে ছিল একটা নির্জীবতার আভাস—যন্ত্রেরই জীবন নেই জীবন না থাকলেই চোখ হয় নিষ্প্রভ, কবিরা যাকে ঢুলু ঢুলু, মদির-নয়ন বলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম মন্দ লাগত না, ভালই লাগত। কে বলে সমাজ-ধর্মের সৌন্দর্য-জ্ঞান নেই! খুব আছে, অন্তরের নিছক, নিষ্কাম ব্যবহারিক বুদ্ধিকে গোপন রাখার জন্য সমাজ-ধর্ম সুন্দরকে ব্যবহার করে, মোহন ক'রে তোলে, আকাশ থেকে ভগবানের আশীর্বাদ কেড়ে আনে, প্রেতলোক থেকে পিতৃপুরুষের আত্মা টেনে আনে, আর বাজে রোশন-চৌকি, শঙ্খ, উলুধ্বনি। কী ভীষণ এই জুয়াচুরী! যেই সপ্তপদী শেষ হল, অমনি সমাজ ধর্ম জীবনের সব মূল্য, সব তাৎপর্যকে চির-কালের জন্য স্থিরীকৃত করে দিলে, সেই মূল্যই হল শেষ! মানুষের সঙ্গে সোজা-সুজি, প্রত্যক্ষভাবে, সমাজ-ব্যতিরেকে, সমাজের অতিরিক্ত অন্য কিছুর সঙ্গে যোগ নেই কি? যে যোগসাধনের ফলে জীবনের প্রতি কর্মের অর্থ সূচিত হতে পারে? কে জানে?

খগেনবাবু যখন হ্যারিসন রোডে এসে পড়লেন তখন একদল বৈষ্ণব কীর্তন গাইতে গাইতে চলেছেন। গান নয় ঠিক, নামকীর্তন, নামের আবৃত্তি সমস্বরে নয়, যত লোক তত স্বরে, ধীরে মধুরে নয়, তারস্বরে। খোল, করতাল, শিঙার কলরোলের ভিতর থেকে একটা মোটা রকমের আওয়াজ আসছিল। সামুদ্রিক বহুপাদ জন্তুর মতনই ভিড়ের আকৃতি, এলোমেলো, রূপহীন। যেখানে দেহের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেখানে রংবেরং-এর একটা ঝালর দেওয়া ছাতা, তার তলায় একজন নগ্নকায় কৃষ্ণবর্ণের পুরুষপিণ্ড, মুখে খোঁচা খোঁচা ও মাথায় লম্বা চুল, বাকি অঙ্গ চুলে ভর্তি, পরণে সবুজ চেলী, হাতে সোনার ছোট সিংহাসন।

পাশের লোকে চামর দোলাচ্ছে, জনকয়েক আধাবয়সী লোক তাকে ঘিরে হাত তুলে লাফাচ্ছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, আর যারা করতাল বাজাচ্ছে তারা নাচছে না, হাঁ করে নাম নিচ্ছে—কোন আওয়াজটা কার, টের পাওয়া যায় না। একটা লোকেরও দাড়ি কামান নয়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে সকলের, প্রত্যেকেরই অশৌচ? এক যারা শ্রীখোল বাজাচ্ছে তাদেরই গতি চোখে পড়ে, সেটা কিন্তু উর্দ্ধ দিকে, মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিপক্ষে। ভিড়ের কোন গতি লক্ষ্য করা যায় না, কেন্দ্রস্থ ব্যক্তিগুচ্ছ একই স্থলে স্থিত রয়েছেন। ওপরদিকে চাইতেই ভিড়ের স্থিতিশীলতার কারণ খগেনবাবু বুঝতে পারলেন। সব ভিড়েরই সৌন্দর্যানুভূতি আছে, সে ভিড় যদি আবার ধর্ম-ভিড় হয় তা হলে কথাই নেই—এই খানেই সুন্দরের সঙ্গে সত্যের ও ধর্মের সম্বন্ধ! খগেনবাবু অন্যমনস্কভাবে কখন ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ দেখলেন একজন লোক তার গায়ে ঠেস দিয়েছে। প্রায় পড়পড, চোখ আধ-বোজা, প্রায় জ্ঞানশূন্য, গায়ে ভীষণ দুর্গন্ধ। একটা গোঁঙানি কানে এল, 'হরে রাম হরে হরে।' খগেনবাবু সরে যেতে পারলেন না, পাছে লোকটা পডে যায়! কৃষ্ণের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না, নামেব গুণে ত্রাণ পাবে! শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের ফলে মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়া সম্ভব, তাবই জন্য হিন্দু সভ্যতা এতদিন মুখে মুখে টিকে আছে, বেদমন্ত্র অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে মহাপাতকী হতে হয়। এ নামকীর্তনের সার্থকতা কি? একই কথা, একশবার একইভাবে, একই সুরে, একই মাত্রার বিরামের পর পর উচ্চারিত হলে ঘুম আসে—তাও আবার একশ জন মিলে। ভেড়ার দল চলেছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে ভাবলে কবিরও ঘুম আসে। হয়ত অর্থহীন আবৃত্তিব ফলে দৈনন্দিন কর্ম থেকে নিবৃত্ত হলে মন পরিষ্কৃত হয়, তার আদিম পরিচ্ছন্নতায় ফিরে আসে, তখনই প্রেম হৃদয়ে আশ্রয় করতে পাবে! কিন্তু আদিম মন কি শুভ্র? তাব ওপরও পূবপুরুষদের আঁচডকাঁটা নেই কি? দেহেব প্রয়োজন অভ্যাসে পরিণত হলে মনও অভ্যাসেব দাস হয়ে পড়ে, তখন মন তার স্বধর্ম হারায়। দেহ থেকে মন বিচ্ছিন্ন নয়। বৈষ্ণবেরা হয়ত মনকে শ্রদ্ধা করেন না, প্রেমকেই বড করেন। বড করুন আপত্তি নেই, কিন্তু বুদ্ধিকে নাকচ করলেই মৃত্যু আসবে, ঘুম আসবে; শুধু তাই বা কেন? চীনেরা সব চেয়ে বড পাষণ্ডকে হাত পা বেঁধে দাঁড করিয়ে রাখত, তারপর তার ব্রহ্মতালুতে একমাত্রায় একলয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল ফেলত, ব্যস্, দু'মিনিটেই লোকটা পাগল হয়ে যেত। খগেনবাবুর কষ্ট হতে লাগল। তাইত, এই ধরণের নামকীর্তন শুনতে শুনতে তিনিও

পাগল হ'য়ে যাবেন। তাকে পালাতেই হবে এই জনতার নাগপাশ থেকে, এই নামকীর্তনের একটানা বারিপাত থেকে, এই গড্ডলিকা প্রবাহের একটানা স্রোত থেকে, নচেৎ ঘুম আসবে, না হয় পাগল হয়ে যাবেন। লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়েছে, লোকজন তাকে ঘিরে নৃত্য করছে, এই ফাঁকে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। 'হরে কেষ্ট হরে রাম হরে রাম হরে হরে!' লোকটি মূর্ছা গিয়েছে, তার চৈতন্য খুইয়েছে, কিন্তু মূর্ছিতের এক অর্থ হল প্রতিফলিত, কি প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখে? খগেনবাবু নিরীক্ষণ ক'রে বিহ্বলতা ভিন্ন কিছুই পেলেন না। সাবিত্রীর মুখে ত এই ছিল! না, ভাবা যায় না, কেবল অনুভব হয়। যেন তারই চারধারে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন হচ্ছে। খগেনবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, হাঁটু কাঁপছে, অথচ হাত মুষ্টিবদ্ধ। দোয়ারকা দেখে, না নামকীর্তনের মোহাচ্ছন্নতায়? মনে হল একটা নেশায় তাঁর দেহ অবশ এবং চিত্ত নিরুদ্ধ, তালের সম-আঘাতে জ্ঞান স্তম্ভিত হয়েছে, লোপ পেয়েছে। শিশুকালের কথা মনে হয়, পাঁচ ছয় বছর বয়সে একবার একটা ছন্দোময় বাক্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল, দু'বছর পরে কবিতায় পরিণত করবার পর তিনি রেহাই পান। এই কি কবিতার উৎপত্তি? সব কবিতার আদিতেই কি ঐ প্রকার কোন অর্থহীন আন্দোলন নেশাচ্ছন্ন ক'রে মনকে সংবিষ্ট করে? অসভ্য জাতির যাদুকর কি এই যুগের কবি হয়ে উঠেছেন? সর্বপ্রকার আহতধ্বনিই কি ঐ প্রকার একটানা সুরের পুনরাবৃত্তি? ভুটিয়া মন্দিরের দামামা বাজছে, সৈন্যের দল সারবন্দী হয়ে চলেছে, প্রত্যেক সৈনিক তার ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে, চেতনা খুইয়েছে, কিন্তু চলছে, সৃষ্টি করছে গতি। মানুষের সভ্য অংশটুকুর ক্ষয় হয় ভিড়ের এই অগ্রস্থিতিতে। থাকে কি? যন্ত্রা শটুকু, জীবাংশমাত্র। তাতে চলে না, ওটুকু মূলধন শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। সাবিত্রীর মুখে ছিল বিহ্বলতা, কেন না সে তার স্বল্প-মূলধনের ওপরই ব্যবসা চালাচ্ছিল, তার দলের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিল, অভ্যাসে তার বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাই টান পড়ল তার জীবনে। মাসীমা বলতেন, কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়। খগেনবাবুর কেমন একটা আতঙ্ক হল, তাঁর পা দুটো দুলছে যেন, নামকীর্তনের লয়ে না ত? তাঁকে বাঁচতেই হবে, মূলধন ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে, সুদে টাকা বাড়বে, সেই সুদে তাঁর জীবন চলবে—ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনবৃদ্ধি অনিশ্চিত, নিরাপদ স্থানে রাখাই ভাল, দরকার হলে চেক কাটলেই হবে, কাকে ধার দেবেন, কে দিতে পারবে না ঠিক সময়! না, সে ভারি গোলমেলে ব্যাপার—তাঁকে পালাতেই হবে লোক-

জনের সঙ্গ থেকে। পালাবার চেষ্টায় সচেতন হয়ে তিনি বুঝলেন যে গন্তব্যস্থান থেকে খানিকটা দূরে চলে গেছেন। প্রাণপণে ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন। পায়ের তলায় অত ব্যথা কেন, গলায় ব্যথা হয়েছে কেন, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে কেন? তিনিও নেচেছিলেন, নামকীর্তন করেছিলেন না কি?

সেই গলি, সেই গলির মোড, রাজ্যের নোংরা টিনেব খোল উপচে পড়েছে। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সাবিত্রী নাকে রুমাল দিয়ে বড রাস্তাব মোডে একদমে চলে আসত, যেখানে রমলা দেবীর, আরো কত দেবীর মোটব থাকত। শাড়ির প্রান্ত উঁচু করে ডিঙিয়ে হাঁটত, লাল শাড়িতে ফ্ল্যামিঙ্গো, সাদায় সারস। কোথা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতী হাঁটা শিখেছিল কে জানে?

বাড়ির দবজা বন্ধ। গলির মোড়ের গ্যাসের আলো দরজার সামনে এসে পড়েছে। খগেনবাবু দবজা ঘেঁসে দাঁড়ালেন, কড়া নাডতে সাহস হল না—আস্তে আস্তে ঠেললেন। দরজা একটু খুলে গেল। একজন অপরিচিত লোক ফাঁক দিয়ে উঁকি মেবে বল্লে, 'বাবু বাড়ি নেই, বাইরে গেছেন।' খগেনবাবু দবজা ঠেলে লোকটিকে কিছু না বলে বরাবব ওপবে উঠে গেলেন। কোত্থেকে জুটল! মুকুন্দের ফ্রেণ্ড নিশ্চয়! সব বাড়ি অন্ধকার, রান্নাঘবে কেবল আলো জ্বলছে, ধোঁয়ায় বিজলী বাতি প্রদীপের আলোর মতনই নিষ্প্রভ। খগেনবাবু আলো জ্বেলে ওপবের বসবাব ঘবে প্রবেশ করলেন, ঘরদোর পরিষ্কার রয়েছে, মুকুন্দ নিশ্চয়ই পরিষ্কার করেছে। বেচারি! ইচ্ছাসত্ত্বেও বসবার ঘর কখনও গোছাতে পারেনি, বাধা পেয়েছে, আজ মনের সাধে ঘর গুছিয়েছে; এই যে, প্রমাণও রয়েছে যথেষ্ট, বইগুলো উলটো করে সাজান! লোকজন এলে মুকুন্দ না সেজে ঘবে ঢুকতে পেত না, তখন মুকুন্দকে ফবসা ও লম্বা কোট পবতে হত, কাঁধে তোয়ালে বাখতে হত, সকাল বেলাতেই দাঁড়ি গোঁফ কামাবাব নোটিশ ও পয়সা পেত। আর বেচারি কাঁপতে কাঁপতে ট্রে নিয়ে আসত। সাবিত্রী ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে ট্রে তুলে নিত। মুকুন্দের জন্য বন্ধুদেব কাছে সাবিত্রী লজ্জিত হত, অথচ তাকে যে বকত তাও নয়। মুকুন্দের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহেব সময়ে কি একটা গহনাও দেয়। মুকুন্দ তাইতেই কত খুশী! চোখে জল এনে বলেছিল, 'বৌমা, এ গহনা তাকেই মানাত'—অর্থাৎ প্রথমাকে। এই কথা শুনে সাবিত্রীর মন ভারি নরম হয়ে যায়, রাত্রে খগেনবাবুকে বলে 'ছোটলোকদের মধ্যেও দ্বিতীয়বার বিবাহে লজ্জা আছে।'

খগেনবাবু আস্তে আস্তে মুকুন্দ বলে ডাকলেন। নীচে থেকে অপরিচিত লোকটি উঠে এসে বল্লে, 'মুকুন্দ বাজারে গিয়েছে, এখনি আসবে।' অল্পক্ষণ পরেই মুকুন্দের

গলা শুনতে পেলেন। পর্দা সরিয়ে মুকুন্দ এসে হাজির। 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে ?'

'আপনাকে খুঁজতে ওঁদের বাড়িতে, মেম সাহেব বল্লেন, আপনি বাড়ি ফিরেছেন, তাই ছুটে এলাম।'

'আবার খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল কেন ? ঠাকুর কোথায় ?'

'ঠাকুব চলে গিয়েছে।'

'বেশ হয়েছে, এখন খাব কি ? কেন গেল ? তোমার কীর্তি বোধ হয়।'

'না বাবু, না বলে পালিয়েছে, কেন গেল বুঝলাম না. বড ভয় লাগছে বলছিল।'

'কিসের ভয় রে ?'

'ঠিক্ পুলিশ নয় বাবু, উড়ে বামুনদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা যাতা বিশ্বাস করে আর ভয় পায়।'

'এখন অন্ন জুটবে কি ক'রে ?'

'ভালই হয়েছে বাবু, রাঁধতে জানত না, এ লোকটিকে আমি নিজে এনেছি, তৈরী লোক, গোবরডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি রেঁধেছে, বিলিতী খানা পাকাতে জানে।'

'ও এ বাড়িতে কি কববে ! সব গুণ মাঠে মারা যাবে যে। আমি ত শিকারী নই, ওকে মুক্তাগাছায় পাঠিয়ে দে। এ বাড়িতে আর কে বিলিতী খানা খেতে আসবে—কেউ আসবে না। আমার জন্য শুকতো, মাছের ঝোল রাঁধতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা কর। আর দই পাততে জানে ? কাজটি বড় সোজা নয়—যে সে পারে না।'

'ও সব জানে বাবু, তবে একটু দেখিয়ে দিতে হবে আমাকে, তা আমি খুব পারব। রান্না চড়াতে বলি ? বাবু, কয়লা নেই, আর কিছু পয়সা দিন তরকারির জন্য, মশলাপাতি চাল ডাল সব আছে।'

'একটু পরে এসে নিয়ে যেও।' মুকুন্দ নিচে গেল।

তাইত চাবির গোছাটা কোথায় ? রমলা দেবী জানেন, আনলেই তাঁকে হত। না এনে ভালই হয়েছে, কেমন খারাপ দেখায়, নিজেই খুঁজে বার করা যাবে। সর্বদাই আঁচলে চাবির গোছা থাকত ; বেড়াতে যাবার সময় সাপের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগে—সেটাই বা কোথায়, ঘরেই আছে নিশ্চয়। খগেনবাবু সাবিত্রীর ঘরে সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন। ছোট্ট পৃথক ঘর, অন্ধকার, গন্ধ এল নাকে এক ঝলক, এই ত তার নিজের ঘর। তার ব্যক্তিত্বে ভরপুর ! তা হলে ছিল, ছিল, ছিল···দেয়ালে হাত দিয়ে খগেনবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। টেবিল

ল্যাম্পটির রঙীন শেডটা আবছা দেখা যাচ্ছিল, তার সুইচটা টিপলেন, ছোট্ট পাথরের টেবিল, ছোট ড্রেসিং টেবিলে ভাল আয়না, বিবাহের যৌতুক, কোণে একটি সেলফে বাঁধান বই সাজান, পাশে একটি গদীর সোফা। অন্য একটি জাপানী র‍্যাকের ওপর চন্দন কাঠের বাক্স, তার ভেতর কাগজ পত্র ড্রেসিং টেবিলের চাবি সব থাকত; চন্দন কাঠের বাক্সের চাবি থাকত বই এর পিছনে। বইগুলি বেনারসী শাড়ির টুকরো দিয়ে বাঁধান, শান্তিনিকেতন থেকে রমলা দেবী বাঁধিয়ে এনে দেন। বেনারসী জরীর পাড়ে বইগুলো চমৎকার দেখাত। বই-এর উপর তার মমতা ছিল অদ্ভুত, অন্য ধরণের, খগেনবাবুকেও হাত দিতে দিত না, এক রমলা দেবীই ধার পেতেন। নতুন বই বেরুলেই খগেনবাবু কিনে আনতেন, চাইলে পেতেন না, আসতে না আসতেই লোপাট হত। কত আধুনিক লেখকের বই ছিল, সে গুলো কোথায় গেল? কত নভেল, কত কবিতা! সাজান রয়েছে প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলী; আর নিচের তাকে ভারতবর্ষ, বসুমতী—সবুজপত্রও রয়েছে, সবচেয়ে নিচু কাকটায়। কিছুতেই সে সবুজপত্র পড়ত না,—বলত, ঘরে-বাইরে বই ত রয়েছে। বুঝতে পারত না বোধ হয়। কোণে রেকর্ডের বাক্স—সব বাংলা গান, মানদা, আঙ্গুরবালা, পান্না। পান্নার কীর্তন শুনে সাবিত্রীর চোখে জল আসত তিনি নিজে দেখেছেন। তার ভাল লাগত কীর্তন, তার নিজের ভাল লাগত ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরী! সাবিত্রী বলত, 'ও সব বুঝিনা, আমার অত বিদ্যে নেই!' সাবিত্রী একবার জোহরা-বাই-এর রেকর্ড শুনে হেসেছিল, খগেনবাবু অত্যন্ত চটে যান, 'যে জোহরা-বাই-এর গান ভালবাসে না সে যেন গান শুনতে ভালবাসে না বলে, জোহরা বাই-এর কোন রেকর্ড চলে না বাজারে, তার থেকে প্রমাণ দেশ থেকে সুরের মর্যাদা উঠে গিয়েছে, আমি চোরা বাজার থেকে খুঁজে এনেছি।' 'এনেছ বলেই শুনতে হবে।' 'তুমি অত কষ্ট ক'রে বাঁধলে আমাকে ভাল বলতেই হয়। আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও ওস্তাদে শেখাবার জন্য কত কষ্ট করেছে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রাণপাত করেছে একটু ধৈর্য ধরে শোনই না, যদি নাই বোঝ?' 'বেশরে। কষ্ট করলেই বুঝি ভাল হয়?' 'কষ্ট ক'রে সাধলে শক্ত জিনিষ সোজা হয় আর সহজ হয় বলেই আনন্দ দেওয়া সম্ভব হয়। যাকগে, ওসব বুঝবে না, অন্যে তোমার জন্য কষ্ট করছে দেখলে একটু ভদ্র হতে হয়। নিজে যদি এইটুকুও জানতে তা হলে দয়ালু হতে।' 'আমি বুঝিনা, বুঝিনা মানছি, হাসি পায় কি করব?' 'তা হলে ফ্যাসন ক'রে কালচার দেখাতে গান শুনতে যেও না, এ ওস্তাদ, অমুক খাঁ সাহেবের নাম

নিও না, বাড়িতে বসে রেকর্ডে কীর্তন শুনো, আর কেঁদো।' সাবিত্রী উঠে যেত চুপ ক'রে, মুখে চাবি দিয়ে। তার মনের বাক্স বন্ধই রয়ে গেল, জগতে যা কিছু ভাল তার আস্বাদ পেল না। ভালর ওপর মোহ ছিল তার, আকর্ষণ ছিল না। আজ যদি ওস্তাদি গান শোনা, ছবি দেখা কোন কারণে বডমানষী কিংবা আধুনিকতার লক্ষণ পরিগণিত না হয়, তা হলে সাবিত্রীরা কি গান শুনতে, ছবি দেখতে যাবে, না পান চিবুতে চিবুতে, দোক্তা জরদা মুখে দিয়ে, দাস দাসী, ননদ জা বৌদিদের সঙ্গে রসিকতা ক'রে কালাতিপাত করবে? চোখের জল সাবিত্রীর পড়ত কীর্তন শুনে, চোখের জল ফেলাই কি উপভোগের প্রকৃষ্ট পরিচয়? উপভোগ কি চোখের পিছনের গণ্ড থেকে গডিয়ে পড়ে? উপভোগ মাথায়, বুদ্ধিতে, মনে; সেই মাথা, মন, বুদ্ধি সব বন্ধ, বেচারি কি করবে! খোলবার চাবি চাই।

বই-এর পিছনে চাবিটা পেয়ে খগেনবাবু আলমারি খুল্লেন। অনেকগুলি ব্যাগ, সাদা রেঁায়াঅলা, জন্তুজানোয়ারের, নানা রং-বেরংয়ের কাপড়ের, রূপোর চেনের ব্যাগ, ঐ এক সখ ছিল তার! এক একটি বার ক'রে আঙুল দিয়ে টিপতে লাগলেন, একটার মধ্যে টাকা রয়েছে। অনেক কষ্টে খুলে তার ভেতর থেকে টাকা ও খানকয়েক নোট বার করলেন। ব্যাগটা বন্ধ করা গেল না, আলমারিতে রেখে চাবি দিয়ে বসবার ঘরে এলেন। তার ঘরটা বাইরে থেকে তালা লাগালে বেশ হয়, নতুন লোক। ভেতর দিকের ছিটকিনি সে করিয়ে নিয়েছিল, খগেন বাবুর পরামর্শে। প্রত্যেক মেয়েদেরই পৃথক একটি ঘর ও নিজের ঠাঁই থাকা উচিত। এখন কিন্তু চুরি হবার সম্ভাবনা, মুকুন্দ নেবে না, মাসীমার চাকর, কিন্তু মন না মতিভ্রম! পুরাতন ভৃত্যেরাও কি অবিশ্বাসী হতে পারে না, প্রলোভনের সুবিধা না দেওয়াই ভাল।

'মুকুন্দ, মুকুন্দ,'—মুকুন্দ এল, 'একটা ছুতোর ডাকতে পারিস?' 'আচ্ছা, কাল সকালেই ডেকো, এই নাও টাকা, এ কদিন খেলে কি?'

'আমরা খেয়েছি, সবই ছিল, আপনার জন্য ফুলকো লুচি করি? আধ ঘণ্টার ভেতর হয়ে যাবে, পাখাটা খুলি? আপনি বসুন, জায়গা ক'রে দিচ্ছি' 'বিলিতী ডাক এসেছে।' কত দিন কথা না কইতে পারলে চাকর মনিবের সঙ্গে অত ও ঐ রকম কথা কয়?

'নাইবার যোগাড় কর দেখি, সব ফরসা চাদর ওয়াড় বার কর।'

'নিজেই বার করুন না।

'করছি, জল তৈরী ক'রে দে আগে।'

মুকুন্দের সঙ্গে একটু বেশী কথা কওয়া হয়ে গেল বোধ হয়। হোকগে, ভালই, চুপ ক'রে থাকলে মুকুন্দ ভাববে বাবু দুঃখ কাতর হয়ে পড়েছেন। অমনি সুযোগ পেয়ে নিজে থেকে বেশী কথা কয়ে সহানুভূতি জানাবে। সে সহ্য হবে না, সহানুভূতি বড় একাকার করে দেয়, তাতে চাকরের সঙ্গে মনিবের সম্বন্ধ ঘুচে যায়, সব সামাজিক সম্বন্ধই লোপ পায়। সহানুভূতি-প্রকাশের সুযোগ দিলে মুকুন্দ আসকারা পাবে, এরি মধ্যে ঠাকুরটাকে তাড়িয়ে নিজের লোক ঢুকিয়েছে। ক্রমে হবেন বাড়ির কর্তা। গম্ভীরভাবে কথা কইতে হবে নিজে থেকেই। ফরসা জামা কাপড় চাদর গ্লাড আলমারি থেকে বার ক'রে রেখে খগেনবাবু স্নানের ঘরে গেলেন। আঃ পরের বাড়ি কখনও স্নান হয়, গান গাওয়া যায়? গান গাওয়া অশোভন হবে, গাইবার ইচ্ছা দমন করলেন জোরে কেসে, স্নান সমাপ্তির পর ধোপ-দোরস্ত গেঞ্জী ফতুয়া ধুতি পরে, চুল আঁচড়ে বেরিয়ে এলেন।

'ওরে মুকুন্দ, গেঞ্জীটা ছেড়ে এসেছি, সাবান-কাচা ক'রে ইস্ত্রী করবি, নিজেকে করতে হবে না, দোকান থেকে করিয়ে আনিস, বিকেলে চাই, তুলে রাখিস, হারিও না, যাও খাবার নিয়ে এস।'

নিজের গায়ে গেঞ্জী কেমন গায়ে ফিট করে। কতদিন গায়ে দেবার পর নিজের মনে হয় কে জানে? পরে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, ফেলে দিতে মন চায় না, সবই অভ্যাস, এই বাড়ী ঘর, বসবার চেয়ার, চটিজুতো, বিছানা, স্ত্রীর সঙ্গ। সাবিত্রী অভ্যাস ভেঙ্গে দিয়ে গেল—যদি ভুগে যেত অত কষ্ট হত না। কষ্ট আবার কিসের? অকস্মাৎ বলে? বিবাহও হয়েছিল অকস্মাৎ, আগে পরিচয় ছিল না। তবে রোগশয্যায় রোজ একটু একটু করে অভ্যাসের কঠিন আবরণ সরে যেত—তার পর সয়ে যেত। নাঃ তার চেয়ে একদিনেই, চিত্তরঞ্জন দাসের তামাক ছাড়ার মতন অভ্যাস কাটানই ভাল। অনেক দিন রোগে ভুগলে মাসীমাকে আনাতে হত, হাসপাতালে দেওয়া যেত না। মাসীমা আসতেন কি? বোধ হয় আসতেন না, আত্মসম্মান আছে ত! অনেকদিন রোগে ভুগলে অল্পবয়সী মেয়েরা বড় ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে, বিশেষত যদি ছেলে মেয়ে না থাকে—ওষুধ খেতে চায় না। 'আমার কিছু হয়নি, আমার কিছু হবে না গো, ভয় নেই, অত সুখ তোমার কপালে নেই যে রাঙ্গা টুকটুকে বউ ঘরে আসবে'—এ রকম কথাবার্তা শুনলে পুরুষ একটু দুর্বল হয়ে পড়ে, কপালে হাত বোলাতে, চুলে বিলি কাটতে ইচ্ছে হয়…ইত্যাদি কত কি! তারপর দেবী মন্তব্য করেন, 'তুমি কি কৃতজ্ঞ! আচ্ছা, যত শীঘ্র যাই ততই ভাল, তোমার কত কষ্ট হচ্ছে! বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে

পারছ না, তাঁদের পত্নীরা কত ভাবছেন! ভেবে ভেবে সোনার রং কালি হয়ে গেল, ও রকম কালো হয়ে গেলে কেউ পছন্দ করবে না—এই বেলাই যাই'··· উঃ· বাধ্য হয়ে স্বামীকে কাষ্ঠ-রসিকতা করতে হয়, চীনদেশের বিপ্লব, মহাত্মাজীর অনশনব্রত, ঈজিপ্টের রানীদের পুরাতন গহনার কারুকার্য, বন্ধুপত্নীর উড্ডয়ন··· প্রভৃতি উত্তেজক সংবাদ দিতে হয়· তারপর সন্ধ্যার ঝোঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে সখীদের আগমন, সেজেগুজে, মোটর চড়ে, ঘরে ঢুকেই সেবার পালা, যার প্রধান অঙ্গ সেবার ত্রুটি দেখান, অ প্রধান অবয়ব প্রসাধন!···দেওয়ানীর চেয়ে ফৌজদারী ভাল। নিয়তিতে টানছে, রুখবে কে? সারাজীবন ধরে মিথ্যা আচরণ, ছলনা···তার থেকে বেচেছেন ত। এই যথেষ্ট। সাবিত্রী কৃপাময়ী, বুদ্ধিমতী, সতী সাবিত্রী। স্বামীকে খুব ভাল না বাসলে স্ত্রী আত্মহত্যা করে না।

খাবার হয় নি বোধ হয়। খগেনবাবু আরামকেদারায় শুয়ে পড়লেন। হাতের কাছে বিলিতী কাগজ ছিল, মোড়ক খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। বিলিতী কাগজ পড়া তাঁর ছিল একটি প্রধান সখ—নানা রকমের, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক। বাংলা দেশে কাগজ নেই, যা আছে তাতে সমালোচনা হয় না, তাতে না থাকে খবর, না থাকে খাদ্য। ক্রাইটেরিয়ান এসেছে, দমে ভারি, কিন্তু যেন এ যুগেরই কাগজ নয়। বলে কিনা অথরিটি মান! ওরা মানুকগে—পোপের আধিপত্য, রাজার প্রভুত্ব, সাহিত্য-সম্রাটের অনুশাসন অনেকদিন চলে গিয়েছে, অনেকদিন ধরে ওদের দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চলেছে, নিজের ব্যবসায় নিজে লাভ করবার দুর্দম আকাঙ্খায় ওদের সর্বনাশ হয়েছে, ওদের দেশে এসেছে নৈতিক অরাজকতা, তাই ওদের প্রামাণিক মানবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এদেশের সমাজে সবই প্রামাণ্য, সবই আপ্তবাক্য, সবই শ্রৌত, সবই প্রথাগত, এখানে বরঞ্চ একটু পার্থক্যের ও আত্ম-নির্ভরশীলতার চেষ্টা দেখলে মন্দ হয় না। সর্বসময়ে চার্চের জন্য ওকালতি শুনে শুনে এলিয়টের ওপর কেমন আক্রোশ হয়—অত সূক্ষ্মবুদ্ধি, অত পাণ্ডিত্য, অমন লেখবার ক্ষমতা যেন নিয়োজিত হচ্ছে মাত্র একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবার জন্য। সাহিত্যে ধর্মের গোঁড়ামি! খগেনবাবু ক্রাইটেরিয়ান তুলে রাখলেন। হাতের কাছে ফিকে হলদে রং এর অ্যাডেলফি—না এ কাগজটা আর নেওয়া চলে না। মিডলটন মারি লোকটি মজার—নিতান্ত ভাবপ্রবণ। এককালে লিখতেন ভাল—সাহিত্য সম্বন্ধে, অন্তর্দৃষ্টি আছে সাহিত্যে। যেই স্ত্রী ক্যাথারিণ মারা গেল—অমনি খসে, খসে গেল লোকটা। পাঠকবৃন্দকে পাদ্রীর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বাণী পাঠালেন, আশ্রয় চাই, হয় ভগবান, না হয় যীশু.

এখন আর ও চাহিদা নেই, এখন কম্যুনিজম, তবে রাশিয়ান ছাঁচে নয়, ইংরেজী ছাঁচে। এক কথায়, ত্থাখ গো তোমরা, আমি ভেঙ্গে পড়েছি, খোঁটা চাই, উঠতে পারছি না, যা হয় একটা দাও হাতের কাছে, নচেৎ তোমাদের গুরুর তিরোভাব হবে। মার্বিণ চাই ভগবান, যীশু, কম্যুনিজম, কিন্তু লোকদের চাই মিডলটন মারি! কিন্তু তাঁর সত্যকারের প্রয়োজন ছিল আর্টের, সেক্‌সপীয়র, কীট্‌স্‌, দস্তয়েভস্কীর সাহিত্যের, হয়ত ব্লেকেরও। একেই বলে পরধর্ম ভয়াবহ। যুদ্ধের পর মেয়েদের ঘাঘরা সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, তখন ডাক্তারে বলেছিল, দেহ দেখান একপ্রকার রোগ, মার্বি সাহেবের রোগ মানসিক দুর্বলতা দেখান। আত্ম-অনুকম্পা পাপ নয় কি? না, আর সহ্য হয় না। মারিও আশ্রয়প্রার্থী। যদি ভদ্রলোক অত চেঁচিয়ে না লিখতেন, নিজের বাৎসরিক ও মাসিক অভিব্যক্তি ও আবিষ্কার অত ঢাক ঢোল শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে না প্রচার করতেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাহিত্য নিয়েই পড়ে থাকতেন, তাহলে সাহিত্যের কল্যাণ হত—তাঁর বাণীর চীৎকারটাই শুনতে হত না। ব্যাকুলভাবে বাণীপ্রচার করার অর্থই তাই—আমার নিজের প্রতি তেমন বিশ্বাস নেই, তোমরা বিশ্বাস ধার দাও—আমার বন্ধু হও, আমার দলে এস। এ প্রকার ব্যাকুলতা মানুষের অন্তর্হিত সামাজিকতারই পরিচয়, তার বেশী কিছু নয়। 'আমি না মিশে থাকতে পারি না, তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাসের সমর্থনেই আমি বাঁচতে পারি, আমার সঙ্গে মেশ, অবশ্য বন্ধু হিসেবে নয়, শিষ্য হিসাবে।' আর মিশে কাজ নেই! সাবিত্রীও মিশেছিল রমলা দেবীর সঙ্গে। আগে মনে হত শিষ্যা হিসেবে। রমলা দেবীর কথা শুনে মনে হল ঠিক তা নয়। সাবিত্রী রমলা দেবীর বন্ধুও ছিল না। নিজে অতক্ষণ রমলা দেবীর সঙ্গে সময় কাটালেন কি করে? একটু বেশী কথা কয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। তিনিও আশ্রয় চান না-কি? ছিঃ, ভারি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। খগেনবাবু অ্যাডেলফিটা মাটিতে ফেলে দিলেন। এখনও খাবার হল না. পাকা বামন ধরে এনেছে মুকুন্দ!

'কৈরে মুকুন্দ।' 'এই যাই বাবু।'

নেশন অ্যাথি-নিঅম আগে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা হত, নাম বদল করে যেন মাথা গুলিয়ে গেছে. বিবাহের অব্যবহিত পরে যেমন মেয়েদের হয়, না-বাপের বাড়ীর, না-শ্বশুর বাড়ীর—পুরো স্যোশিয়ালিষ্টও নয় আবার পুরো লিবারেলও নয়। কিন্তু ইংরেজ জাতের তারিফ না ক'রে যেন থাকা যায় না—রমলা দেবীর সঙ্গে যত তর্কই হোক না কেন, অন্যায়ের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায় ঐ জাতিই সর্বপ্রথমে

—এশিয়ার প্রতি নিজেদের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হতে অবশ্য দেরী লাগে। নাতসীরা কি অদ্ভুত প্রকৃতির? সব এককরম শার্ট পরতে হবে, সকলকে এক কদমে হাঁটতে হবে, আবাব দেহেব প্রত্যেক স্নায়ুতে আর্যরক্ত প্রবাহিত হওয়া চাই, মেয়ে ছেলে আইবুড়ো থাকতে পারবে না! জার্মানরা বরাবরই অনুশাসনপ্রিয়। জার্মানদের আশ্রয় চাই, তারাও কি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে, তাদেরও কি অভ্যাস ভেঙ্গেছে? অভ্যাস আর ছিল কোথায়? অভ্যাস ছিল আশ্রিত থাকা, মধ্যে পার্লামেন্টের প্রবর্তন হল, হ্বিমারের রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হল—সবই পরীক্ষা হিসাবে। কিন্তু ও সব জার্মানের ধাতে বসল না, কেবল জার্মান কেন, রাশিয়া, ইটালী, পার্শিয়া, টারকী সবই একধরণের, কারুরই পার্লামেণ্ট, সাধারণ-তন্ত্র ধাতে বসে না। ব্যাপার হল এই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যুরোপীয় সভ্যতার ত্রিধাবার একটিমাত্র ধারা, কুলজ, বংশজ, গোত্রীয়, ট্রাইবাল ধারা জার্মান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বেশী প্রকাশিত। যে যাই বলুক না কেন পশ্চিমী যুরোপকেই বেশী আপন মনে হয়, বোধ হয় ইংরেজের সম্পর্কে এসে; জার্মান ইটালীর মধ্যে কোথাও যেন একটু অসভ্যতার ছোঁয়াচ আছে। জাতের মত মানুষেরও দু'রকম শ্রেণী আছে, ব্যক্তিস্বাভিমুখী ও কুলাভিমুখী। জাতীয়তাবোধের যুগে শেষেরই জয়। রমলা দেবী বেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, তাই বোধ হয় স্বদেশী জিনিষ না ব্যবহার করলেও তাঁর চলে। যারা একলা থাকার ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত তাদেরই চাই একাধিপতি, একছত্র সম্রাট, সম্রাট না হলে মহামানব। তাদেরই শাসনপদ্ধতি অত্যুগ্রভাবে নিজের যৌথ-অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এই একাকী থাকার ভয় ও অক্ষমতার ওপর সমগ্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। রাজারা ক্ষমতাশালী, পুরোহিতরা চালাক, আমলাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত বলে প্রতিষ্ঠার ভক্ত, আর ধনীরা—তাঁরা লোভী ও চালাক দুইই, তাই তাঁরা একলা থাকার ভয় নামক সামাজিক প্রবৃত্তিকে নিজেদের অ-সামাজিক কাজে লাগান। অথচ এ জীবনের অর্থ, এ জীবনটা কি ঠিক বোঝা না গেলেও—তার প্রধান কথা একাকিত্ব, ঊষর সমতল ভূমির বুকের ওপর তাল গাছের মত সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এই সব কাগজেই স্থির সঙ্কেত রয়েছে যে জগতে একলা থাকা আর যাচ্ছে না, খোলাখুলি বলা হচ্ছে যেন একলা থাকতে গেলেই ভেঙ্গে, নুয়ে, ধূলিসাৎ হবে। দেখাই যাক, এঁরা ঠিক কথা কইছেন, না প্লোটাইনাস খাঁটি খবর দিয়ে গেছেন।

মুকুন্দ ঘরে এসে বল্লে, 'বাবু খাবার দিই?'

'এতক্ষণে হল? খাবার নিশ্চয়ই দিবি, ভাবিস কি? বায়ুভুক?' একটু হতভম্ব

হয়ে মুকুন্দ আসন পেতে দিলে।

'না, ছোট টেবিল নিয়ে আয়,—যা…'

মুকুন্দ ছোট টেবিল নিয়ে এল।

'দাঁড়া, টেবিল ক্লথ দিচ্ছি।' খগেনবাবু টেবিল-ক্লথ বার করতে না করতে নতুন বামুন খাবার নিয়ে এল। টেবিল-ক্লথ পাতা হল, খগেনবাবু লোকটিকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বল্লেন, 'আমি একটু লাল লুচি খাই।'

'কাল থেকে তাই হবে, আজ তাড়াতাড়ি হয়েছে।'

'কাল তাড়াতাড়ি কোরো না, কোন কাজ হঠাৎ করতে নেই, নুন দাওনি?'

লোকটি নুন আনতে গেল।

'মুকুন্দ, লোকটা বাঁধে কেমন?'

'আজ্ঞে, খুব ভাল, একবার ওর হাতের পোলাও কোর্মা খাবেন, ওর সঙ্গে তত্ত্ব নিয়ে যেতে আলাপ—আপনার বোনের বাড়ীতে কাজ করত।'

'কোন বোন রে?'

'সেই যে যিনি খুব গান গাইতেন, তাঁর বাড়িতে মা তত্ত্ব পাঠাতেন, তাই দেখা সাক্ষাৎ।'

'সে ত বিদেশে থাকত রে, বুদ্ধিমান, অন্য কোথায় তত্ত্ব দিয়ে এসেছিস নিশ্চয়ই—এ বোধ হয় যার গোবরডাঙ্গায় বিয়ে হয়েছিল—সে গান গাইতে পারত না।'

ঠাকুর নুন নিয়ে এল।

'রান্না মন্দ হয়নি, আচ্ছা, তুইও যা—আমার কিছু দরকার নেই—তোমরা খেয়ে নাও গে—মুকুন্দ বিছানা করে দে—এই নে চাবি—চাদর বার কর আলমারীর নিচের তাক থেকে—দেখিস যেন ঘাঁটিস না—ভারি রাগ হবে, বুঝলি—চাবিটা হারিও না যেন, আমাকে দিও।'

'বাবু এই যে নিজে ব ব করলেন।

'বার করেছি? চাবিটা নাও তুমি বড় হারিয়ে ফেল, মুকুন্দ, এতদিনেও তোমার কিছু জ্ঞানবুদ্ধি হলনা, এইবার খাও গে যাও।'

ঠাকুর চলে গেল, মুকুন্দ দাঁড়িয়ে রইল—'মুকুন্দ এত রাত্তিরে গোলাপ জল পাওয়া যাবে? যাবে বোধ হয়, ভাখ দির্কিনি, মোড়েই পাবি, এই নে মনিব্যাগ থেকে টাকা, এক টানে তাড়াতাড়ি আসবি।

মুকুন্দ চলে যাবার পর খগেনবাবু খাওয়া শেষ করলেন, খিদে নেই মোটেই, চোখ বড় খচ খচ করছে. লোকটা রাঁধে ভাল, বড় মানুষের বাড়ী কাজ করেছে, একটু

চাল আছে—বলে কিনা 'কাল থেকে তাই হবে'—মুকুন্দ বরাবরই মিশুক, তত্ত্ব নিয়ে যেতে আলাপ, সেই থেকে বন্ধুত্ব, হয়ত এবি মধ্যে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছে, দু'দিন পবে টাকা ধার দেবে, তাবপর খুড়ো পালাবে, তখন তাঁকেই ক্ষতিপূবণ করতে হবে, মাসীমা দু'বাব করেছিলেন, সাবিত্রীও একবার করেছিল, কিন্তু বেশ নাকের জল চোখের জল বার কবিয়ে। সেই থেকে মুকুন্দ আব মিতে পাতায়নি। এতদিন রয়েছে, কোন বোন কোথায় থাকে জানে না, গুলিয়ে ফেলবার একজন, অন্য কোথায় তত্ত্ব দিয়ে এসেছে তারই বা ঠিক কি? আবার বাবুর বলা হয়, এই বাড়ীব লোক' গান গায় মণিক. থাকে বন্ধদূবে, তাকে আবার সাবিত্রী তত্ত্ব পাঠাবে' ছাঁব পাঠাবে' তবে যখন কোলকাতায় এসেছিল তখন হয়ত তত্ত্ব কিংবা উপহাব নেওয়া দেওয়া চলত। মুকুন্দেব স্মৃতি-শক্তিকে বিশ্বাস কবতে নেই। তত্ত্ব টত্ত্ব বাজে কথা!

মুকুন্দ যখন গোলাপ জল নিয়ে ফিবে এল তখন নটা বেজে গিয়েছে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

'বাবু রাস্তায় ভিড।

'নাচ দেখছিলে বুঝি?'

মুকুন্দ চুপ করে রইল।

'শিশিটা খুলে আনি।'

মুকুন্দ চলে গেল নিচে।

খগেনবাবু চোখে হাত দিয়ে বসে রইলেন, সেহ কীর্তনের দলে মুকুন্দ একটু নেচে এল।

'কইবে হল?'

'এই যে··ঐ যাঃ।'

'ভাঙ্গতে পারলে—না যাব?

মুকুন্দ ভাঙ্গা শিশি নিয়ে হাজির।

'এখনও একটু আছে'।

'চোখে কাঁচের গুডো দিলে কি হয় জান মুকুন্দ? ফেলে দাও। আচ্ছা এইখানে বাখ। বিছানা করে খাওগে যাও—নিচেব দরজা ভাল ক'রে বন্ধ কবো, তোমার খুডো কি বাড়িতেই শোবে, না বাসায় যাবে?'

'না বাবু খুব ভাল লোক, বাসা নেই, আমাব কাছেই থাকবে।'

'থাক,কিন্তু তোমার বাক্স চুরী গেলে আমি দায়ী নই, গোডাতেই বলে দিচ্ছি।'

'সে কি বাবু! তা কখনও হয়!'

মুকুন্দ বিছানা পেতে চলে গেল। খগেনবাবু স্নানের ঘরে গিয়ে তোয়ালেটা ভেজালেন, তার ওপর ভাঙা শিশি থেকে খানিকটা গোলাপজল ঢেলে দিলেন, বাকীটা ঢাললেন বিছানায়।

বিছানায় শুতে যাচ্ছেন এমন সময় মুকুন্দ এল।

'বাবু ওবাড়ি থেকে চাকর এসেছে।'

'কি বলে?'

'ডেকে দেবো?'

'দে।'

রমলা দেবী চাকর পাঠিয়েছেন, হাতে একটা ছোট্ট চিঠি। 'আপনার খাবার তৈরী, অনুগ্রহ করে দেরী করবেন না। শরীর খারাপ হয়নি ত?' খগেনবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর লিখে দিলেন, 'আমার কী খাবার কথা ছিল? মাপ করবেন, যেতে পারছি না, শরীর ক্লান্ত, সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েছি। আপনি এত রাত অবধি খাননি? সত্যই দুঃখিত।' চাকর চিঠি নিয়ে চলে গেল। মুকুন্দ নিচে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

তাও ত বটে! রমলা রাত্রে কিছু খায় না—মোটা হবার ভয়ে। মোটা স্ত্রীলোক জঘন্য, কিন্তু প্যাকাটিতে পরিণত হবার আদর্শটাও লোভনীয় নয়। রোগা হওয়ার আদর্শটা বিদেশী। বিলেতের মেয়েরা রোগা হচ্ছে, তাই এঁরাও হাড় সার হচ্ছেন। যার যা ইচ্ছা করুকগে! তবে সাবিত্রীও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন? মাসীমা নতুন নতুন খাইয়ে দাইয়ে গোলগালটি করেছিলেন, তার পর যে কে সেই। বলে কিনা অম্বল হয়, আরো কত কি? যক্ষা হবার সাধ হয়েছিল। ডাক্তারে একবার কি বলেছিল তাইতে খগেনবাবু ভয় পেয়েছিলেন। একজন ডাক্তারবন্ধু পরীক্ষা করে একটা দামী ওষুধ লিখে দিয়ে যান। তার মধ্যে অনেকটা সুরা ছিল। খগেনবাবু দু'তিন দিন অসুস্থতার জন্য খেয়েছিলেন—তার পর চেয়ে পান নি। সাবিত্রী দেয় নি, শিশিটা ভেঙে ফেলে, কি ফেলে দেয়। বেশ চন চন করে উঠত, কান-দুটো, নাকের ডগাটা, শ্রান্তির অবসান হত।

আজ ওষুধটা থাকলে বেশ হত। খগেনবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দূর থেকে মনে হল নাম-কীর্তনের আওয়াজ কানে আসছে। কোলকাতার সহরে ঘুমোবার জো নাই। 'হরেকেষ্ট হরে রাম হরে রাম হরে হরে'—কোলকাতায় থাকা চলবে না। সহরে সর্বসাধারণের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কোথা থেকে এ

জনবৃদ্ধি হল কে জানে? রাস্তা চলতে গায়ের ওপর এসে পড়ে, ট্রামে বাসে ওঠা যায় না, কলেজ স্কোয়ারে বেড়ান যায় না, থিয়েটারে ও ছবি দেখতে যাওয়া যায় না। আগে তবু সিনেমাতে গিয়ে খানিকটা চুপ ক'রে থাকা যেত, এখন সেখানেও কথা, টকি। একমিনিট, এক ইঞ্চি জায়গায় নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। কে এই ভিড়কে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন! এরাই বাঙলা মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বার করে, টাকা থাকলে এরা মিনিটে মিনিটে কাগজ বার করত। গায়ে পড়া লোক সব। খগেনবাবু পাশ বালিশটা সরিয়ে দিলেন, মাথার তলায় দুটো হাত দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। ভারি আব্দার বেড়ে গেছে —আদুরে ছেলের মতন। সাবিত্রী বলত মাসীমার আদুরে বোনপো। মাসীমার কাছে গেলে হয়, কম কথা কন। কথা কেন কইবে না মানুষে? নিশ্চয়ই কইবে, তবে চেঁচিয়ে নয়। কথা কইবেনা কেন, তবে শেষের কবিতা, মালঞ্চ, বাঁশরীর চরিত্রের মতন। তা নয়, অর্থহীন প্রলাপ। কথা না কইলে মানুষে বাঁচে না— হয়ত বাঁচে, কে জানে? কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে নীরবতা চাই—আলাপে ভিড় করলে চলে না। তুমি কথা কহবে, আমি চুপ ক'রে শুনব, আমি হয়ত উত্তর দেবোনা, তোমার চোখ মুখ সমগ্র ভঙ্গিমা মুখরিত হবে, ঠোঁট নড়বেনা, শিরা নড়বে, জাপানী ছবির বাঁশপাতার মতন। রবিবাবু ঠিকই বলেন— অবকাশ চাই। কিন্তু খালি ছবির ফ্রেম টাঙিয়ে রাখলেই নিরাকার ব্রহ্মের রস উপভোগ করা যায় না—একজন গায়ককে দেখলেই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয় না। একটা কিছু অবলম্বন থাকা চাই যার চারপাশে নীরবতা চাপ বাঁধতে পারে, তবেই মধুর গুঞ্জন—যেটা নামকীর্তন নয়। একলা হওয়ার মধ্যেও কথোপকথন, সেখানেও ভাবের ঠেলাঠেলি। একলা হওয়ার বাইরে খানিকটা দূরে, বেশ খানিকটা দূরে, বহু জনসমাগম থাকে—থাকুকগে। দরবারে রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, দূরে প্রজা সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে। সিংহাসন একটি। পাশে সিংহাসন নেই, থাকলেও খালি। বরাবরই শূন্য ছিল। হিন্দুস্থানী পর্দানশীন। কালো পর্দা ধীরে ধীরে ওপর থেকে নামছে, পাদপ্রান্তের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঐক্যতান কমে এল, কীর্তন শোনা যাচ্ছে না, যবনিকার ত্রিকোণ অবকাশে নটীর মূর্তি, হাতে ফুলের তোড়া—গোলাপ জলের শিশি, লজ্জা ও জয়ের মিশ্রিত আনন্দে অবনতমুখ, টানা চোখ টানা ভুরু, কোথায় যেন দেখা হয়েছে—কোন কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে? যবনিকা পড়ছেনা কেন? কোথায় আটকে গিয়েছে, ভেতরের দড়িতে বোধ হয়। খগেনবাবু মাথার নীচ থেকে

হাত সরিয়ে পাশ বালিশটা টেনে নিলেন।

খানিক পরে মুকুন্দ পা টিপে এসে আলো নিবিয়ে দিয়ে গেল

৪

খগেনবাবুর পায়ে রোদ পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। মুকুন্দ ট্রে করে চা ও দুটো টোষ্ট নিয়ে এল। মুখে দিয়ে খগেনবাবু বললেন, 'টোষ্ট চমৎকার হয়েছে, কিন্তু ছেঁড়া যায় না।'

'বাসি বলে'—

'ওঃ, তাজা রুটি নিয়ে আসা হয়নি কেন?'

'বাজার করতে যাবার সময় নিয়ে আসব। মা ঠাকরুণ লোক পাঠিয়েছেন।'

'মা ঠাকরুণ!' 'ও বাড়ির মেমসাহেব।'

'ডেকে নিয়ে আয়।'

জিনের গলা-বন্ধ ফরসা কোট পরে একটি লোক এসে নমস্কার করলে, চিন্তামণি। ভারি সুসভ্য চাকর, একদিনের জন্যও লোকটা আধময়লা জামা পরলেনা, কাঁধের ঝাড়ন সর্বদাই পরিচ্ছন্ন, কোঁচার কাপড় সারাক্ষণ ওলটানো, চুল সর্বদাই ফিটফাট, সামনের গোছাটা সাদা—আর, কখনও গোঁপ দাড়ি উঠেছিল বলে মনে হয় না. ভাষা সুমিষ্ট ও সংযত, ডিশ ভিন্ন জলের গেলাস আনে না; জগ থেকে জল ঢালে যেন মদ ঢালছে, বৎসরে ছয় মাস নিশ্চয়ই পাহাড়ে কাটায়, নচেৎ অত মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না, উড়ে হয়েও জগন্নাথ দেখেনি, খোদ মেমসাহেবেব হাতের তৈরী। চিন্তামণি খগেনবাবুর হাতে খাম দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। মুকুন্দকে ঘরের ভিতব দেখে খগেনবাবু মুখ তুলে তার দিকে চাইলেন। তার মুখে চোখে ঔৎসুক্য প্রকাশ পাচ্চে, 'এইবার রান্নাবান্নার জোগাড় দেখগে।'

'রান্নাবান্নার কথা বলতে হবে না, বনেদী ঘরের চাকর নিজে করে নিতে জানে, ওকে কারুর বলতে হয় না।'

'রত্ন! এখন যাও।' মুকুন্দ নেমে যাবার পর খগেনবাবু খাম খুলে পড়লেন, 'আশা করি বিশ্রাম লাভ হয়েছে। সকালে এখানে খেলে সুখী হব। অন্যান্য দরকারি কথা আছে।' বিশ্রাম? নিশ্চয়ই হয়েছে, নিজের বাড়ীর তক্তপোষও ভাল পরের বাড়ীর খাট পালঙ্কের চেয়ে। দরকারি কথা না বাজে কথা! নাঃ এ বেশী হচ্ছে,

এবকম করলে চলবে না, দু'দিন পরে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা করতে হয় নিজেই কবা যাবে, স্নেহ মমতাব আশ্রয়ে থাকা ধর্ম তাঁর নয়, দু'দিন পরে ভগবানে বিশ্বাস পযন্ত কবতে হবে, শেষে গুরু বিনা, ঠিকুজী ছাডা একপা হাঁটা যাবে না। 'মুকুন্দ! আচ্ছা, একটু পরে এস, বাজাবে যাবাব আগে দেখা কবে যাস।' খগেনবাবু তাডাতাডি চিঠিব কাগজের প্যাডটা নিয়ে লিখতে বসলেন—শ্রদ্ধাস্পদা—দন্ত্য স, না মূর্দ্ধণ্য ষ? কোন মহিলাকে কখনও চিঠি লেখেন নি, সাবিত্রীকে সাবু লিখতেন, আপত্তি উঠেছিল. 'কেন. আমি কি তোমার রোগেব পথ্যি?' সেই থেকে বাণী, মনু, কত-কি! সেসব গোডায়, তার পব সাবিত্রী. শুদ্ধ সাবিত্রী, তাব বেশী লিখতে ইচ্ছে হত না, কি করা যাবে? কি লেখা যায়? পাঠ লেখবাব প্রয়োজন কি? না লিখলে বড ন্যাডা ন্যাডা দেখায়। সাবিত্রী নিশ্চয় বমাদি লিখত। পাঠেব কোন দবকাবই নেই, শ্রদ্ধাবও দরকাব নেই, শ্রাদ্ধেরও নেই, অপঘাত মৃত্যুব শ্রাদ্ধ হয়, কিন্তু এ যে আত্মঘাতী, শ্রাদ্ধ হয় না, হিন্দু আচাব অনুষ্ঠানের তাৎপয বোঝা যায় না। যা হয় নমঃ নমঃ শেষ করেই কাশী যেতে হবে। সেখানে গিয়ে শ্রাদ্ধ, কি প্রায়শ্চিত্ত কবলে মন্দ হয় না—কাশীতেই সুবিধা। তাই ভাল, মাসীমা আছেন, যোগাড়যন্ত্র ক'বে দেবেন, বিধবা মানুষ জানেন শোনেন। কিন্তু তাঁকে বিরক্ত ক'বে লাভ কি? ভারি বিরক্ত ঠেকে কলম থেকে কালি না পডলে। কলমটা ঝাডতে গিয়ে চিঠিব কাগজে খানিকটা কালি পড়ল—বিশ্রী দাগ, ব্লটিং কাগজ কোথায় গেল? মুকুন্দ ··উনি ত খুব জানেন! আর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে খগেনবাবু লিখলেন, 'ধন্যবাদ। একটু পরে যাচ্ছি, কিন্তু এখানেই খাব, কতদিন আপনাকে কষ্ট দেবো? যা করেছেন তার অন্য চির কৃতজ্ঞ।—খগেন্দ্র।'

চিন্তামণি চিঠি নিয়ে ঘব থেকে বেরোবাব সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ এল। 'ডেকেছেন?'

'এতক্ষণ আসা হয়নি কেন? বিশ দফায় জবাব দিও না।'

'আজ্ঞে না, দরজাব গোডায় দাঁডিয়ে থাকলে চলে কি আমাদের বাবু?'

'নিশ্চয়ই, তোমার কত কাজ! কি খেতে দেবে মনস্থ করেছ?'

'বাজারে যাই।'

'যাও, দু'পয়সার ব্লটিং পেপার কিনে এনো, আব একটা রোলার ছিল তাইতে লাগিয়ে দিও, সেটা খুঁজে বেখো।'

'ও আমি পারব না বাবু, ঠাকুবকে বলব'খন, বাবুদের বাড়ির খানসামা ছিল।'

'না তাকে আর ওপরে ঢুকিয়ো না, স্বস্থানেই শোভন হবে, ওরে আমার অনেক

কাজ আছে বুঝিস না কেন ? এখনি আসব, এখন বেরুচ্ছি।' 'তা হলে স্নান করে নিন।'

'যা বলেছিস। (কামাবার যোগাড় কর,) ঐখানে বাক্স আছে।' মুকুন্দকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'সব শিখে নাও না হলে কাশী যাবে কি করে ? আমার সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরতে হবে ত, আগে এক পেয়ালায় গরম জল নিয়ে এস।

'কাশী কবে যাবেন ?'

'যত শীঘ্র পারি এখানকার কাজ শেষ হোক।'

'কবে হবে ?'

'যথা সময়ে নোটিশ পাবে, যাও, নিয়ে এস, বেশী গরম এনো না।' মুকুন্দ এক পেয়ালা গরম জল নিয়ে এল।

'তা হলে মাকে আজই তার ক'রে দিন না বাবু ?'

'অত ব্যস্ত হলে চলে কি মুকুন্দ। কিন্তু মার কাছে গেলে তাঁর কষ্ট হবে না ত ?

'একটু হবে বৈকি। তাকে আবার রান্নাবান্না করতে হবে, আমার হাতে ত খান না।

'বেশত, তোমার ঠাকুরকে নিয়ে গেলেই হবে, কি বল ?

'আমি বলছি না নিয়ে যেতে, সে আপনার ইচ্ছে তবে মায়ের কষ্ট হবে তাই ভাবছিলাম।

'বাস্তবিক মুকুন্দ, (তুই বড় দূরদর্শী,) অনেক ভাবিস তুই।'

'আর কে ভাববে বলুন ?

'থাক—

খগেনবাবু কমলা দেবীর বাড়ী পৌঁছলেন তখন প্রায় ন টা। কমলা দেবী ঘড়ির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাওয়া হয়েছে ?'

'হয়েছে সকালেই।

'এই সময় আর একবার খান ?

'খাই।

চিন্তামণি কেটলীতে গরম জল নিয়ে এল—চা এর সরঞ্জাম সাজান ছিল।

'রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন ?

'খুব, অনেকদিন এমন ঘুমুই নি।

'ক্লান্তিতে, চোখে কষ্ট হয় নি ?'

'বেশী নয়, মুকুন্দকে গোলাপজল আনতে দিলাম, শিশিটা ভেঙে গেল।'

'মুকুন্দ তৎপর নয়, চিন্তামণিকে নেবেন? লোকটি কাজের।'

'চিন্তামণি ভাল চাকর, কিন্তু সে কি হয়! মুকুন্দ কোথা যাবে?'

'সাবিত্রী বলত ওকে কাশী পাঠিয়ে দেবে, সেখানে থাকবে ভাল; লোকজন আছে, কথা কইবে আর মন্দির দেখে বেড়াবে।'

'আমিও ভাবছি কাশী যাব।'

রমলা দেবী উঠে চা ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করলেন, 'কবে?'

'যত শীঘ্র হয়ে ওঠে, কাজটা সমাপ্ত হলেই।'

'সে কাজ না করলেও চলে।'

'আমাদের ধর্ম কত সুবিধার দেখুন!'

'কাশীই যাবার প্রয়োজন!'

'একটু কোথাও বেড়িয়ে এলে, একলা একলা, মনটা ভাল হবে, শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না অনেকদিন থেকে।'

চিন্তামণি ডিশে করে চিঁড়ে ভাজা ও সিঙ্গাড়া নিয়ে এল। রমলাদেবী ডিশ দু'টো সামনে ধরতে খগেনবাবু বড় এক চামচ চিঁড়ে ও একটি সিঙ্গাড়া তুলে নিলেন, কালো লঙ্কা ভাজা নেবার সময় রমলা দেবী বারণ করলেন।

'আর একটি সিঙ্গাড়া নিন।'

'লোভ হয়, কিন্তু নেওয়া উচিত নয়।'

'সব উচিত কাজ এখনই করা উচিত কি?'

'আগের কথা ছেড়ে দিন, এখন কোনটা করা অন্যায়?'

'আপনি ভারী অভিমানী, শেষে বাড়ী গিয়ে ঠোঁট ফোলাবেন।' রমলা দেবী বলেই অপ্রস্তুতে পড়লেন।

খগেনবাবু তাঁকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য হাসি মুখে উত্তর দিলেন, 'অত সহজে নয়, ওকাজ আপনাদেরই মানায়।'

'মানাচ্ছে আর কৈ?

'কোথায় মানাচ্ছে না বলুন?'

ঠোঁট একটু চেপে রমলা দেবী উত্তর দিলেন, 'তা হলে বলি? অভয় দিচ্ছেন ত? শেষে রেগে দেশত্যাগী হন যদি?'

'অভয় দিচ্ছি।'

'কাল এলেন না কেন?'

‘কাল? দেখুন, পরশুর কথা আলাদা, কিন্তু রোজ রোজ আসাট. ’

‘সে জন্য ভাববেন না, সাবিত্রী আমাকে বোনের মত ভাবত।’

‘তা জানি তা নয় ঠিক, বাড়িতে কি রইল, কি গেল, দেখতে হবে ত?’

‘কি গোছানি লোক আমার। মুকুন্দ খুব বিশ্বাসী নয় কি?

‘তা বটে, কিন্তু ’

‘বলুন না মানে কি? আপত্তি' বলা কেমন আপনাদের অভ্যাস বলুন না? আপনি এখানে আসতে চান না।

‘আমি অকৃতজ্ঞ নই।

‘কৃতজ্ঞতার কথা যদি তোলেন তবে কষ্ট করে আসতে হবে।

‘তা হলে কি বলব?’

‘কিছু বলতে হবে না। চা আর দেবো?’

‘দিন। দুজনের মধ্যে নম্র আবরণ নেমে এল।

নীরবে আর এক পেয়ালা নিঃশেষ করবার পর খগেনবাবু চোখ তুলে দেখলেন যে রমলা দেবী পাথরের মূর্তির মত চুপ করে, কোন বিশেষ দিকে দৃষ্টি না নিবদ্ধ করে বসে আছেন। মুখে তার বিষাদের ছায়া, স্ফটিকের অস্বচ্ছতা। কোন প্রকার মিথ্যার আবরণ নয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখোসটা অদৃশ্য হয়েছে, অন্তরের রূপ নগ্নভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অনেক পুঁথিতে পুরাতন হস্তলিপির ওপর নতুন লিপি লেখা থাকে, তাল পাতার ওপর সেই পুরাতন অক্ষরের আঁচড়ই পুঁথির আন্তরিক ইতিহাসের খবর দেয়। খগেনবাবুর মনে হল যেন রমলা দেবীর মুখে সেই পুরাতন বহুপুরাতন অক্ষরের ছাঁদ দেখা যাচ্ছে। ভাল করে দেখতে ইচ্ছে হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমলা দেবী নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়লেন—চিহ্ন লোপ পেল—স্ফটিক উজ্জ্বল হল, পরিস্ফুট হল ভদ্রতার চিকিমিকি, মুখোসের অন্তরালে মুখ দেখা গেল না। খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন।

‘এইখানেই স্নান করুন।’

‘করছি, কিছু মনে করবেন না।’

রমলা দেবী ট্রে সাজিয়ে রাখলেন।

খগেনবাবু বললেন, ‘আমার একটু একলা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাই আসিনি।’

‘একলা ত আপনি চিরকালই থাকবেন। কাশী গেলেই কি একলা হবেন?’

‘সেখানে কাউকে চিনি না। অতএব খানিকটা হওয়া সম্ভব।’

‘পারবেন না।

'কি পাবব না?'

'সেখানেও স্নেহ মমতা আপনাকে ঘিবে ফেলবে।'

'একটু তফাত আছে।'

'কাব সঙ্গে কাব? কি তফাত? বলুন না স্পষ্ট করেই, ভয় কি? আচ্ছা আমিই বলছি, সাবিত্রীব স্মৃতি থেকে বক্ষা পেতে চান ত? এই না? আর আমি সবদাই সাবিত্রীব কথা স্মরণ কবিযে দিচ্ছি—এই ত? আপনি আমাব স্নেহ মমত থেকে নিষ্কৃতি চান—এই না?' রমলা দেবী খগেনবাবুব আনত চোখেব প্রাি দৃষ্টি বেখে বলে যেতে লাগলেন, 'আপনাকে বলতেই হবে। কাল থেকে এখানে আসতে বলছি, আব আপনি কেবল লুকিযে লুকিযে বেড়াচ্ছেন, এব অর্থ আ বুঝি।' —একদমে অত কথাব পব হাঁপিয়ে পড়ে বমলা দেবী একটু হাসলেন— 'বেশ ভাল কথা, আমাব সোজা কথার উত্তব দিন।'

'বেশ ত বলুন না', আপনাদেব সোজা প্রশ্নই অত্যন্ত ভযঙ্কর, কাবণ তাব উত্তব হওযা চাই আপনাদেবই মনোমত। বলুন, আমি প্রস্তুত।

'আমাদেব মন সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয করলেন কোথায়?

'একজনেব কাছেই ঋণী।'

'সবাই আমবা এক ছাঁচেব?'

'হাঁ। তোমবা সবাই ভাল।'

'নিজেব ভাষায উত্তব দিন না।'

'কবি আমাদেবই ভাষা গুছিয়ে বলেন।'

'আপনাব বোন, আপনাব মাসীমা সব সাবিত্রীব মতন?'

'না, ঠিক তা নয়।'

'তবে?'

'আপনি বলুন। পুরুষে স্ত্রীজাতিব সম্বন্ধে যা জানে তাব চেযে জানে স্ত্রী পুরুষ জাতিকে।')

'আমাব অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ।'

'বেশ লোক আপনি, নিজেকে সবদাই গোপন বাখবেন!

'কি আছে যে প্রকাশ কবব? যা আছে তাই বুঝে নিন, আপনি ত আব অন্যেব মতন নন।'

'যা বুঝেছি সে ত ভুল প্রমাণ করে দিলেন, যা বুঝিনি তাই হয়ত ঠিক। বলুন না আমরা কি?'

'আপনি বড় ভাল মানুষ।'

'অর্থাৎ বোকা।'

'না, সত্যই ভালমানুষ।'

'ভালমানুষের কোন প্রয়োজন নেই এ সংসারে।'

'আমার হয়ত থাকতে পারে।'

'আপনার? যে লোক একলা থাকতে পারে তার আবার অন্যের প্রয়োজন?' কথাটা মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, খগেনবাবুর ইচ্ছা ছিল না রমলা দেবীর কোলকাতা সহরে একলা থাকার উল্লেখ করা। কোথায় যেন কার মুখে শুনেছিলেন যে রমলা দেবীর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই—ব্যাপারখানা কি জানবার জন্য কখনও ঔৎসুক্য পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি, বাসনাও হয়নি। হয়ত পরের কথা জানবার ব্যগ্রতারূপ সামাজিকতা তাঁর ছিল না। সাবিত্রী তাঁকে একবার রমলা দেবীর স্বামী সম্বন্ধে কি একটা খবর দিতে যায়, তিনি তার মুখ বন্ধ করেন এই বলে, 'আমি ভদ্রলোক, কোন স্ত্রীলোককে অমুকের স্ত্রী ভিন্ন একজন মাত্র ভদ্রমহিলা হিসাবেই দেখতে পারি, তুমিও অনুগ্রহ করে কোন পুরুষকে স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন ভদ্রলোক হিসাবে দেখতে চেষ্টা কোরো, চেষ্টা কোরো, চেষ্টা কোরো। পারবে না জানি, মেয়েমানুষে পারে না, পুরুষেও অনেকে পারেন না। তোমাদের দণ্ডবৎ করি, কেচ্ছা শোনার ও করার প্রবৃত্তিকে তোমরা সামাজিক গুণে পরিণত করেছ, সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা নভেল পড়, চা-পার্টিতে যাও, যদি প্রাণভরে কেচ্ছা না শুনতে পাও, তা হলেই বল নভেলে গল্প নেই, চা পার্টি জমল না। মনের তুচ্ছ দাগগুলো ঢাকতে শেখ।' রমলা দেবী কেন, তোমার নিজের বন্ধুরই গোপন কথা আমাকে শুনিও না।' মানুষকে নিঃসম্পর্কিত করে দেখাই সত্যকারের দেখা। আজ অসাবধানে তিনি রমলা দেবীকে আঘাত করেছেন, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি বললেন, 'আপনার মতন আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির কি প্রয়োজন থাকতে পারে আর কাউকে?' বিষাদের শান্তি উদ্ভিন্ন করে রমলা দেবীর মুখে উত্তর বা কোন প্রকার লক্ষণ ফুটল না। খগেনবাবু ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন, 'মিথ্যে বলছি না, আপনাকে স্বয়ংসিদ্ধই মনে হয়, আপনার যেন কোন প্রকার সম্বন্ধেরই প্রয়োজন নেই, একেবারে নিঃসম্পর্কিত। কি রকম মনে হয় জানেন? বাঁকুড়া অঞ্চলের শ্মশানের এক বুড়ো বটগাছ, ধু ধু করছে মাঠ, তারই গুঁড়ির মধ্যে এক পাথরের দেবীমূর্তি, ঝুরিতে ঢেকে রেখেছে সূর্যের তাপ ও লোকচক্ষুর জনতা থেকে। গ্রামের লোকে ভূতচতুর্দশী কি অমনি কোন

অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে পূজো দিতে আসে, সকলে নয়, নেশাখোর দানপিটের দল, তান্ত্রিক সাধু দু' একটি। মূর্তির শীতল করুণ হাসি পূজার প্রত্যাশায় ফোটেনি। দিগন্তব্যাপী নীরবতা, বুড়ো বটের সনাতনত্ব, জীবন-মৃত্যুর পারম্পর্য, ঊষর ভূমির নিস্ফল অবকাশের সাথে মিতে পাতিয়েই দেবীর আত্মা সন্তুষ্ট। এ দেবীকে ফুল দেবার দরকার নেই, এর পূজারী নেই, তবু এই মূর্তি হাসে, সুখ দুঃখের প্রতি গভীর ঔদাসীন্যে, পরিবর্তনের প্রতি চরম নিরপেক্ষতায় এই ... সস্মিতবদনী ও চিরকুমারী!'

হঠাৎ কমলা দেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, এ হাসি খগেনবাবু কখনও তার মুখে,—অন্য কারো মুখে শোনেন নি, তাই চমকে উঠে বল্লেন, 'বিশ্বাস করেন না? লোকে জ্যাকণ্ডার হাসিই উল্লেখ করে, কিন্তু আমি দু' একটি এমন মূর্তি দেখেছি যাদের হাসি আরো অপার্থিব।'

'কোথায় বলুন না?

'এ দেশেরই মূর্তি। একটি ব্র্যাকেটের ড্রায়াড, আর একটি বুদ্ধের।'

'বুদ্ধের মূর্তিতে ত থাকবেই, কিন্তু ড্রায়াডে কেন? ঐ সব যক্ষিনী কিন্নরী আমার ভাল লাগে না।'

সব গুলই ভাল নয় কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হল ভার বহন ও বিলি করা। মন্দির ও স্তূপের ওপরকার ভার ভীষণ, গ্রীক মন্দিরের এবং মেট্রপলিচের ক্যারিয়াটিডের দেহ অবলম্বন ক'রে সোজাসুজি সেই ভার নেমে আসে। তাতে দোষ হয় কি জানেন? মনে হয় যেন মেয়েরা সোজা দাঁড়িয়ে সব ওজনটা মাথায় বহন করছে, এটা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য রাজপুতানী যখন মাথার ওপর জলের ঘড়া বয় তখন মন্দ দেখায় না, কিন্তু ঘড়ার ওজন বেশী হলে একটু পুরুষালী ঠেকে না কী? তবু ত রাজপুতানী জোরে হাঁটে। বোধ হয় অ্যাথিনীয়নরা তাদের শত্রু অ্যামাজনদের আদর্শে কিংবা তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই মাথার ওপর ভার চাপাত। তার চেয়ে বাঁকাভাবে দাঁড়ানই আমার, আমাদের ভাল লাগে, বেশ হালকা মনে হয়, স্থূল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে যেন স্ব-ইচ্ছায় বঞ্চিত করা হল। তাই হওয়া উচিত, মেয়েরা জগতের সব ভার বহন করবে না, ভার হালকা ক'রে দেবে বাঁকাভাবে দাঁড়িয়ে বণ্টন ক'রে। তা ছাড়া না, বলব না।'

'কেন? বলুন না, তাতে কি?'

'তা ছাড়া, মেয়েদের গঠনরীতিই বাঁকা রেখায়।'

'কিসের গঠন?

'দেহের। অতএব, মেয়েদের পক্ষে, মনের। যে থাম ওপরের ভার বইবার জন্ত ব্যগ্র হয়ে লাফিয়ে ওঠে সেই থামই সোজা, আমার অত সোজা ভাল লাগে না, তার মধ্যে দাম্ভিকতা আছে।'

'আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না?'

'না, পারেন না, পারা উচিত নয়, পারলে বিসদৃশ ঠেকে, তার চেয়ে ড্রায়াডের মতনই ভাল, পাথরকেও লঘু মনে হয়।'

'অথচ পরনির্ভরশীলতাও পছন্দ করেন না?'

'তা ঠিক নয়।'

'কি ঠিক?'

'একটা সামঞ্জস্য।'

'আপনার সুবিধায়?' রমলা দেবী হেসে ফেললেন। খগেনবাবুর কুঞ্চিত ভ্রূ লক্ষ্য ক'রে তিনি বল্লেন, 'শুনেছি ড্রায়াডের মূল্য ডেকরেটিভ।'

'ও কথাটার মানে নেই, সভ্যসমাজের বুলি মাত্র। আমি মেয়েদের কেবল ঘরের আসবাব ভাবি না, সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ ভাবি না! আপনি বেশ ঠাট্টা করতে পারেন!'

'কোথায় ঠাট্টা করলাম? আপনি তো আমাকে কালো কষ্টিপাথরের হাত পা ভাঙা মূর্তি, আমার বাড়িতে যারা আসে তাদেরকে ডানপিটের দল বল্লেন, কত কবিতা ক'রে! এত কবিতাও জানেন!'

'ঐ দেখুন! ভুল বুঝলেন ত! আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠি না। আমি দিলাম উপমা, আপনি উপমার পাদপূরণ করলেন ব্যক্তি দিয়ে! বেশ!'

'না, না, আমি ঠাট্টা করছিলাম এখন। যখন লোকে ঠাট্টা করে তখন বোঝেন না, অথচ নিজে ঠাট্টা করতে তৎপর! বেশ মানুষ! আচ্ছা, অপার্থিব হাসিটা কি রকম?'

'সে এখন উড়ে গেছে। আচ্ছা, আপনি তখন হাসলেন কেন?'

'কখন?'

'ঐ আমার উপমার উত্তরে?'

'মনে নেই ত! বেশ যা হোক, পরের ওপর দোষ চাপাতে পারলেই বাঁচেন দেখছি!'

'বলুন না।'

'মনে নেই। মিথ্যে কথা বলি?'

'তাই বলুন, সত্য কথা বেবিযে আসবে।

'একটু সময় দিন। পবে বলছি, এখানে খেযে যান।

'খুব দব কথাকথি কবতে পারেন যা হোক'

'বলছি। কি বলব? আপনি পবেব ওপব অত দোষ চাপান কেন বলুন ত?'

'এব নাম বুঝি মিথ্যে বলা? আমি দোষ চাপাই না, আপনি দোষ করেছেন।

বমলা দেবী উদ্বিগ্ন হযে চাইলেন।

'আপনি সাবিত্রীকে কুশিক্ষা দেন নি?

'যা ভাবেন।

'যা ভাবি তা প্রকাশ কবেছি

কুশিক্ষা কেউ দেয় নি। তার স্বভাবই ছিল নবম কারুব হুকুম ভিন্ন সে চলতে পাবত না। আমি হুকুম কবতাম না, আমি তাকে ভালবাসতাম।

'তা জানি সেও খুব ভালবাসত—তাবও বেশী করত। কিন্তু আমাব 'হুকুম' সে মানত না।

'আপনি হুকুমই কবতেন না, করতেন যদি ভাল হত।

'আমি হাকিম হয়ে জন্মাইনি, কি কবব? আমি যে তাকে ভালবাসতাম না তাও বলতে পাবি না। সে ভাল হোক, আমি এই চাইতাম।

'সেও আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসত—বোধ হয, অত ভালবাসার রীতিই তাই।'

'কখ্‌খনো না। বেশী ভালবাসলে ছেড়ে দেয়।

'শেষেব কবিতায়।

আদি সত্যেব তাগিদে।

'সে চেষ্টা কবত আপনাকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিতে, আমি নিজে জানি, কিন্তু পারত না। তাব স্বভাব তখনও তৈরী হয় নি—আপনি তৈরী হবার সময়ও তাকে দিলেন না।

'তা হলে আমারই দোষ।

'দোষ আবাব কি? তাকে একান্ত কবে দেখেন নি। আপনার আদর্শ-সাবিত্রীকেই আপনি বাসতেন ভাল। তাকে ভালবাসা বলে না, মেয়েরা বলে না, মেয়েরা তা চায় ন

'তারা কি চায আমি জানি না, চেষ্টা করলেও জানতে পারব না। আমি যা আমি তাই। সেই জন্যই ত কাশী যাচ্ছি।'

'রাগ করলেন ত?

'ক্ষমা করুন, সত্যিই রাগ করিনি। রাগ করবার জন্য এখানে আসি না।

'আপনি আর আসেন কোথায়? আমিই কেবল নির্লজ্জের মত ডেকে পাঠাই।

'ছি। বলবেন না। নিজেই আসি—কোথায় যাব বলুন?

'যাবার জায়গা নেই বলে আসেন?

'আমার সোজা কথার বাঁকা অর্থ করে ক'রে কি তৃপ্তি পান? আসতে ভাল লাগে বলেই আসি। সুজনকে দেখছি না কেন?

'ডেকে পাঠাব?

'না, ডাকতে হবে না।

আপনি কাশী যাচ্ছেন কবে?

'জানি না।'

'এইবার স্নান করুন।

'স্নান ক'রে এসেছি।

'আপনার চোখ কেমন?

'চোখ খারাপ হচ্ছে বোধ হয়।

'দিব্যি চোখ আছে নচেৎ অপার্থিব হাসিও দেখতে পান

'সত্যি দেখছি। ঠোঁটে হাসি, চোখে জল নেই, কিন্তু কি অসম্ভব করুণা জল জমে বরফ হয়নি হাসি ফুটে লোভনীয় করেনি, অত্যন্ত সংযত মন হত, যীশুর মুখে যে করুণা মাখান হাসি প্রত্যাশা করা যায়।

'সেই লাল মাঠের মাঝখানে বুড়ো বটগাছের তলায় মূর্তির মুখে?

'না, তার মুখ কঠিন।

'তার চোখে জল দেখেন নি?

'না।'

'সে জন্য চোখ থাকা চাই।

'আমি কি এতই কানা? তার চোখ শুকনো।

'হবে—আমি ত দেখিনি।

'আপনার চোখে ছানি আছে।

'হয়ত আছে।

'নিজেই জানেন কিসের।

'আপনারই আছে।

'আদর্শবাদের ছানি ? থাকতে পাবে। যদি থাকে, নিজেই খসে যাবে।'
'তাই কি যায় ? সাজন ডাকতে হয়।'
'গোলাপ জলে হয় না ?
'আপনাকে খাবার দিই ?
রমলা দেবীর কণ্ঠে গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে খগেনবাবু বল্লেন, 'এইবার বুঝেছি। সাবিত্রীর জন্য আপনারও যে কষ্ট হয়েছে আমার বোঝা উচিত ছিল। আমার বুঝতে একটু দেরী হয়।'
রমলা দেবী হঠাৎ উঠে পড়ে বল্লেন, 'দেরী হয়েছে। মুকুন্দ রাগ করবে না ?'
'মুকুন্দ কেন রাগ করবে ?'
'না, তাই বলছি, দেরী হয়েছে কিনা।'
'তা হোক গে ! আপনি বসুন !'
'না, আগে খাবার দিই।

রমলা দেবী যখন ঘরে এলেন তখন খগেনবাবু মাথা নীচু করে বসে আছেন।
'এখনি খাবার দিচ্ছে। কি ভাবছেন ?'
'কি আর ভাবব ? কেবল অন্যায়ের স্তূপ বেড়েই যাচ্ছে— পরের কথা বুঝিনি। কেবল নিজের সম্বন্ধেই ভেবে এসেছি।'
'ক্ষতি কি ?'
'ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছে। অবশ্য সেই জন্যই নিজের পায়ে দাঁড়ান আমার পক্ষে সোজা হবে। আমার জগৎ কোথায় জানেন ? এই মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার বাইরে কি আছে জানি না, তার একটা মোটা নাম দিয়েছি, সাধারণ মানুষ, জনগণ। ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না।'
'বুঝিয়ে কি আর হবে ? আপনি তা হলে মাসীমার কাছে যান !'
'তাই যাব, এক একবার মনে হয় তাঁকে এই বয়সে বিরক্ত করবার আমার কি অধিকার আছে ? অনেক কষ্ট করেছেন, আর কেন ?'
'আপনি ত দুঃখের পসরা উজাড় করতে যাচ্ছেন না, আপনি যাচ্ছেন নিরুদ্দেশে।'
'তা বটে। কিন্তু কাশী গেলেই যে সংসারত্যাগী হব তা বলছি না। আমার একাধিক বন্ধু আশ্রমবাসী হয়েছেন—তাঁদের কাজ চিঠি লেখা, আরো কত কি !

বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে তাঁদের বড্ড ইচ্ছে হয় বেশ বুঝতে পারি।'

'সকলেই কি এক? একবার তাঁদের দেখিযে দিন না, কি ভাবে সমস্ত সামাজিক বৃত্তিগুলোকে সঙ্কুচিত করলেই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হওয়া যায়।'

'আপনি ঠাট্টাই করুন আর বিদ্রূপই করুন, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি যে কাশী গিযে আমি কাউকে চিঠি লিখব না। বন্ধু টন্ধু আর আমার নেই। নিজে নিজে সুখী হতেই তাঁদের প্রত্যেকের শক্তি নিঃশেষিত হযে গিয়েছে, বাকী যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু ব্যয় হচ্চে নিজের ভণ্ড সুখের বিজ্ঞাপন দিতে। আচ্ছা, আপনি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করেন?'

'করি।

'সাবিত্রীর সঙ্গে যা ছিল তা নয়। ও ত কেবল এক তরফা। আমি বলছি অন্য রকমের বন্ধুত্ব। এই কি রকম জানেন? পেটেতে ধক ক রে লাগে যার কথা ভাবতে গেলে—একেবারে নাড়িতে টান পড়ে। কি যে পাগলামি করছি! কৈ খাবার দেবেন না? আজ স্নান করব।

'একবার করেছেন না? শরীর ভাল থাকলে আবার না হয করুন না, মাথাটা ধুয়ে ফেলুন।'

'আচ্ছা তাই ফেলি।

'বসুন না, একদিন না হয দেরীই হল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উল্টে যাবে না। কাল আপনার পুরোনো বন্ধুদের গল্প বলছিলেন বড ভাল লাগছিল। বন্ধুত্ব হলে কি রকম হয়?'

'ও সব ছেলেমানুষী কথা ভুলে যান।

'সে কথা থাক। বন্ধুত্ব করতে হলে কি করতে হয়?'

'কি আবার করতে হয়। কি রকম হয়ে যায়। ঠিক বলা যায় না।'

'বলা না গেলেও বন্ধুত্বটা আছে ত।

'নিশ্চয়ই। বন্ধুত্বটা দেহগত, বুকটা কেমন ধক ধক করে, যেন বসে যায়। প্রেমে যেন একটু হালকা মনে হয়—ওটা যেন মাথার ব্যাপার। আমি অবশ্য শেষেরটি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

'আপনার শুনেছি ছেলে বযসে একজনের সঙ্গে খুব ভাব হযেছিল।'

'সে-সব ছেড়ে দিন। মনে নেই সব কথা, করতেও চাই না। তবে বন্ধুত্বটা বইএর ধার-করা কথা নয়—কারণ বড কেউ বন্ধুত্ব নিয়ে নাটক নভেল লেখেনি। যে সব কবিতাও আছে সেগুলি ছন্দে লেখা দর্শন। বেশির ভাগই কেন, সব কবিতাই

প্রেমের—তাই কবিতা আমার নতুন না হলে ভাল লাগে না।'

'নতুন আর কি হবে বলুন?'

'নতুন বিষয়, নতুনভঙ্গী। পুরাতন বিষয় হলে ভঙ্গীটা নেহাৎ ভাল হওয়া চাই। সত্যি বলতে গেলে ছেলেমানুষ না হতে পারলে কবিতা লেখা যায় না, কবিতা-মাত্রই মানসিক অপবিপক্কতাব নিদর্শন, তাই যৌবনে কবিতা ভাল লাগে। আর যেই ভাল লাগা, অমনি কবিতার চোখা-চোখা ভাষা মাথার মধ্যে উকুনের মত বাসা বাঁধে, তখন আর মাথা ন্যাড়া না করা ছাড়া উপায় নেই। কবিতাই প্রেম সৃষ্টি কবেছে, নভেল নাটক সাহায্য করেছে কবিতাকে। যদি না স্বীকার করেন তা হলে বলব প্রেম অপরিণত সাহিত্যিকের বই বিক্রী করবার ফন্দী, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। কিন্তু বন্ধুত্বকে সাহিত্যিক বাগে আনতে পারেন নি। কি ক'রে পারবেন। ওটা যে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা, বাস্তব, খাঁটি জিনিষ, যেমন, যেমন—আপনি আমাব সামনে রয়েছেন। কৈ কেউ আঁকুন দেখি আপনাকে? সকলে বলবেন, বেশ একজন মহিলা বসে রয়েছেন—কিন্তু হল না ঠিক—বাদ পড়ে গেল অনেকটা। আপনি আমার কথা শুনছেন, আমি কথা কইছি—এই মানবিক সম্বন্ধটি বর্ণনা থেকে বাদ পড়ল। এইটাই কিন্তু আসল, এই সম্পর্কেই আপনি আপনি, আমি আমি। কোন সাহিত্যিক এই চলিষ্ণু, গতিশীল, এই অশরীরী অথচ বাস্তব সম্বন্ধরূপী সত্তাকে রূপ দিতে পারেন কখনও? আঁকতে পারেন আপনাকে, আমাকে, টেবিলরুথকে, পৃথক, পৃথক করে· '

'ছবিতে কিন্তু এই সম্বন্ধটি ধরা পড়ে নাকি? এ রকম যেন দেখেছি, টেবিলের ওপর ফল রয়েছে. সেই জন্য টেবিল ও ফল ভিন্ন রকমেরই দেখাচ্ছে?'

'ধরা পড়ে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধটি কিছুতেই পড়ে না! বলছি আপনাকে—আপনি ত ইম্প্রেশনিষ্টদের কথা বলছেন? তাঁদের চোখ ক্যামেরার চোখ মানছি, তাঁরা আলোকে ছবির নায়ক করেছেন স্বীকার করছি, রঙের খেলা দেখানই তাঁদের উদ্দেশ্য স্বীকার করছি, তবু, তবু প্রত্যেক আর্টিষ্টই সত্যকারের সম্বন্ধটিকে মেরে ফেলে তবে নতুন সম্বন্ধ রচনা কবে। নতুনটা হয়ত সত্যের চেয়ে বেশী মনোহারী, তাতে আসে যাচ্ছে না, কারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী মধুর আর কি হতে পারে? প্রেম? কিছুতেই না, প্রেমের পরিণতি বন্ধুত্বে, বন্ধুত্বের অবনতি প্রেমে।'

'সম্বন্ধের অস্তিত্ব মানেন দেখছি' বলে রমলা দেবী একটু হাসলেন। খগেনবাবু না লক্ষ্য করেই তাঁর চিন্তাধারার অনুসরণ করলেন:

'আর্টের মূলধন স্মৃতি, প্রেমেরও তাই, সেই জন্য আর্ট ও প্রেমে অত মিল। বন্ধুত্ব

হয় আছে, না হয় নেই, নতুন কিছুতে পরিণতও হয় না—ভারি মজার ব্যাপার! বড় খাঁটি জিনিষ, দেহটা যেমন। এ সব নিয়ে আলোচনা কর যায় না, অতএব সাহিত্যও করা যায় না।'

'খুব শুদ্ধ?'

'মাতৃস্নেহের চেয়ে। একটা ছেলে মারা গেলে মা অন্য ছেলে চায়, নতুন ছেলের ওপর মায়া পড়ে, কিন্তু বন্ধু মারা গেলে আর একটা বন্ধু পাতে ইচ্ছে হয় না। বন্ধু গেল, সুখ নিবে গেল আপনি কি ভাবছেন? হল কি? কি সব বাজে বকছি। বন্ধুত্বটা প্রেমের চেয়ে বড় মনে হয়। অবশ্য সবই আমার 'মনে হয়', মনে হওয়া ছাড়া আর কি আছে বলুন? সবই আমার মনে'

'কেন বন্ধুত্ব? সেটা ত মনে নয়?'

'তা বোধ হয় না, সেই জন্যই ত শুদ্ধ। ওলট পালট কথা হল, নয়? তা হোক গে। তার ভেতর মিল একটা কোথাও আছে, আপনি বুঝে নেবেন।'

'মন দিয়েই বুঝেছেন মনের অতিরিক্ত বন্ধুত্ব?'

'তা ছাড়া উপায় কি?

'স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগের মহিমা আছে।'

'মহিমা অর্জনে ব্যগ্র নই, কিন্তু, রামচন্দ্র বনবাসে চললেন।'

'উপমাটি খাটল না।'

'কেন?'

'এই লক্ষ্মণের অভাব। এইবার মাথা ধুয়ে খাবেন চলুন, দেরী হয়ে গেল। কবে কাশী যাচ্ছেন?

'যেদিন ছুটি পাব।

'ছুটি কিসের?'

'দরকারি কাজ থেকে—চিঠিতে য লিখেছিলেন।

'শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নেই, পুরোহিত ঠাকুর নিজেই করে নেবেন, পঞ্চাশ টাকা চাই।'

'হিন্দুধর্ম বিপদেও ফেলে, আবার উদ্ধারও করে। চলুন।

খাবার পর বসবার ঘরে এসে বসল। দেবী বল্লেন, 'ঠাট্টা করেছি বলে রাগ করবেন না।

'রাগ করব কেন? নিজেই যদি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করি, আপনার দেখিয়ে

দেবার অধিকার আছে নিশ্চয়।'
'অধিকার আবার কি! সম্পর্ক যে রাখতে চায় না তার ওপর অধিকারও নেই।'
'বন্ধুদের অধিকার আছে নিশ্চয়, নিঃসম্পর্কিত হয়ে জীবন কাটান যায় কিনা পরীক্ষা করছি মাত্র, হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব না।'
'নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবেন. চেষ্টা করলে কি না হয়। তবে কিসের জন্য চেষ্টা?'
'জন্য আবার কি? ভিড়ের আর মানুষের মতন মানুষের পার্থক্য খোঁজা, এই চেষ্টা! যে মানুষ সে নিজের ওপর দাবী করে, নিজের কাছে চায়, যে সাধারণ সে চায় পরের কাছে। সেই জন্য অবলম্বনহীনতাই যোগ্যতার কঠিনতম পরীক্ষা। ধ্যানী ও যোগীরাই একমাত্র মানুষ, বাকী সব canaille—সাধারণ। আমার সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে।'
'শক্তি?' 'পরে দেখা যাবে। শক্তি নিয়ে জন্মায় না, ঘসতে ঘসতে হয়। চেষ্টা করব না, আত্মসংযম করব না, গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাব যে!'
'কোন সম্বন্ধই রাখবেন না? এই যে বল্লেন, ছবিতে…'
'বাজে কথা বলেছি… ও রকম মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ধরতে নেই সব কথা।'
'একটিও বাজে মনে হয়নি আমার। বন্ধুদের খবর দেবেন না?'
'না। আগেই বলেছি, দেখাব কি ক'বে কর্মঠবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। নেহাৎ না পারি…'
'মুকুন্দ যাচ্ছে? লোকটা কি কাজের? যদি কিছু না মনে করেন তা হলে চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ করতে পারি কি? চিন্তা সাবিত্রীকে বড়ই ভালবাসত, সাবিত্রীরও চিন্তাকে পছন্দ হয়েছিল, মুকুন্দ না হয় বাড়ী আগলাক।'
'না, না, সে হয় না, বেচারা মাসীমার কাছে মানুষ, যাবার নাম শুনে অবধি কি খুশী! বাড়ীটা আপনি এখান থেকে যা পাবেন তাই দেখবেন। চাবি আপনার কাছেই থাকবে। দরকার হয় যদি কিছু—আচ্ছা, আমি গিয়েই আপনাকে চিঠি দেবো, যদি বইটই পাঠাবার প্রয়োজন হয় সুজনকে দিয়েই পাঠাবেন। চিঠির উত্তর দেবেন ত? আমিও অবশ্য নিয়মিত চিঠি লিখতে পারিনা।'
'দরকার হলে লিখবেন। কখন যাবেন? যাবার আগে যেন খবর পাই।'
'ভাবছি তা হলে কালই যাই।'
'গোছগাছের কি হবে?'
'ঐ ত বিপদ! মুকুন্দ যা বুদ্ধিমান কোথায় কি আছে ছাই জানিও না, কখনও

জানবার ইচ্ছেও ছিল না।'

'আমি '

'সে ত খুবই ভাল হয– যদি অনুগ্রহ ক রে, কষ্ট যদি না হয যদি একবার দেখিয়ে দেন ও কাজ আপনাদেরই শোভা পায়। সুজনকে না হয নিয়ে যাবেন।'

রমলা দেবী সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

বেলা একটার সময বমলা দেবার প্যাবাসল নিয়ে নিচে এলেন। দরজার গোড়ায খগেনবাবুর মনে হল চা এর নিমন্ত্রণ কবাটা ভদ্রতা, কিন্তু এ সময নিমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাশাও কবে না, তা ছাড়া মুকুন্দটা একেবারেই অকর্মণ্য। ফিবে দাঁড়িযে বল্লেন, 'ছাতাটা থাক্, রোদ্দুব নেই, বিকেলে ঐখানেই চা খাবেন

বমলা দেবী বল্লেন, 'থাবো, চা-এব প্রয়োজন নেই, প্যাবাসলটা নিযেই যান

আচ্ছা, থাক।

৫

পথে খগেনবাবু বই এর দোকানে প্রবেশ কবলেন। বেনাবস যেতে হবে, সেখানে প্যাডা পাওযা যায, বই পাওযা যায না। এই দোকানটিব প্রত্যেক আলমাবিব সঙ্গে তাঁব পবিচয ঘনিষ্ঠ। নতুন নতুন বই সবদা বিদেশ থেকে আসছে, মালিক ও কর্মচাবীবা সাহায্য কবতে সদাই প্রস্তুত, যতক্ষণ ইচ্ছে বই ঘাঁটা যায, কেচবাব কোন অভদ্র তাগিদ নেই, মাঝে মাঝে চা পাওযা যায, মিঠে পানেব দোনাও আসে। দোকানে প্রবেশ কবতেই ছোটবাবু বল্লেন, 'এত বোদ্দুবে এই দুপুবে। ভেতবে আসুন।

দোকানেব এককোণে একটি ছোট ঘব, খগেনবাবু সেইখানে গিযে বসলেন। খববেব কাগজে তাহলে বেশী উচ্চবাচ্য কবেনি। এঁবা খুব ভদ্র হযত জেনে শুনেও উল্লেখ কবছেন না। ছোটবাবু এক গাদা বই এনে টেবিলেব ওপব বাখলেন সিগাবেট ধরাতে ধবাতে খগেনবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন 'শববতেব দোকানে অডাব দিলে বাড়ীতে দিয়ে আসে?

'নিশ্চযই, কেন? ওবে খগেনবাবুর জন্যে এক গেলাস ঘোলেব শববত নিযে আয, আব দু দোনা মিঠে খিলি।

'না, না তা বলছি না।'

'খান না।'

'আনান তা হলে, ঘোলের শরবতে গা ঘিন ঘিন করে।'

'ওরে, গেলাস ধুয়ে নিয়ে যা।

যে সে লোক তৈরী করে নোংরা আঙ্গুল দিয়ে, বাড়িতেও খগেনবাবু বাড়িতেও ঘোলের শরবত খেতেন না, আঙ্গুল দিয়ে তোলা মাখনেও তাঁর আপত্তি ছিল, মেয়েদের হাত বড় নোংরা। সাবিত্রী একবার ঘোলের শরবতে কি একটা উগ্র গন্ধ দেয়, বড় তেতো হয়, খগেনবাবু খেতে পারেননি, মান অভিমান, সেই থেকে ঘোল ত্যাগ, ডাবে প্রেম।

'একটা ডাব আনতে বলুন। খগেনবাবু বই ঘাঁটতে লাগলেন।

বিদেশী নভেল, বেশীর ভাগই ভজমায়। অনুবাদ পড়তে তাঁর ভাল লাগত না, প্রত্যেক কথার প্রত্যেক বাক্যের শিকড় থাকে, অনুবাদক অপটু মালির মতন গাছ উপড়ে ফেলে, শিকড় সমেত তুলতে পারে না, ছিঁড়ে যায়, তাই টবে বসালেই মরে যায়। মেয়েদের কথারও শেকড় আছে, সাবিত্রীরও ছিল, তিনি তুলতে গিয়ে শিকড় ছিঁড়ে ফেলতেন। 'তুমি এই বলছ ত?' 'না বলিনি, তুমি আমার কথা বুঝবে না। এক একজন অনুবাদককে মালি বলতেও ইচ্ছে হয় না, বাছুর বল্লেই হয়। স্কট মনক্রিফের ব্যাপারই আলাদা, কেমন ক'রে প্রুস্তের ঐ গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করলেন কে জানে? রচনাভঙ্গীর ওপর বাঙ্গালী সাহিত্যিকের স্বত্বত্ব যে কমে আসছে তার কারণও ঐ অনুবাদ পড়ার অভ্যাস। নভেল পড়া আর চলে না। এই যে। বটিচেল্লির জীবনটা সস্তায় বেরিয়েছে, কেনই বা আগে কেনা। অধৈর্য, সকলের আগে দামী বই কিনে পড়েছি—এই সংবাদ দেবার মধ্যে একটা মোহ ও দাম্ভিকতা আছে। বই পড়াতেও রেষারেষি, ঘোড়দৌড়। কোলকাতায় থাকলেই সর্বাগ্রে কিছু করবার ইচ্ছা হয়—আর ভাল লাগে না। বিলিতী প্রকাশকরা ভারী চালাক—গোড়ায় ৩০ টাকা, দু'বছর পরে ১০ টাকা। জাপানীরা ছবি ও কবিতা সম্বন্ধে লেখে ভাল—বটিচেল্লি ও ইটালীয়ান প্রিমিটিভদের ছবি জাপানীরা বোঝে ভাল, রেখার কম্পন তাদের প্রাণে অতি সহজেই স্পন্দিত হয়। বেরেনসন এর বইটা নিতে হবে—সত্যকারের সমালোচক। নতুন কবিদের কবিতা—এদের জগৎ থেকে সাধারণ বহিস্কৃত এই লোকে বলে, তা নয়, প্রত্যেক আধুনিক নিজের পরিবার মধ্যে কেল্লা বেঁধে বসে আছে। সে কি করবে? পৃথিবীটাই বিগড়ে গিয়েছে, তাই মর্গ্যান লিউইসকে হল্যাণ্ডের এক কেল্লায় পুরেছেন। এটা কি? পাউইস

নির্জনতার গুণকীর্তন করেছেন। মন্দ নয়, সাহেবরা হল কি? ভিড় থেকে পালাচ্ছে—কিন্তু কোথায় পালাচ্ছে? সে দেশের খবর পেতে হলে পড়তে হয় পুরনো বই। 'ছোটবাবু, এটাও দিন, প্যাসকালের পেনসীজ সস্তায় বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এভরিম্যান সিরিজে, দিই!'

প্যাসকালের তুলনায় পাউইস পানসে। গ্যাসেটের 'জনসাধারণের উপদ্রব', বইটার খুব সুখ্যাতি দেখছিলাম, দিনত, কোন ভাল এডিশন আছে মার্কাস অরেলিয়াসের?'

ছোটবাবু প্যাসক্যাল, অরেলিয়াস ও গ্যাসেট আনলেন।

রাশিয়া-সংক্রান্ত নতুন খবর আর কি থাকবে এ সব বই-এ? ও দেশে জন-সাধারণকে স্বর্গে তোলা হয়েছে, ভাল লাগে না। সাহিত্য তাই হচ্ছে না। সাহিত্যের জন্য চাই অবসর, অবসরের জন্য বড় লোকদের দল থাকতে বাধ্য, যারা নিষ্কাম ভাবে চিন্তা ক রে যাবে, যাদেরকে কাজের জগতে নামতে বলা সমাজের পক্ষে মূর্খতা। প্রোগ্রাম বেঁধে প্রোপাগাণ্ডা করে কখনও সাহিত্য হয়! রাশিয়ান ফিলমের বই দু'একখানা নিলে হয়, ফিলম করছে নতুন ধরণের। 'সিমেণ্ট' আর ফিলমের নতুন বইটা নেওয়া যাক। ছোটবাবু এপিকটেটাস, সেনেকা, মনটেন, আর গ্যেটের নির্যাস এনে টেবলে রাখলেন—মরোক্কো চামড়ার চমৎকার বাঁধান, মোড়া যায়। বই এর পাতার ও চামড়ার গন্ধ ও স্পর্শ খগেনবাবুকে অভিভূত করত। ছোট্ট খাট্ট বই, বং বেরং-এর বাঁধাই, পকেটের মধ্যে আপত্তি না জানিয়ে চলে যায়, গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছা করে, ছুঁলে গা শির শির ক'রে ওঠে, কাঁটা দেয়। প্রত্যেক অক্ষর সুস্পষ্ট, ভুল নেই কোথাও। মাথার বালিশের পাশে চুপটি করে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে, খোলো খুলবে, না খোলো মুখ বন্ধই রইল, কোন মান নেই, অভিমান নেই, আদর-কাড়ান নেই। সাবিত্রী ঘুমুত পাশ ফিরে, বেশ দেখাত টেবল ল্যাম্পের আলোয়, শোবার সময় চুল আঁচড়ে ঢিলে খোঁপা বাঁধত, মুখে দিত হাইড্রোজেন পেরক্সাইড আর গ্লিসারিন, শুত কুঁকড়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আলগোছে, বিছানায় দাগ পর্যন্ত পড়ত না, হালকা ছিল, এই বটিচেল্লির অঙ্কিত মেয়ের মতন, যারা সব হাওয়ায় উড়ছে ওপর দিকে, মাটিতে পা দিচ্ছে যেন করুণা করে, যারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজ করবার কোন সুযোগই দেয় না। তা নয়, যত সব নিতম্বিনীর দল! সাধে কি গৌড়ীয় রীতি হীনরুচির পরিচায়ক! ঊর্ধ্বগতি না হলে আত্মার সদগতি হয় না। রমলা দেবী কি ক'রে নিজেকে

হালকা রাখলেন কে জানে! নিশ্চয়ই গরম জলে লেবু ভিনিগার খান, মিষ্টি খান না। তাইত, তাঁর জন্য কি আনান যায়! স্যাণ্ডউইচ করলে মন্দ হয় না। একবার রমলা দেবী চীনেবাদামের স্যাণ্ডউইচ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, চমৎকার লেগেছিল, পরের দিন সাবিত্রী করতে যায়, হয়নি। অনুকরণ! সাবিত্রী ছিল উৎসবমূর্তি, মন্দিরাভ্যন্তরে যে মূর্তি বিরাজ করত সেটি রমলা দেবীর।

খগেনবাবুর নির্বাচিত বইগুলি একজন কর্মচারী প্যাকেটে বেঁধে দিলেন। সেটি নিয়ে, খাতায় সই ক'রে খগেনবাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। কলেজ স্কোয়ারের ঘড়িতে তিনটে। ন্যাশন্যাল হোটেলে স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে, মনোহারি দোকানে একটিন বিলিতী বিস্কুট ও মাখন কিনলেন—দ্বারিকের দোকান থেকে ভাল সিঙ্গাড়া আনালেই চলবে। তাড়াতাড়ি বাড়িতে প্রবেশ করেই মুকুন্দকে বল্লেন, 'যাও মুকুন্দ, এখনি দ্বারিক ঘোষের দোকান থেকে আট খানা সিঙ্গাড়া, আট খানা খাস্তা কচুরী ও আধসেরটাক ঝুরিভাজা কি ডালমুট নিয়ে এস। যাও দেরী কোরো না—কাশী যাওয়াই ঠিক। তোমার খুড়ো কোথায় গেলেন? তাঁকে চা-এর যোগাড় করতে বল। বাসে যাও, বাসে এস, দেরী কোরো না, চারটের মধ্যে আনা চাই। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যাঃ।' মুকুন্দ চলে যাবার পর ঠাকুরকে ষ্টোভ ধরাতে বল্লেন। তাও ত বটে। শরবত কে করবে? অর্ডার দেওয়া হল না! 'ঠাকুর এক কাজ করতে পার? গোলদিঘির ধারে ভাল শরবতের দোকান থেকে ঘোলের শরবত নিয়ে এস, বড় কাঁচের জাগটা খুঁজে নিয়ে যাও।'

'বাবু, নিজেই করব? খানিকটা দই নিয়ে আসি, নিচে কল রয়েছে, ওপর থেকে ভ্যানিলা কি অন্য কিছু সেণ্ট দেবেন। দেখুন না, আমার হাতে খেয়ে, আমাদের সেজবাবু আর কারুর হাতে··'

'আচ্ছা, তাই নিয়ে এস!'

'কিছু বিলিতী খাবার তৈরী করব?'

'দেশী বিলিতী দরকার নেই, মুকুন্দ আনতে গিয়েছে, তুমি জান?'

'আপনাদের আশীর্বাদে· পাপমুখে আর কি বলব! সাধে কি বাবুরা পঁচিশ টাকা ক'রে দিতেন! আর স্ত্রীর জন্য পূজোর সময় শাড়ি··'

'ও সব কথা পরে হবে। চা-ই কর, দেখব কেমন কর!'

'কখন চাই বাবু?'

'চারটেয়।'

'বাংলা, না ইংরেজী ? একটা যদি রান্নাঘরের জন্য টাইমপীস দেন।'
'এখন যাও।' ঠাকুর চলে গেল। পাঁচশ টাকা! কাজিল! একেবারে অ্যামেরিকান! মুকুন্দ গলায় ছুরি দিতে পারে দেখছি, নিশ্চয়ই রক্ষা হয়েছে! খগেনবাবু প্যাকেট খুললেন। প্রথমেই গ্যাসেট রয়েছে। সাধারণ মনের দুটি নিদর্শন তিনি দেখাচ্ছেন the free expansion of his vital desires, and therefore, of his personality ; and his radical ingratitude towards all that has made possible the case of his existence জৈবিক কামনা পূরণের অবাধ সুবিধা চাওয়া এবং অকৃতজ্ঞতাই হল আদুরে ছেলের মনোভাব। বাস্তবিক সাধারণ মানুষ বড় আব্দারে হয়েছে - চায় কি ? রাস্তায় রাস্তায় কার্তন গেয়ে বেড়াবে আর ভদ্রলোককে ফুটপাথে হাঁটতে দেবে না ? ট্রামে ট্রেনে চড়ে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক বর্বরতার নিন্দা করবে ? একটা অধ্যায় Noble life and Common Life, or Effort and Inertia – These are the select men, the nobles, the only ones who are active and not merely reactive, for whom life is a perpetual striving, an incessant course of training. Training = askesis. These are the ascetics – এই ত ঠিক! সাধনা করতেই হবে, স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতেই হবে, নচেৎ গা ভাসান ভিড়ে, ফ্যাসানে—তাতে আভিজাত্য নষ্ট হয়। এই গ্যাসেটই না স্পেনের নূতন দলের নেতা ? লোকটা কি বলছে দেখতে হবে। personality না লিখে individuality লিখলে ভাল করতেন। দর্শনের অধ্যাপক, লিখছেন সমাজতত্ত্ব, ভালই হবে বইটা। স্পেনের একটা আভিজাত্যের দম্ভ আছে, ভারী অহঙ্কারী জাত। কথায় কথায় ছুরি চালায়। কিন্তু এদের আভিজাত্য য়ুরোপের নয়, আফ্রিকার। এ জাতের রক্তবিন্দুতে মরুভূমির ধূলি কণা প্রবেশ করেছে, এদেশের আবহাওয়াতে মিশেছে সাহারার আঁধি, মেজাজে এসেছে সূর্যের তেজ। ধাত পিত্তপ্রধান নয়, বায়ুপ্রধান। নিষ্ঠুর আত্মম্ভরী, এদের ভালবাসায় নিষ্ঠুরতার খাদ থাকে, এদের গাম্ভীর্যে রয়েছে একবোখামি। প্রত্যেক স্প্যানিয়ার্ড, ক্যাসটিলিয়ান একদম একাকী, ডন কুইকসটের মতন। আমরা হাসি তার সম্পর্কহীন, নিঃসংশ্রব স্বাতন্ত্র্য দেখে, কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডের কাছে ডন একজন অতিমানব, মহাত্মা, প্রতিভূ। লোকে হাসে হাস্যকগে, রমলা দেবী যেমন না বুঝে ঠাট্টা করেছিলেন। না বুঝে কি ? বোধ হয় বুঝেছিলেন, তবু আত্মগোপনের প্রচেষ্টা, কেন ? মেয়ে মানুষ বলে ? মেয়েরা

বড়ই গতানুগতিক, রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ; তাই ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারেন না। লোকেরা হাসুকগে, মেয়েরা যত পারেন আপত্তি করুন, কিন্তু ডন কুইক-সটের জন্যই স্পেন এখনও টি'কে আছে, বর্তমান স্পেনে অন্য কোন মহাত্মা নেই, এই কাল্পনিক বীরেরই পূজা এখন চলছে। একটু খ্যাপামী ভাল। মুকুন্দ যেন স্যাঙ্কো পাঞ্জা! কিন্তু ··স্পেনের মেয়েদের কালো চোখ, কালো ভুরু, দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে, দেহের গঠন পুরুষ্টু, বেশী বাঁকা, অথচ যেন মিলিটারী মেয়ে, নির্লজ্জ।···মোটে সাড়ে তিনটে···ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি যথাসময়ে—যায় মন্থরগতিতে—ডন কুইকসটের ঘোড়ার মতন, সাঙ্কো পাঞ্জার মতন। ডন রোগা ছিলেন, তিনি হাঁটতেন কেমন? অত আস্তে চলা পোষায় না···নতুন ঘড়ি কিনতে হবে। মুকুন্দকে নিয়ে যেতেই হবে—চিন্তামণিকে নিয়ে যাওয়াও যায় না—রমলা দেবীর চাকর—বনবে না। কিন্তু মুকুন্দ সত্যি গায়ে পড়া। ওর কাছে কোথায় খেয়েছি, কেন খাইনি কৈফিয়ত দিতে হবে! ছাই দিতে হবে! যা হুকুম করব তাই করতে হবে, আব্দারে হয়ে উঠেছেন, ভাবছেন, মা আর নেই, বাড়ীর গিন্নী হয়েছেন, পঁচিশ টাকার বামুন এনেছেন! ঠাকুরটা ফাজিল।

'বাবু, দই এনেছি, একটু সেণ্ট দিতে পারেন।'

খগেনবাবু উঠে কাঁচের আলমারি থেকে ফলের নির্যাস ও চা-এর ভাল বাসন বার করলেন। 'শরবত আনলে নিজেরাই গন্ধ দিয়ে নেবো'-খন। এখন যাও, মুকুন্দ আসে নি?'

'আজ্ঞে না, আসতে একটু দেরী হবেই।'

এতক্ষণেও চারটে বাজেনি! ততক্ষণ বই ঘাঁটা যাক।

গলির মোড়ে মোটরের হর্ণ বাজল। খগেনবাবু নিচে গেলেন। এই হর্ণ শুনে নামতে গিয়ে একদিন সাবিত্রী হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই গিয়েছিল, গোপিকা, কৃষ্ণের বাঁশী, লেসবীয়ান লভ···কত কি মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন। গাড়ি এসে গলির সামনে থামল। সামনে চিন্তামণি! খগেনবাবুই দরজা খুলে দিলেন। রমলা দেবী হাসিমুখে বল্লেন, 'আগেই এলাম, এ বাড়ীতে আমি—'

'তা আর কি করা যায় বলুন···মানুষে।'

রমলা দেবী ওপরে এলেন, ওঠবার সময় পায়ের গোড়ালির ওপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, খগেনবাবু চোখ ফিরিয়ে ঠাকুরকে ইসারা করলেন জল চড়াতে—দেখতে পেলেন চিন্তামণি তোয়ালে ঢাকা বড় একটা কাচের পাত্র নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকছে।

'এই নিন কুসানটা।'

'দুপুরে ঘুমুলেন?'

'না।

ঘরে দু'জন, না তিনজন? দু'জন যখন বাক্যালাপ করে তখন অনুপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণ হয়ে ওঠে। কেবল মৌখিক ভাষারই নয়, অব্যক্ত সম্বন্ধের গোপন রীতিও সেই অনস্তিত্বের দ্বারা নিরূপিত হয়। খগেনবাবু ও রমলা দেবীর মধ্যে বাক্যহীন ব্যবধান জীবন্ত স্মৃতির দ্বারা ভরে গেল। খগেনবাবুর অস্বস্তি হচ্ছিল, রমলা দেবী নীরবে বসে রইলেন।

'সুজনবাবু এলেন না?'

'না।

'কাজ আছে নিশ্চয়?'

'দেখা হয়নি, আসেনি।'

'এখানে কতবার এসেছেন…'

রমলা দেবী চোখ উঁচু করলেন, তাঁর দৃষ্টি খগেনবাবুর চোখ পর্যন্ত উঠল না।

'বসতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'মোটেই না।'

'চা দিতে বলি?

'থাক।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'ঘর পরিষ্কার হয়নি?'

'মুকুন্দ নিশ্চয়ই করেছে, খুব কাজ করছে, ওকে নিয়ে যেতেই হবে।'

'কবে যাওয়া ঠিক করলেন?'

'এখনও ঠিক করিনি, কবে যাই বলুন দেখি?

'যেদিন আপনার সুবিধে হয়।

'রোজই সুবিধে

'দিনক্ষণ মানেন না বুঝি?

'পাঁজি পুঁথি মানি না, তবে মনকে যাবার জন্য তৈরী, উন্মুখ করতে হয় এখনও: ভীষণ কুঁড়ে আমি।'

'আপনি ত তৈরী।'

'হ্যাঁ অনেকটা, তবে কাশীতে গিয়ে মাসীমাকে বিরক্ত করতে মন চাচ্ছে না, কাশীতে বড় ভিড়।'

'দ্বীপ আর কোথায় পাচ্ছেন ?'

'সেখানেও ফ্রাইডে জুটবে।'

'জুটিয়ে নিজেই নিয়ে যাচ্ছেন।'

'নিজেরই দরকারে। সুজন এলেন না কেন ?'

'বল্লুম ত দেখা হয়নি। চিন্তামণিকে আনতে পাঠাব ? একটা চিঠি লিখে দিন।'

'ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে চিঠি দেওয়া কিংবা নিজে যাওয়াই উচিত ছিল, ঠিকানা জানি না, আপনার হাতে দিলে অবশ্য হত।

'অন্যায় হয় নি।'

'হাসলেন কেন ?

'কই, হাসিনি ত ?'

'তা হলে ঠাট্টা করলেন।

'কি ঠাট্টা ?'

'আপনি বোধ হয় ভাবছেন, আমি একলা থাকতে পারি না, অতএব সামাজিক, ভদ্রতা জানি না, অতএব অ-সামাজিক। তা হলে একলা থাকার চেষ্টা বৃথা নয় ?'

'ওসব কথা মনেও ওঠে নি।'

'মনে ওঠেনি, কিন্তু নিচের স্তরে রয়েছে।'

'আপনি বড় বেশী তলিয়ে দেখেন।'

প্রবাহ অন্তঃশীলা, ওপরে বুদ্‌বুদ্‌, তারই নাম ভাষা, হাসি, চাউনি।'

'ওপরে বালি।'

'তাও হয়, যেমন ফল্গু নদী।'

'কিন্তু আমি অত গভীর নই।'

'সে আমি বুঝি।'

'বুঝুন, কিন্তু ভুল বুঝবেন না।'

তাতেই যদি সন্তোষ পাই তাই বুঝব।'

'বেশ।'

'তবু আপনি 'বেশ' বল্লেন, সাবিত্রী তর্ক চালাত।'

বমলা দেবী খগেনবাবুর দিকে চাইতে তিনি কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, 'সন্তোষ পাওয়া নিয়ে কথা।'

সাধনায় সন্তোষ আছে ?'

'আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

'সাধনা মানে কি?'

'অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক করার নামই সাধনা। আজকের সাধনা, কালকের অভ্যাস।'

'কি জানি! কষ্টটুকু থেকেই যায়।'

'সংহত অবস্থা কি কৃত্রিম অবস্থা?'

'জানি না।'

'বলুন না! আমি জানি আপনি জানেন, তবু কেন বলেন না? বলুন।'

'অভ্যাস হয়ে গেলে সহজ, না হওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম। কিন্তু রাস্তার শেষ নেই যে।'

'আপনি কি ভাবেন যে আমাদের সকলের কেবল চলতেই হবে, কোথাও কখনও নিঃশ্বাস ফেলবার বিশ্রামের স্থান নেই?'

'তাই মনে হয়, বিশ্রামের লোভে ও শ্রান্তিতে মন ফাঁকি দিতে শেখে, আপনি বিদ্বান, আপনি বলুন না।'

'অনুরোধ করছি অপমান করবেন না। এখানে বিদ্যে থই পায় না। বিদ্যার অতিরিক্ত কিছু আছে কিনা তাও জানি না। শুনেছি মেয়েদের বোধি আছে এবং সেটা বুদ্ধির ওপর। আমি তারই সন্ধানী—সন্দেহ করি যে আপনার মধ্যে বোধির সন্ধান পাব। অনুগ্রহ ক'রে অসঙ্কোচে মনের ভাব ব্যক্ত করুন। অত লজ্জা কিসের? মেয়েরা গম্ভীর কথাবার্তা কইতে পারে না, কিংবা তাদের কওয়া উচিত নয় এ ধারণা প্রচার করতে ব্যগ্র কেন? আপনি বলুন, কখনও, কোথাও কি শান্তি নেই, চলতেই হবে আমাদের?'

'সকলের বেলা কি হয় জানি না।'

'বেশ মেয়েদের বেলায় কি হয় বলুন।'

'মেয়েদের? ভাগ্য তাদের হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তাই পট পরিবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে, কাল যে ছিল কিশোরী আজ সে হল নববধূ, কালকের নববধূ আজকের মা। তারপর বিধবা, পিতামহী, অনাবশ্যক, জঞ্জাল। আমরাই সত্যকারের বায়স্কোপ দেখি, আমাদের সংস্কার সাজান নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে মালা গাঁথার সময় আমাদের নেই, সুবিধে নেই। আমাদের স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতি করেন অনেকে, কিন্তু আমাদের স্মৃতি শক্তি নেই, তাই আমাদের আক্ষেপ নেই।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'আছে, তবে অন্য ধরণের।'

'কি রকম ?'

'বিধাতা চুলের মুঠি ধরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি থামলেন, ক্লান্তিতে, আমরা তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁরই জন্য জল এনে দিলাম, তাঁকে বীজন করতে লাগলাম, তাইতেই কত সুখ, ভাবলাম এই ত সুখের জীবন—কিন্তু আবার টান সুরু হল।'

'বিধাতা টানছেন ?'

'ভাগ্য-বিধাতা।'

'কে ?'

রমলা দেবী চোখ নামিয়ে নিলেন। যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি, সমগ্র বিশ্বের দুঃখ তাঁর সকল অঙ্গে ছায়াপাত করেছে। Saint Gaudens-এর সেই ছবি !

'ভাগ্য-বিধাতা মানুষের তৈরী। না তৈরী করলেই হল।'

'তৈরী করতেই হয় !'

'কেন ? কি প্রয়োজন আছে ? এতটা না ভাবলেই চলে।'

'আপনার মুখে না ভাবার উপদেশ শোভা পায় না।'

'সব সময় একই মত প্রকাশ করবার বাধ্যবাধকতা মানি না ; যা মনে হচ্ছে তাই বলছি। আমার মনে হয়, আপনারা বিধানকেও মূর্তিমান করতে চান, তাই ভাগ্য-বিধাতার প্রয়োজন আপনাদের। মানুষ না হলে চলে না আপনাদের, তাই বিধাতাও মানুষ হয়ে কাজ করেন।'

'তাই হবে !'

'আমি নিয়ম মানতে প্রস্তুত, নিয়ম-কর্তা মানতে প্রস্তুত নই।'

'আমি নিয়ম জানি না, নিয়তির উপলক্ষ্যকে চিনতে পারি।'

'তা হলে একলা থাকেন কেন ?' প্রশ্ন করেই খগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরিয়ে উত্তরের প্রতিক্ষায় আবার বসলেন। রমলা দেবীর ঠোট কাঁপছে দেখে বল্লেন, 'থাক, বলবেন না।

'সময় হলে বলব।'

'সময় যদি না আসে ?'

'এলে বলব।'

'একলা থাকা কষ্টকর, অসাধ্য ?'

'হাঁ, আপনার পক্ষে।'

'একবার নিজেকে সন্ধান করবার সুবিধা দিন। আমি চেষ্টা করি—অনুমতি দিন—কাশী যাই ?'

'যান।'

দু জনেই নীরব রইলেন, চমক ভাঙল সদর-দরজা খোলবার আওয়াজে, নিশ্চয় মুকুন্দ, 'মুকুন্দ।

'বাবু যাই।' মুকুন্দ ঘরে এল খাবার চুবড়ী হাতে নিয়ে।

'আশ্চর্য।

'গরম গরম ভাজিয়ে নিয়ে এলাম, বড ভিড তাই দেরী হল।

'যাও, ঠাকুরকে চা ও খাবার আনতে বল।' ঠাকুর পিরিচের ওপর দু গেলাস ঘোলের শরবত নিয়ে এল। রমলা দেবী একটি গেলাস নিলেন, খগেনবাবু নিলেন না।

'একটু পরে —আধঘণ্টা পরে চা নিয়ে এস ত ঠাকুর।' ঠাকুর চলে গেল।—

'এখনি চা আনতে বলব ?

'না, চা না খেলে নয় ?

'আমি খাব, সঙ্গ দেবেন।' একটা কথা মনে উঠছে।

রমলা দেবী চাইলেন।

'সাবিত্রীর মৃত্যুতে আপনি বড একলা হলেন বলে আমার দুঃখ হচ্ছে, সান্ত্বনা এই যে আপনার অভ্যাস আছে।

'আপনার অভ্যাস আছে ?

'মনে মনে অভ্যাস আছে, মনে বরাবরই একলা।

'মনে মনে নয়, প্রাণে ?

'জানি না।

'আমরা কেউই বোধ হয় জানি না।

'তবে জানতেই হবে।'

'আপনার গলা শুখিয়ে আসছে, চা দিতে বলি ?

'বলুন।

রমলা দেবী বারাণ্ডা থেকে চা দিতে বল্লেন। চিন্তামণি চা-এর কেৎলী ও খাবার নিয়ে এল। পেয়ালা ও পিরিচ সাজিয়ে রমলা দেবী চ ঢাললেন, খাবার রাখলেন। খগেনবাবু স্যাণ্ডউইচ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ আবার আনলেন কেন ? বাড়ীর ?

'ছিল নষ্ট হয়ে যেত।

'ভালই করেছেন। বিসকিট নিন, সিঙ্গাড়া খাবেন না ?

'একখ না নিয়েছি, আর নেবো না, চা ঢালি ?'

'একটু পরে, ফিকে চা ভাল লাগে না। সুজন এলে ভাল হত'

'কেন ?'

'সুজনকে আমাব ভাল লেগেছে।'

'মনে মনে একলা কি রকম ?'

'যারই মন আছে সেই একাকী, ভিড়ের কোন মন নেই।'

'সাধারণের সঙ্গে মেলা মেশা যে না করেছে তাব মন কোথায় ? মন নিয়ে জন্মায় কেউ ? ভিড়ের মন হয়ত নেই, কিন্তু ভীষণ শক্তি আছে, একবাব বিপক্ষাচরণ করলেই হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়।'

'সাধারণ আমাব অভিব্যক্তিব উপকরণ মাত্র।'

'উপকবণের চেয়েও বেশী, সেই প্রভু, আমবা দাস।'

'তা হলে সমাজ শাসন মেনে চলেন না কেন ?'

'যতদিন ও যতদূর পেরেছি মেনেছি ; তারপর··'

'কি ?'

'তাবপব · সেটা মানাই নয় ; বাধ্য কবে মানান, স্বেচ্ছায় নয়, ইচ্ছাব বিপক্ষেও নয়। জলের মধ্যে মাছের মতন···আমি বলতে পারছি না।'

'বলতে চাইছেন না, না বলতে পারছেন না ?'

'আপনি ত জানেন।'

'কিছুই জানি না।'

'জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর থাকে, উত্তর দিতে পারি, দেব।'

'আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য আছে।'

'হুঁ।'

'তিনি কোথায় ?'

'জানি না।'

'একটা কথা না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পারছি না, বড়ই অভদ্রতা কিন্তু·

'না আমি কিছু মনে কববো না।'

'মনোমালিন্য ঘুচবে না ?

'না।'

'তাহলে, আর তাঁর কৃপায়···?'

'তাঁব পয়সায় ? তাঁব পয়সায় নয় !'

'কার ?'

'আমার বিধবা মা তাঁর সম্পত্তি থুইয়ে আমার সদগতি করেন, অতএব সেই অর্থের ফলভোগে আমার অধিকার আছে।'

'ফলভোগই বটে! কিন্তু...'

'এর মধ্যে কিন্তু নেই।'

'প্রায় সব বড়লোকেরই সার্থকতার মুলে আছে অন্যের সম্পত্তি।'

'অতএব সেটা ন্যায়! অন্যায় পুরাতন হলে ন্যায়ে পরিণত হয় কি ?'

'সহনীয় হয়।'

'পাত্রভেদে।'

'বাঙ্গালী মেয়েদের সহ্যগুণ অসীম, আমাদের মা মাসীদের দেখলেই বোঝা যায়।'

'সেই মা-ই সহ্য করতে পাবেন নি।'

'আপনার মা ?'

'আমার মা মৃত্যুশয্যায় বলেন, 'তোকে বিক্রী করেছি মা।' মার মুখে ক্ষমা-প্রার্থনার অনুচ্চারিত কাতরতা ফুটে উঠেছিল মনে পড়ে।'

'ওঃ, অথচ মেয়েদেব অতীত নেই!'

'এতদিন ছিল না।'

'মনে করিয়ে দিলাম সে জন্য দুঃখিত। কিন্তু স্বাধীন হবার অমন সুবিধা ক'জনে পায় ?'

'সুবিধা কোথায় ?

'আপনার অর্থের অভাব ছিল না, আর কাউকে মানুষ করবার দায়িত্ব ছিল না. ছেলেপুলে থাকলে কি হত বলা যায় না, হয়নি তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন ও পেরেছেন।

'বেঁচে থাকলেও আমি যা হোক ক'রে নিজে মানুষ করতাম।'

'আপনার বুঝি ?

'হয়েছিল।'

'ছেলে ?'

'হুঁ।'

'অল্প বয়সেই বুঝি মারা যায় ?'

'হুঁ।'

'কি অসুখ ?'

'অযত্ন।'

'আপনার কাছে অযত্ন?'

'পরের ছেলে।'

'আর হয়নি?'

রমলা দেবীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, চিবুকের মাংসপেশী দৃঢ় হল, দৃষ্টি স্থির, শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ, খগেনবাবু তাঁর এই মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'না আমি আর জানতে চাই না।'

'তাঁর বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার কর্তব্য পালন করতাম যদি না···'

'বলবেন না বুঝেছি···'

'সহজেই বোঝেন দেখছি···অথচ সাবিত্রীকে বোঝেন নি···কি অদ্ভুত প্রকৃতির আপনারা!'

'বুঝেছি।'

'বোঝেন নি! কর্তব্য পালনের অনুরোধ নয়, হুকুম, জুলুম···তার ওপর, কি নির্মল বংশ! সকালে খোকা মারা গেল, সন্ধ্যায় পাশের বাড়ি চলে যাই। কনট্র্যাকটর গিন্নি বললেন, 'দিদি কাঁদ, কাঁদলে দুঃখ যাবে'···অথচ, অথচ, তারই হাতে খোকা হয়! চলে আসছি, এমন সময় লণ্ঠন হাতে নিজে হাজির ·· ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আর কনট্র্যাকটারের গিন্নী—তাঁদের ইচ্ছা কখনও পৃথক হতে পারে! যখন দুজনেই আবার নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু! প্রশ্ন উঠল, 'সম্পত্তি ভোগ করবে কে?' উত্তর দিলাম 'কার সম্পত্তি কে ভোগ কববে? যে ভোগ করবার আশায় জন্মাবে সে বাঁচবে না—কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাও উচিত নয়, অন্যের স্পর্শে সে সম্পত্তি বিষাক্ত হয়েছে, বাবার মুখের রক্ত ওঠা টাকা···অন্যে ভোগ ক'রে সে টাকা অচল হয়েছে' ···কিন্তু সমাজ আমার বিপক্ষে···যাক সে সব কথা···অতীত নেই···সেই থেকে আমি এখানে·· একলা···কি ভীষণ দুর্যোগ ছিল সেই রাতে, পাড়া গাঁয়ের অন্ধকার রাতে অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছে···সেই রাতটা আমার পক্ষে বিভীষিকা ···কোথায় ছিলাম মনে নেই···আমার কিছুই মনে নেই, মনে থাকেও না···'

অনেকক্ষণ পরে খগেনবাবু ধীরে ধীরে বল্লেন, 'আমি জানতাম না, তাই ভুল বুঝেছি।'

রমলা দেবী হাসলেন, মুখের কাঠিন্য লোপ পেল, সহজভাবেই বল্লেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি ভুল বুঝি-নি।'

'না জেনে যদি ভুল বুঝেই থাকেন, তাতে অন্যায় কি ?'

'আপনার একলা থাকার ইচ্ছার কারণ হল এই, যতটা সহানুভূতি আপনি সাবিত্রীর কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন ততটা সে দিতে পারে নি···অতএব ভাবছেন—'

'কি ভাবছি ?'

'এইবার নিজে বলুন।'

'বলতে পারি পাদপূরণ হিসাবে—অতএব আমি ভাবছি কোথাও সহানুভূতি পাওয়া যায় না, অতএব দরকার নেই, অতএব আমি একলাই থাকব। কচি ছেলের আব্দার বলছেন ত ?'

'একটু তাই বটে।'

'সাবিত্রী আমাকে তাই ক'রে ফেলেছিল, আমাকে পুরুষ করতে পাবেনি।'

'আপনি তাকে কি করেছিলেন ?'

'আমি তাকে সব করতে চেয়েছিলাম।'

'কেবল দাবীই করেছিলেন।'

'দাবীর জোরেই দাবী সত্য হয়।'

'হয় না, হয় না, হয় না। কার ওপর দাবী করেছেন দেখবেন না ? এ কী অত্যাচার ! সাবিত্রী কোন স্তরে ছিল দেখলেন না, সে দাবী পূরণ করতে পারবে কিনা বুঝলেন না, তবু বলছেন আপনি তাকে সব করতে চেয়েছিলেন ! আপনি সাবিত্রীকে মানুষ হিসেবেই দেখেননি, দেখেছেন আপনার সুখবৃদ্ধির উপায় হিসেবে।'

'ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন ! অত পুরুষ-বিদ্বেষ আপনার মত স্নেহশীলা মহিলার উপযুক্ত নয়।'

'ইচ্ছে ক'রে দিইনি। সম্পত্তির লোভ আর সুখের লোভ সমশ্রেণীর, অতএব সব পুরুষই সমগোত্রের। তবে আপনার স্বকীয়তা আছে বলেই বাইরের কোন বস্তু আপনার চোখে পড়ে না—আর অন্যের ও সব বালাই নেই—তারা কেবল স্বার্থপর, সমাজ-বিধিকে কাজে লাগায়।'

'কি ভাবে মানুষকে একান্ত ক'রে দেখা যায় ?'

'একলা থেকে নয় এইটুকু জানি, তার বেশী নয়। নিজেই ভেবে দেখুন না।'

'এখানে ভাবতে পারছি না।'

'কাশী যান দিন কয়েকের জন্য।'

'যদি সেখানে পথ না পাই ?'

'তখন উপায় আছে কোলকাতা ফিরে আসবেন, ভাবনা ছেড়ে দেবেন, কেবল মানুষ হবেন, অন্য সাধারণের মতন নয়, সেটা চেষ্টা করলেও হতে পারবেন না, তবে সকলে যেমন···'

'সকলে যেমন কি করে ?'

'জানি না। জীবন ধারণ করে।'

'জীবন-ধারণ জীবেরই শোভা পায়, মানুষ জীবের অতিরিক্ত। আগে ভেবে দেখব, কোন কূলকিনারা না পাই, তখনও ভাবব—তবে সে ভাবনা হবে felt thoughts—গুণের তফাত অনেক, অন্তধরণেরই বোধ হয়। চিন্তার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।'

'চিন্তার ওপর আমার অগাধ অবিশ্বাস। অভিজ্ঞতার বদলে, জীবনের পরিবর্তে চিন্তা করা হল সমগ্রতার বদলে অংশকে গ্রহণ করা। এ ভুল করতে আর পারব না—আমার সব কিছু যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।'

'স্ত্রীলোক বলে, কিংবা চিন্তা করেননি বলে।'

'তাই হবে· কই চাবি দিন, ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে দিই।'

খগেনবাবু রমলা দেবীকে চাবির গোছা দিলেন। আস্তে আস্তে রমলা দেবী পাশের ঘরে উঠে গেলেন। চিন্তামণি চায়ের বাসন নিয়ে গেল—সামনের বাড়ীর বানে বৌ তখন ছাদে উঠেছেন·· পাশের ঘরে ঠুং ঠুং চুড়ির আওয়াজ হল, খগেনবাবু পাউইসের পাতা ওলটাচ্ছেন · ভাল লাগল না—কেবল বহু· ·মনের যথার্থ পরিচয় বই এর পৃষ্ঠায় ফোটে না। ফোটে মুখোমুখি· ওঁর জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে·· তার জীবন বিচিত্র নয়· বেচারি· এক একটা মেয়েকে দেখলে মনে হয় ভারি শক্ত, ভেতর তাদের ফোঁপরা, দম্ভের জোরে দাঁড়িয়ে থাকে·· বেচারিরা·· বাইরেটা কত কঠিন, কত উগ্র, কত ঝাঁজ. ফোঁস ফোঁস করছে, সাপ যখন চলে যায় তখন শব্দ নেই, ফণা ধরলেই ফোঁস, ফণা ধরে আত্মরক্ষায়, কিংবা কোমরে লাঠি পড়লে·· তখন কি ভীষণ শব্দ! কিসের শব্দ···পাশের ঘরে· · খগেনবাবু পা টিপে দরজার পাশে দাঁড়ালেন· রমলা দেবী ট্রাঙ্কের ওপর মাথা রেখে বসে আছেন·· আস্তে আস্তে ফিরে এলেন, । 'হ্যালা, মা কি আর স্বামীর ঘর করবে না ?' ·'কে জানে ভাই, মেয়ের ঢং দেখে বাঁচি না'···মক্ষিরাণী কেঁদেছিল···মেয়েরা কেন কাঁদে ? বেচারীরা···বেটাছেলেরা কাঁদে না। খগেনবাবু পাইপে তামাক ভরে বারাণ্ডায় এলেন। নিচে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় চিন্তামণি,

ভেতরে যেতে দেয়নি মুকুন্দ,—ভারি হিংসুটে···বোঝো না ··মানুষের মন কত বিচিত্র···তাই ভুল বোঝাবুঝি। নিচের কলতলায় মুখ হাত পা ধুয়ে খগেনবাবু ওপরে এলেন, ঘরে আলো জ্বলছে···রমলা দেবী মাটিতে পিছন ফিরে বসে আপন মনে ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছেন···লক্ষ্মীটি··· !

'ভাবছি কাশী যাব না।'

'না, যান।'

'চিঠি যদি লিখি ?'

'উত্তর দেবো, তবে অভ্যাস নেই।'

'যদি ইচ্ছে হয় দেবেন।'

রমলা দেবী চলে যাবার পর খগেনবাবু মুকন্দকে ডেকে বল্লেন, 'আজ আমার খাবার করতে হবে না, যা আছে তাই ঠাকুরকে একটা থালায় নিয়ে আসতে বল।' ঠাকুর খাবার রেখে চলে গেল।

মুকন্দ বল্লে, 'বাবু এত খাবার নষ্ট হল, হোটেল থেকে রুটি দিয়ে গেল, কি করব ?'

'নিজেরা খেও, না হয় সকালে মেথরানীকে দিও !'

সাবিত্রী তাই দিত, রমলা দেবীও বল্লেন, 'স্যাণ্ডউইচ নষ্ট হত।' অপ্রয়োজনীয়কে ভদ্রভাবে বহিষ্কৃত করার নামই মেয়েদের সুচারুরূপে সংসার চালান, আর পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু ততটুকুই ভদ্রতার পরিসর। চিন্তা মেয়েদের পক্ষে অতিরিক্ত, তাই চিন্তার প্রতি অত তাঁদের অশ্রদ্ধা। রমলা দেবীর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় না যে তিনি চিন্তা করেন না! সাবিত্রী ভাবতই না, কাজ করতে পারত। কাজ ভালই করত, অন্তত বাক্স গুছোত ভাল। রমলা দেবী নিশ্চয়ই আরো ভাল করে গুছিয়েছেন। কাশী যেতে বল্লেন আজ, অথচ কাল যেন মনে হল এইখানেই থাকি ইচ্ছেটা। মনের কথা বোঝা যায় না। খগেনবাবু টেবল-ল্যাম্পের টেবলটা টেনে সোফার কাছে আনলেন। পাইপ নিভে গিয়েছিল. ছুরি দিয়ে সাফ করে ফুঁ দিলেন, শীষ দেওয়ার মতন আওয়াজ হল, নতুন তামাক ভরলেন, তামাক শুকিয়ে গেছে, এক টুকরো আলু টিনে রাখলে হত, শীতকাল ভিন্ন পাইপ চলে না! পাইপ রেখে গ্যাসেটের পাতা ওলটাতে লাগলেন···মামুলি কথা···স্বভাব হল সেই বস্তু যেটি আপনা থেকে পাওয়া গিয়েছে, স্বোপার্জিত নয়। কিন্তু মানুষের মতন মানুষ অন্যের দান গ্রহণ করে না, সে সৃষ্টি করে, নিজের

কর্তব্য নিজে নির্ধারিত করে, সেই অনুসারে জীবনধারণ করে, তাই হয়ে ওঠে স্বভাবের চরিত্রের ছক। অতএব কালস্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতেই হবে; স্রোত জনসাধারণের, যারা ভিক্ষার ধনে জীবন চালায়। নিজের রোজগারেই বড়লোক! রমলা দেবীর সম্পত্তি তাঁর নিজের, 'তাঁর মধ্যে কিন্তু নেই,' সাবিত্রীর সম্পত্তি তার স্বামীর। এই কি স্বাভাবিক? এই স্বাভাবিকতা হল আদিমতা; আদিম যুগে জঙ্গল ছিল, এখনও সেই জঙ্গল সভ্যতাকে গ্রাস করবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়েআসছে, অষ্ট্রেলিয়ার 'বুশ' এর মত। জনসাধারণ সেই অষ্ট্রেলিয়ান বড় বড় কাঁটাগাছের ঝোপ। খগেনবাবু একবার তেরাই-এর জঙ্গলে গিয়েছিলেন, গাছ লতা পাতা গুল্মের নৃশংস আত্মপ্রসার দেখে তাঁর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটি গাছ একলা নেই, তাকে জড়িয়ে পিশে মারছে পঞ্চাশটা আগাছা, তলায় শেওলা পচা পাতা, গায়ে লতাগুল্ম, সব ভিজে, যত ভিজে, তত নতুন জীবন। কিন্তু আগাছাব মাথার ফুল, সাবিত্রী ছিল সেই বুনো অর্কিডের ফুল, রমলা দেবী কাঁটা গাছের ফুল। ক্যাকটাসেরও ফুল হয়···এইবার মনে হয়েছে, সাবিত্রী এক দিন রমলা দেবীর যে শাড়িটা পরে এসেছিল তাব রং ছিল সৌখিন ক্যাকটাস ফুলের মতন টকটকে লাল। রমলা দেবীর মনে অনেক কাঁটা, মনে না গায়ে? ভেতরের কাঁটা, না বনের কাঁটা বিঁধেছে! নিজে টেনে খুলে ফেলেন নি, ব্যথারও বিলাস আছে, তিনি ব্যথাটা পোষণ করেই এসেছেন, মেয়েরা যেমন বেড়াল পোষে! খগেনবাবু পাইপ মুখে নিলেন·· নিশ্চয়ই তাই। অনেক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা লোকে না বুঝে দুর্নাম করে বোধ হয়, দুর্নাম তিনি শোনেননি অবশ্য। কিন্তু সুনাম যদি কারুর প্রাপ্য হয়ত রমলা দেবীর; খাঁটি বিলিতী মেয়ে, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, বিদ্যাসাগরের মত ভুল ক'রে এদেশে জন্মেছে। একলা থাকে বেশ করে। কিন্তু কতদিন থাকবেন? নিজেই বল্লেন একলা থাকা কষ্টকর, স্বাভাবিক হওয়াই ভাল। তবুও রয়েছেন এতদিন এই যথেষ্ট! ওঃ সেইজন্যই ভাল লাগত না, স্বভাবের সঙ্গে যে লড়াই করে তাকে ভাল লাগতে পারে না, যেমন বিশ্রী লাগে কিশোর কিশোরীকে যখন তারা শৈশবাবস্থার পিরাণ ফ্রক ছাড়িয়ে যায়। ক্লাসে এক একটা ছেলে থাকে যার প্রত্যেক ব্যবহার সহজ, এমন কি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া পর্যন্ত, তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, বেশ মিষ্ট স্বভাব, সকলকেই আকর্ষণ করে। সুজনের মত? সহজ শক্তি কিন্তু সহজেই নিঃশেষিত হয়। আর এক একটা ছেলে থাকে যার ব্যবহারে কোন সামঞ্জস্য নেই, একবার হল ফার্ষ্ট, পরের বার ফেল, যার প্রকৃতি অশান্ত, বুনো, বেশীরভাগ

লোকে তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু জনকয়েকের কাছে সে অতিশয় প্রিয়। এই ধরণের ছেলেও খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু শক্তিহ্রাসের জন্য নয়, শক্তির অপব্যবহারে, অনুকূল প্রতিবেশের অভাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেরাই দ্বিজ, প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা একবারই জন্মায়, বোধ হয় একঘায়েই মরে! কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটি ভুল। লড়াই যখন চলছে তখনকার অবস্থা বিশ্রী, জয়ের গৌরবেই মানুষের শ্রী ফুটে ওঠে। সে অনেক পরে—ইতিমধ্যে This arid, barren, dry, dull, dreary cactus land, Waste Land · মনে নেই Good night, good night, good night. মেয়েদের স্মৃতি নেই—ঠিক বলেছে রমলা, প্রকৃতির আবার স্মৃতি কি? স্মৃতি থাকে যদি ভাব থাকে, প্রকৃতির আবার emotion কি? রমলা দেবীর প্রাণে ব্যথা আছে—না হলে কাঁদছিল কেন? বেচারী—প্রকৃতির কিন্তু ইতিহাস আছে, রমলারও আছে, নচেৎ কি ভুলতে চায়? কিন্তু রমলা দেবীকে মেয়েমানুষ ভাবতে পারা যায় না, পায়ের গোছ· শ্বেত-পাথরে কোঁদা হাতীর শুঁড়। রমলা দেবীকে স্মরণ করলে কোন কুভাবই মনে আসে না--কুভাব আবার কি? তবে কু-স্থ একটা আছে। বন্ধুত্বের মধ্যে কু-স্থ নেই, তার মধ্যে আছে নিয়তির লীলা। নিয়তি কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। বল্লে, নিয়তি মেয়েদের হিড়হিড় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে —হতে পারে না। নিয়তি আর স্মৃতি জন্মশত্রু, স্মৃতির ওপরই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, নিয়তি দুর্নিবার তাকে জয় করতে হয় জ্ঞান দিয়ে। জ্ঞান আর স্মৃতি বিরোধী শক্তি। ও চিন্তায় বিশ্বাস করে না। বাঁচবে কেবল স্মৃতি নিয়ে! প্রকৃতি চিন্তা করে না, কেবল সে বাঁচে, চিন্তা করে পুরুষ। রমলা হয়ত বলবে, পুরুষকারের দ্বারাই নিয়তিকে বশ করা যায়, চিন্তার দ্বারা যায় না। কিন্তু পুরুষকার পুরুষের ধর্ম, ব্যক্তির ধর্ম পুরুষকারের তাৎপর্য জ্ঞান, চিন্তা দিয়ে প্রতিবেশকে অতিক্রম করা। মেয়েরা চিন্তা করতে জানে না, তারা চিন্তার বিষয়।

সাংখ্যটা পড়তে হবে, কালই কেনা চাই, কার সংস্করণ ভাল? দোকানের ছোট-বাবু বলে দেবেন ইংরেজীতে পড়া হবে না, বরঞ্চ বাংলায় পড়লে মূল রসের খানিকটা পাওয়া যায়। এমন হয়েছে যে ইংরেজী ভাষাতেই যেন বেশী বোঝা যায়। বাস্তবিক তা যায় না। চেষ্টা করে পড়তে হবে। পুরুষকার অর্থে ইচ্ছাশক্তি নয়। কর্মীরাই কি এ সংসারের একমাত্র পুরুষ? মেয়েরা ও মেয়েলী পুরুষে তাই মনে করে, তাই নভেলে কর্ম অর্থাৎ গল্প চান। কর্ম করা মানেই নিয়তিকে স্বীকার করা, নিয়তি আছে বলেই না কর্ম! তা ছাড়া, সভ্যজগতে

শ্রমবিভাগের জন্য কর্মের অবসর নেই, ভূগোলে নতুন জগত নেই যে জয় করবে, গৌরীশৃঙ্গ চড়া যায় না, সমুদ্রের তলা থেকে সোনার তাল উদ্ধার করাও যায় না—যন্ত্রে কাজ করে দিচ্ছে। নিরীহ ব্যক্তির পক্ষে নতুন জগত হল চিন্তাক্ষেত্র। এই গরমে কাজ করাও অসম্ভব। ছোটখাট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটুকু কর্মের প্রয়োজন ততটুকু কর্ম করতেই হবে—কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্দেশ্য হল নিষ্কাম চিন্তা। আইনষ্টাইনের সঙ্গে কর্মের কি সম্বন্ধ? চিন্তাই চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র বিচারদণ্ড। জীবনটা ডিটেকটিভের গল্প নয় যে আদর্শ-উদ্দেশ্যকে প্রকৃত আসামীর মতন খুঁজে বার করতেই হবে। কর্মীরা সব দাম্ভিক, অতএব তাদের কার্যাবলীও নাটকীয়। সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, তবে হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে, তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি, খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেসে যায়, ঘটনাটি তেমন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথায় ঢেউ, কোথাও বা আবর্ত, এই ত জীবন! মোহানা কোথায়? এরই প্রতিচ্ছবি—না প্রতিচ্ছবি ঠিক না, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিষ্টের কাজ—অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ। কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলছে—কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে? তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভ হয়, বড় বড় গাছ সেই স্রোতের টানে মাটির সংশ্রব ছাড়ে, মহারথী তারই টানে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, লোকে নিন্দে করে, অন্যায় করে, আদত কথা, মিথ্যার মাটি ধুয়ে যায়। কেবল শোনা যায় কুলকুল শব্দ কুল কুল কুল·· কুল— .

৬

হাত মুখ ধুয়ে চা খেতে খগেনবাবুর দেরী হল, কাল রাতে খাওয়া হয়নি, একখানা সিঙ্গাড়া খেলেন। সাংখ্যতত্ত্বের বই কিছু কিনতে হবে। খগেনবাবু বই-এর

দোকানে এলেন। ছোটবাবু হরিহর আরণ্যকের সাংখ্যতত্ত্ব ও খানকয়েক উপনিষদ বেছে দিলেন। দোকান তখনও খোলেনি, অর্থাৎ বিক্রী শুরু হয়নি। ততক্ষণ কি করা যায়? বই ঘাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। রমলা দেবী ঠিকই বলেছিলেন বই-এর কথা খাঁটি নয়—বোধ হয় তিনি বলেননি, সেটা তাঁরই মনের খবর, যেই বলুক সেই তাঁকে বোঝে। পিছনে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বোধ হল, গায়ে ফরসা পাঞ্জাবি, আস্তিনের ইস্ত্রি ভাঙ্গেনি, কাপড়ের কোঁচা সুসজ্জিত, বাদামী রং-এর এলবার্ট স্লিপার, কিন্তু ঝকঝকে নয়। পোষাকে উগ্রতা নেই ভদ্রতা আছে। ভদ্রলোক জামা কাপড় পরতে জানেন, সব শাদা, কেবল জুতোটাই রঙ্গীন, তাও উজ্জ্বল নয়। কোন বড়লোকের ভাগ্নে হবে, কোন বড়লোকের ছেলের মাসতুতো ভাইও হতে পারে। জুলপিতে চশমার দাগ রয়েছে, চশমা নেই, পড়াশুনার অভ্যাস আছে। সাহসভরে চাইতেই ভদ্রলোকের মুখে পূর্ব পরিচয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

খগেনবাবু বল্লেন, 'এই যে আপনি!'

ভদ্রলোক হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'বই দেখতে এসেছি, নতুন কিছু এল কি না!'

'কি ধরণের?'

'অমনি যা-তা।'

'তবু?'

'আপনিই বলুন না কি দেখি?'

'আপনি ত…'

'পাশই করেছি।'

ছোটবাবু বল্লেন, 'সুজনবাবু আপনার মতই বই ভালবাসেন, খুব পড়েন, সব বিষয়েই আগ্রহ।'

'তা হলে ভদ্রলোক বলুন! শুনেছি বটে।'

ছোটবাবু খবর দিলেন সুজনবাবুর লাইব্রেরীর কথা। দেখার আগ্রহ প্রকাশ করাতে সুজন অপ্রস্তুতে পড়ে বল্লেন, 'তাঁকে লাইব্রেরী বলেনা। নিজে দেখলেই বুঝবেন।'

'চলুন না যাই।'

'এখনই যাবেন?'

'আপনার বই দেখা হল না।'

'পরে হবে'খন।'

'একটু ঘুরে গেলে হয় না ?'

'.বশত, তাই চলুন।'

বই-এর প্যাকেট না নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

'কোথায় যাওয়া যায় ?'

'চলুন না, রমলাদির বাড়ি।'

'এইত কাল সাবাদিন ছিলাম। কাল এলেন না কেন ?'

'কাল একটা কাজ ছিল।'

'কি কাজ ?'

'কাল বিজনের সঙ্গে তাব ক্লাবে গিয়েছিলাম।'

'কোন ক্লাবে ?

'সে কি একটা ? তবে সবই টেনিসের, বেলা তিনটের সময় যে ক্লাবের মাঠে রোদ্দুর পড়ে না প্রথমে সেইখানে, তারপর সাড়ে পাঁচটার সময় যেখানে রোদ্দুর পড়ে, তাছাড়া···।'

'এ ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না কি ?

'আছে বৈ কি! তারপর ভাল মার্কার, নতুন বল, ভাল খেলোয়াড়· ।'

'খুব ভাল খেলেন বলুন।'

'এখন শিখছে।'

'ভীষণ গম্ভীর ভাবে শিখছেন তা হলে।'

'পরে খেলবে ভাল, আপাততঃ বল পরদাতেই বেশী যায়।'

'চিরকালই যাবে যদি এখন থেকে না অভ্যাস করেন।'

'বিজনের ধারণা অন্য, সে বলে আগে বল পরে বুদ্ধি!'

'অথচ খেলাকেই ব্রত করে নিয়েছে!'

'ব্রত করেনি, পড়াশুনাতেও ভাল। 'অথচ' কেন ?'

'অত গম্ভীরভাবে যে ব্রত পালন কবে সে নিশ্চয়ই পিউরিটান, এবং পিউরিটানরা বড হিসেবী লোক, নয় কি ? কোন পয়েণ্ট ছাডতে চায় না, আশা করি প্রো হবেন না ?'

'না তার কোন প্রয়োজন নেই।' সুজনকে নীরব দেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'আপনাকে রোজই তার খেলা দেখতে যেতে হয় ?'

'না। আমি কখনও কোন খেলা খেলিনি তাই খেলার মর্মগ্রহণ করতে পারি না। ম্যাচ দেখেছি, তবে সেটা পারিপাট্যের দিক থেকেই। প্র্যাকটিস দেখা

আমার ভাল লাগে না। যদি কোন তরুণ কবি কবিতা পাঠের সময় প এ র-ফলা একার আর ম, প্রে-ম বানান ক'রে ক'রে পড়েন কিংবা কোন গায়ক গান না গেয়ে কি ক'রে গলা সেধেছেন শোনান তা হলে ভাল লাগে কি? আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সাধনার ইতিহাস জানবার ফুরসত কোথায় বলুন?'

'কেন? সাজঘরের কোন স্থান নেই নাটকে?'

'না।'

'পিরাণ্ডেলো?'

'তাঁর পদ্ধতি এখনও ধাতে বসেনি।'

'র‍্যাফেল, রেমব্রাণ্টের স্কেচগুলো?'

'ছবির চেয়ে তার দাম কম, তাঁদের ছবি দেখাব পূর্বে তাঁদের বড আঁকিয়ে জানি বলেই সেগুলোকে ভাল বলি।'

'আত্মকাহিনী কিংবা ধরুন বসওয়েলের লেখা জনসনের জীবনী, জয়েসকেও বড মানতে হয়।'

'তার effect অন্য ধরণের, স্তূপের, মালার নয়। ওয়ার্কশপ আর দোকান এক জিনিষ নয়। আর্ট ও ক্রাফটের পার্থক্য স্বীকার করি।'

'ঠিক বুঝি না। মরিস কিন্তু…'

'চলুন না, রমলাদির বৈঠকখানায় বসেই বুঝিয়ে দেবেন। তিনি এই সব কথা শুনতে খুব ভাল বাসেন।'

'বেশ, তাই হবে।' খগেনবাবু এক টিন সিগারেট ও একটা দেশলাই কিনলেন। সুজন তাব হাত থেকে টিনটা নিয়ে নিজেই খুলে দিলে।

'খাওয়া হয় বুঝি?'

'এক বকম না-ই—' খানিকক্ষণ পরে সুজন ধীরে ধীরে বল্লে, 'একটা কথা ছিল।'

'বলুন না. আপনাব সামনে আমাব সঙ্কোচ আর নেই, আপনাবও থাকা উচিত নয়।'

'সেদিন ছেলেবা একটু অসভ্যতা করেছিল, সে জন্য…'

'না, না, মোটেই না. সে জন্য আমি দুঃখিত হইনি। তারা ত করবেই, ছেলেমানুষে করেই থাকে—আব এমন কি আর করেছিল?'

'চুপ ক'রে থাকলেই পারত।'

'তারা চুপ করে থাকবে কেন? তারা যে উপকার করছিল! না সুজনবাবু, আমি সত্যি কিছু মনে করিনি। কেন করব? সকলেই কি বোঝে? উপকার কবাও

ভালবাসি না, উপকৃত হতেও ভাল লাগে না।'

'তবু...'

রমলা দেবীর বাড়ি এসে শুনলেন যে তিনি মোটরে ক'রে দমদমায় কোন এক আত্মীয়ার বাড়ি গিয়েছেন। ফেরবার সময় খগেনবাবু বল্লেন, 'কই কাল ত কিছু শুনিনি!'

'হয়ত কারুর অসুখ বিসুখ করেছে হঠাৎ খবর এসেছে।'

'উনি বুঝি খুব সেবা করতে ভালবাসেন?'

'সেবা করতে পারেন।'

কেবল সেবা আর সেবা—কার সেবা? দুঃস্থ ও পীড়িতের—কিন্তু কি হয় সেবা ক'রে। কৃতজ্ঞতা কুড়িয়ে বেড়ান হয় অবশ্য। এইটাই ওঁদের দুর্বলতা। দুঃস্থ ও পীড়িতেরও গোপনতার একটা প্রয়োজন থাকতে পারে কজন বোঝে? সমাজের উপকার, হাসপাতাল, সেবা-সমিতি, সাধারণ প্রার্থনা এ সব জোর ক'রে ঘোমটা খোলা—যেমন বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে জোর ক'রে প্রবেশ ক'রে বরযাত্রীরা নববধূর ঘোমটা খোলে। তাদের হল মজা, কিন্তু মেয়েটির হল লজ্জা। এরি ফলে নববধূর স্বাভাবিক কমনীয়তায় রূঢ় আঘাত পায়, তার সরম টোটে, তার স্বর হয়ে ওঠে কর্কশ, গতি চঞ্চল, স্বভাব চপল, ভাষা অমার্জিত। সমাজ-সেবার মধ্যে এই ধরণের অভদ্রতা বর্তমান। একলা লজ্জা ভাঙতে লজ্জা আসে, সকলে মিলে লজ্জা ভাঙায় আর সংকোচ থাকে না, দুঃস্থের প্রতি সম্ভ্রমবোধের দায়িত্ব ঘুচে যায়। সেবা-ধর্ম যতই বৈজ্ঞানিক ততই কার্যকরী, কিন্তু ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক ও মানুষের পক্ষে অসম্মান-সূচক। সুজন কি সেই অসম্মানের জন্য ক্ষমা চাইছে?

'আচ্ছা সুজনবাবু, আপনাদের দলে কি অসভ্যতা হয়েছিল মনে হয়? মৃতের প্রতি সম্মান দেখায়নি?'

'আপনার প্রতি।'

'মৃতের প্রতি নয় কি?'

'তাও বটে, কিন্তু প্রথমত আপনার প্রতি।'

'পরের উপকার ক'রে কি হয়?'

'শক্তি সঞ্চয়।'

'আপনি বুঝি অ্যাডলারের শিষ্য?'

'এখনও গুরু কাড়িনি।'

'অর্থাৎ অনেক গুরু ?'

'বোধ হয় তাই।'

রমলা দেবী বোধ হয় প্রভুত্ব খাটাতে ভালবাসেন, অমন সপ্রতিভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বভাব দেখলেই ঐ ধারণা হয়। মনের জোর আছে, নিজেকে ভালবাসেন, ভালবাসেন শক্তিমতী হতে, ভক্তি তাঁর ধাতে নেই, বৃন্দাবনেব গোপিকা নয়, মথুরার মহেশ্বরী। কোথায় যেন স্বভাবে খামখেয়াল আছে,···কিংবা হয়ত জোব ক'রে নিজেকে তাঁর কাছ থেকে সবিয়ে নিচ্ছেন। দমদমা চলে যাওয়াব অর্থ হল তাঁকে আজই কাশী যেতে আজ্ঞা করা। বেশ তাই ভাল, তা ছাড়া উপায় কি ? কোন দাবী নেই--কি দাবী ? স্ত্রীর বন্ধু ? স্ত্রীর ওপরই দাবী থাকে না ত আবার স্ত্রীর বন্ধুর ওপর ! বন্ধুর ওপর থাকতে পারে—কিন্তু বন্ধুত্ব সম্ভব কি ?

'চলুন, আপনার লাইব্রেরী দেখিগে।'

'সেই ভাল।'

'তখন 'তবু' বল্লেন কেন ?'

'অন্য সময় হবে।'

'না, এখুনি, জুড়িয়ে গেলে কি প্রশ্নের কি উত্তর দেব জানিনা।'

'চলুন, বাড়ি যাই।'

কলেজ স্ট্রীট থেকে একটি গলি পূবদিকে গিয়েছে, তারই মধ্যে বিজন-সুজনদের বাডি। বাডিটা বেশ বড, গেটের এক পাশে দারোয়ানের ছোট্ট ঘর, অন্য পাশে গ্যারাজ। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারাণ্ডা, তারই কোণে একটি সুসজ্জিত 'হল', ডাইনে বাঁয়ে আরো দুটি বৈঠকখানা, ডাইনের ঘরটি বই-এ ভর্তি, তারই পিছনে, ভেতরের বাঁধান উঠানের দিকের ঘরটি সুজনের। পর্দার ফাঁক দিয়ে দু'চারটে টবে সাজান পাতাবাহার এবং গোল লোহার সিঁড়ির খানিকটা চোখে পড়ে। অঙ্গনের সিমেণ্ট কেটে একটা 'ম্যারীশাল নীল' তোলা হয়েছে গোল সিঁডিকে বেষ্টন করিয়ে। পরিপাটি উঠোন দেখে মনে হয় যে বাড়িতে কোন মহিলা নেই। সুজনের ঘরটি পড়বার ও শোবার। একটি কোণে লোহার খাটের ওপর ক্যামেল হেয়ারের কম্বল বিছানো—পাশে ছোট টেবলে পডবার আলো, কোণে কাঠের আসনে কুঁজো, তার মাথায় কাচের গেলাস। পুলী লাগান একটা বাতি টেনে শিয়রের কাছে আনা হয়েছে। পড়বার টেবলে বই, রিভলভিং সেলফেও বই। বৈঠকখানায় যাবার দরজার ফাঁকে বড় আলমারী, বই-এ ভর্তি। কোণে চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স, ওপরে আরশি। টেবলের ওপর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যুবাবয়সের

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। টেবলের ওপর বড় একখণ্ড কাচ, পাশেই লম্বা কাচের নলে লাল জল পোরা। খগেনবাবু রিভলভিং কেসের পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'চা খাবেন।'

'বেলা হয়ে গিয়েছে।'

'একটু বসুন, বিজনকে ডাকছি।'

'তাকে আর বিরক্ত করে লাভ কি?'

'সে খুব খুশী হবে, আমি আসছি।'

খগেনবাবু একলা বসে বই দেখতে লাগলেন। ছেলেটির রুচি একমুখী নয়—নানা রকমের বই, বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানের, তা ছাড়া নতুন পদার্থ বিজ্ঞানের সরল ব্যাখ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বিশেষ ক'রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-নিরূপণ সংক্রান্ত একাধিক বই ও প্রবন্ধ। সব বইগুলিই আধুনিক ও নতুন লেখকদের—একটিও পুরাতন লেখকদের নয়। আজকালকার ছেলেরা বই সম্বন্ধে বই পড়ে, পরাশ্রিত বই, তাই পরগাছা মন তাদের। এই সব সংক্ষিপ্তসার গণমনকে তুষ্ট করবার জন্যই সরল ভাষায় লেখা হয়, তাতে মনের আভিজাত্য বজায় থাকে না। খগেনবাবু এই ধরণের বই পছন্দ করতেন না—বলতেন, অ্যামেরিক্যানিজম সভ্যতার রিপু বিশেষ। ডিমক্রেসী মনের একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করে, মনকেই অস্বীকার করে, তার পরিবর্তে হট্টমনের পূজা করে, অথচ ব্যক্তিরই মন আছে, সমূহের ও বালাই নেই। প্রমাণ দিতেন ইতিহাস থেকে, যেমন টিউটন জাতির গ্রাম্য ও কৌল সভ্যতা গ্রীক ও রোমানদের পৌর ও নাগরিক ব্যক্তিপ্রধান সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করেছিল, তবু সেটি লোপ পায় নি, গ্রীক ও রোমানদের অভিজাত ব্যক্তিপ্রাণ বৈদগ্ধ্য আরবদের কৃপায় রক্ষা পেল, এবং পেল বলেই আইন কানুন এবং রোমীয় খৃষ্টান ধর্মের দ্বারা যুরোপ এখনও উত্তমরূপে ধৃত রয়েছে, তার মন এখনও জীবন্ত, ভারতবর্ষীয় মনের মতন নির্জীব নয়। খগেনবাবু বলতেন মধ্য যুগের কৃতিত্ব এই ব্যক্তির মনকে বাঁচিয়ে রাখা। আজ সভ্যতার দুর্দিন এসেছে, নতুন অসভ্যতার উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, কুলের নাম হয়েছে জন-গণ, সেই জনগণমনঅধিনায়কের ক্ষমতা অসীম। নতুন দেবতার হাতে মস্ত মোটা কলম, তাই দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সার্থকতার দেবতার একই বার্তা, একই মন্তব্য লিখে যাচ্ছেন। এই ঠাকুরের মুখে হাসি নেই, আছে গাম্ভীর্য। ইনি টেল-এল কবীরের কেরাণী নয়, গ্রামের সুদখোর বেনে, লাল খাতায় যে সর্বদাই কি লিখে যায়, আর লোকের হয় সর্বনাশ তার অজানিতে। এই যুগে এই উৎপাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কি ষড়যন্ত্র করা যায়? ভিড় ঠেকিয়ে রাখতেই হবে, নিজেকে সামলাতেই হবে। বিপদ কি একটা? কোথা দিয়ে শত্রু প্রবেশ করে স্বকীয়তার মূল উচ্ছেদ করে কে জানে? ভিড় আর স্ত্রীলোক একই বস্তু, দুটোই স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী। রমলা দেবী দমদমা চলে গিয়ে পুরুষোচিত, অর্থাৎ সত্যকারের ভাল মেয়ের উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। খগেনবাবু Outline of Art-এর ছবি দেখতে লাগলেন।

শ্বেত পাথরের থালায় ফল, সন্দেশ ও গেলাসে জল নিয়ে সুজন ঘরে প্রবেশ করল। খগেনবাবু বললেন, 'এ আবার কেন? আমি কিছু খাই না।' থালা ও গেলাস টেবলের উপরই রইল। খগেনবাবুকে কেউ খেতে অনুরোধ করলে অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁর মনে হত যে খাবার দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। খগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি প্রশ্ন মনে এসেছিল?'

'প্রশ্ন? এখন মনে নেই। একটা কি?'

'বলুন না, প্রশ্ন মনে হয় অনেক, কিন্তু বাস্তবিকই একটা!'

'ঐ কথাটা বুঝতে দেরী লাগে না কি?'

'অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, বয়সের উপর নয়।'

'অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে কি সকলে?'

'অভিজ্ঞতার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় বটে, সেজন্য অবসর চাই···Dread the passage of JESUS for he does not return···অভিজ্ঞতা অর্জন করব বলে ছুটে বেড়ালে আসে না, আবার না ডাকলে আসে। রবীন্দ্রনাথ এ খবর জানেন, বহুবার দিয়েছেন। কর্মের উপর আমার কোন আস্থা নেই। চীন জাপানের ধ্যানী সম্প্রদায় অবসরই চাইতেন, চারধারের আগাছা তুলে ফেলে এক নিভৃত পরিষ্কৃত কেন্দ্রে আত্মস্থ হতেন। কাচের উপর ময়লা থাকলে আলো প্রতিফলিত হয় না।'

'সে হল চিত্তশুদ্ধি!'

'যাই নাম দিন—অবসর চাই।'

'কিছু খাবেন না? ফল, কোন অসুখ করবে না।'

'না, আমায় অনুরোধ করবেন না······অবসর মানে কুঁড়েমি নয়, মন খুব সক্রিয় থাকে তখন, অবসরের মধ্যেই মন অভিজ্ঞ হয়।'

'বাইরের আগাছা পোড়াবেন কি ক'রে? How will you burn the bush? গোলমালের হাত থেকে অব্যাহতি কি ভাবে পাবেন?'

'সাধনার দ্বারা।'

'যদি তার মধ্যে কোনটা রঙ্গীন কিংবা সুগন্ধি ফুল দেয়, যদি কলরবে কোন বাণী গুপ্ত থাকে?'

'ঝোপের মধ্যে বাণী! Voice in Wilderness? অত বাছলে চলে না, দেখুন, সুজনবাবু, অত খাতির করা যায় না, কবে কোন ফুল দেখবো, কবে কোন বাণী শুনতে পাব—এ সব ভাবলে চলে?'

'কেন?'

'সুনিশ্চিতের জন্য অনিশ্চিতকে ত্যাগ করতেই হবে। আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকছে কেমন ক'রে?'

'ব্যক্তিই ত একমাত্র অনিশ্চিত বস্তু, গড়পড়তা জিনিষটা অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত।' খগেনবাবু গালে হাত দিয়ে ভেবে বল্লেন, 'আপনি যা বলেছেন তাঁর উত্তর আছে; এখন ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—উত্তর বোধ হয় এই ধরণের হবে খানিকটা—সমাজের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তির বৈচিত্র্য ফুটে উঠতে পারছে না গড়পড়তার চাপে, প্রত্যেকে যখন পৃথক সত্তা অর্জন করবে তখনও গড়পড়তা বস্তুটি থাকবে, তবে প্রভু হিসেবে নয়, এবং তার স্তরও হবে উন্নত।'

'ইতিমধ্যে?'

'ইতিমধ্যে অস্বীকার।'

'বাধা রয়েছে যথেষ্ট।'

'বাধা অতিক্রম করার নামই সাধনা—সেটা নিজের কাজ, পরের দ্বারা হয় না, কেননা পরই হল সমাজ নামক শত্রুর গুপ্তচর। সেইজন্য উপকার করতেও চাই না, উপকৃত হতেও আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে। সেইজন্য সেবা সমিতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, আশ্রম—কোন কিছুই ভাল লাগে না। মানুষ অক্ষম, তাই না উপকারের প্রয়োজন? যতই উপকারের মাত্রা বাড়বে ততই অক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হবে। আমি স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতী, infant industry argument-এ ক্ষেত্রে অচল।'

'অনেকটা ছাড়তে হয়।'

'তা হোক, রঙ্গীন বুনো ফুলের ক্ষতিপূরণ হয় ভেতরে পদ্ম পেয়ে।'

সুজন চুপ করে বসে রইল, খগেনবাবু খানিক পরে বললেন, 'আমার একটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দিন। কি উপায়ে আপনি দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আনবেন? গ্রীক সভ্যতার রেশ টানলে রোমানরা, তাকে সমৃদ্ধ করলে আরবরা, টিউটনিক জাতির

কৌলিক অনুষ্ঠান তার সর্বনাশ করত যদি টিউটন জাতি প্রটেষ্টাণ্ট না হত। আর এই প্রোটেষ্ট্যান্টিজমের দৌলতেই বিজ্ঞান, তু'-এর সমাবেশে যান্ত্রিক সভ্যতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্থাৎ লিবারেলিজম। আমাদের দেশে কি হবে? য়ুরোপের অন্য সুবিধা ছিল —তাব ছিল ক্যাথলিক চার্চ। আমাদের সমাজ বন্ধন আর শক্ত নেই। রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নেই, আছে শাসন-পদ্ধতি, সেটা না হয় বদলে গেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই—ধরুণ আমাদের ঐতিহ্যে প্রত্যেক মানুষকে একান্ত ক'বে দেখাব অভ্যাস ছিল, বর্তমানে যে সব নতুন দল বাঁধা হচ্ছে তাদের বিধি ও অনুশাসনেব চাপে মানুষকে একান্ত ক'বে দেখা হচ্ছে না, অথচ দল না বেঁধে কোন উপায় নেই, এখন এ-যুগে কি উপায়ে প্রত্যেকেব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন!'

'কোন কোন দলের উল্লেখ করছেন? আমাদেব ইতিহাসে কি প্রত্যেকেব বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করা হয়েছে? সমাজেব কল্যাণসাধনে ব্যক্তির কল্যাণসাধনা বরাবরই সম্ভব ছিল।'

'প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তব দিই। গোড়ায় বলেছি, ধরুণ ছিল। যোগসাধনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটি আনুমানিক সত্য অর্থাৎ hypothesis, সেটা খাঁটি খবর নাও হতে পাবে। হিন্দু সমাজ বরাবরই মানুষেব ওপব অত্যাচার ক'রে আসেনি—তাব প্রমাণ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই পর্যায় দুটি। ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য পর্যায়ে সমগ্রের প্রভুত্ব খাটত, কিন্তু অন্য দুটিতে নয়। তখন ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা সমগ্রের উপকার করাই ছিল সাধনাব উদ্দেশ্য। এখন অবশ্য সবটাই গার্হস্থ্য। যদিও আমাব ইতিহাস ভুল হয়, তবুও আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনার উপায় আলোচনা কবা চলে। আদর্শটা বড় এবং ঐ আদর্শ এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্বীকার করতেই হবে, কারণ আমাদের সমাজ নির্জীব, তার সাধারণ স্তর নিচু, তাকে উন্নীত কববার একমাত্র উপায় সমাজেব প্রত্যেককে বড করার সুযোগ দেওয়া। দেবেন কি উপায়ে? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি অনুষ্ঠানের নামোল্লেখ করছি। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের চাকরী, বৃত্তি, হিন্দুসভা ইত্যাদি। তা ছাড়া নব্যগোষ্ঠী ত বটেই!'

'নব্য পরিবার?

'সেখানে স্বামীব উপব স্ত্রী অত্যাচার করে, স্ত্রী না করুন, স্ত্রীর বন্ধুরা করেন। অবস্থা ভাল বলেই নিকট আত্মীয়স্বজন দূবে চলে যান, কিন্তু দূরসম্পর্কের আত্মীয়েরা, বন্ধুরা, মধুমক্ষিকার মতনই আকৃষ্ট হন। মধুচক্রের অনুশাসন কি জানেন ত? একেবারে জার্মান-পসন্দ, বৈজ্ঞানিক··· অথচ তাও চাই, খুব চাই···

একটা পদ্ধতি চাই, নচেৎ সাধনার অর্থ থাকে না।'

'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটা লোকের গোপন সাধনার কি উপকারে আসবে?'

'বৈজ্ঞানিক মনোভাব—অর্থাৎ কোন বাইরের শাসন না মানার প্রবৃত্তি, নিজের মার্জিত বুদ্ধি অনুসারে নিজের জীবন যাত্রা নির্বাহ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ল্যাবরেটরীতে কলকব্জা নাড়াচাড়া বিজ্ঞান নয়। প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করা, ইতিহাসকে মানা, অভিজ্ঞতা-সুলভ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাব। আরবদের অভ্যাস ছিল তাই। যাকে inductive intellect বলতে পারেন আমি তাই চাই।'

'সেটা কি হিন্দুদের মধ্যে পেলেন না?

'হিন্দুদের মধ্যে নেই, হিন্দু ধর্মে আছে খানিকটা, যদিও গুরু ও বেদ মানাতে নেই! মনে হয়, হিন্দুদর্শনে আছে, সেই জন্যই ভাবছি বেদান্ত, সাংখ্য পড়ব।

'নব্য হিন্দুয়ানী প্রবর্তন করতে চান?

'চেষ্টা করে দেখব। মুসলমানেরা যদি আরব সভ্যতার প্রতি বেশী শ্রদ্ধাবান হন, তা হলে ভারতবর্ষের কাজ সহজ হয়।'

'বিজ্ঞান-শিক্ষা?'

'সেটা সঙ্গে সঙ্গে চলবে। সংস্কৃত, আরবী ও বিজ্ঞান পড়লে দেশের স্তর উঁচু হবে!' সুজন হেসে ফেল্লে। খগেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, 'হাসুন আর যাই করুন, কংগ্রেস ফংগ্রেসে কাজ হবে না। এর বেশী আর জানি না।'

'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেশী হলে যান্ত্রিক সভ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে আসতে বাধ্য।'

'ততদিনে নতুন সমাজ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবন্ধক হবে। values-এর পরিবর্তনে সব সম্ভব হয়।'

'সে ত এক প্রকার ধর্মত্যাগ!'

'ধর্মত্যাগ ও নতুন ধর্ম গ্রহণ—আমি চাই conversion'—বলেই খগেনবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'দেখুন যত বড় ভাব দিয়ে আরম্ভ করি না কেন, সিদ্ধান্ত সব ছোট্ট হয়ে যায়।'

'ছোটতে লজ্জা কিসের?'

'না লজ্জা আর কি? তবে দাম্ভিকতায় ঘা লাগে।'

'বিজনকে ডাকছি—বিজন—বিজন ··

বিজন ঘরে প্রবেশ করল, বলিষ্ঠ যুবক, বয়সের পক্ষে অযথা দীর্ঘ। খগেনবাবুকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। সুজন বিজনকে বসতে ইঙ্গিত করলে। খগেনবাবু,

নীরবে সিগারেট খাচ্ছেন দেখে বিজন উঠে চলে গেল, পাশের ঘর থেকে একটা থ্রী কাসলস সিগারেটের নতুন টিন ও লাইটার খগেনবাবুর সামনে রাখলে, খগেনবাবুর হাতের সিগারেট শেষ হবার সময় পুনরায় উঠে গিয়ে একটি ছাই রাখার পাত্র আনলে ও নতুন টিন খুলে দিলে। কেতা দুরস্ত ছেলে, বড় লোকের বংশধর, তাই বমলা দেবী ঘাটে যেতে দেন নি একে 'বিজন ভাল টেনিস খেলে, ইণ্টার মিডিয়েট আর্টস পড়ে।' বিজন বল্লে, 'কৈ কিছু খেলেন না?'

'ওঁর শরীর ভাল নয়, খাওয়া উচিত নয়—বিজন, তুমি নিজেই খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না অবনীবাবুর ছবি কিসে ভাল?' বিজন চুপ করে বসে রইল দেখে সুজন বল্লে, 'আচ্ছা অবনীবাবু এই ধরণের প্রতিকৃতি আঁকা ছেড়ে দিলেন কেন?' রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির ওপর চোখ রেখে খগেনবাবু বল্লেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, অবনীবাবু যখন ঐ ধরণের ছবি আঁকতেন তখন নিজের ধর্ম বোঝেন নি। অনুকরণ করতেন চমৎকার, এখন সৃষ্টি করেন।' বিজন মুচকি মুচকি হাসছে দেখে সুজন তাকে খেতে অনুরোধ করলে, কিন্তু বিজন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। খগেনবাবু বিজনকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বুঝি এঁদের ছবি ভালো লাগে না?' 'না আমি পুরোনো দলের।'

'আপনার দল পুরোনো নয়, আর্টের ইতিহাসে আপনার দলটি নাবালক। সিমাবো, জিয়টোর পূর্বে প্রকৃতির অনুকরণ করাকে লোকে আর্ট বলত না. তাঁদের পরেও বাইজ্যানটাইন আর্ট-ও জীবিত ছিল, এখন আবার সেই ধারাকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া, পশ্চিম য়ুরোপ সমগ্র য়ুরোপ নয়, য়ুরোপ সমগ্র বিশ্ব নয়, আর তিনশ' বছরে সময় ফুরিয়ে যায় নি।'

সু—তা নয় ঠিক. বিজনের আপত্তি নতুন দলের ছবির রুগ্ন দেহে। নিজে ভাল টেনিস খেলে কি না'

খ—তা হলে ওঁর হেলেন উইলস, ল্যাংলার ছবি দেখা কিংবা সুইডিশ ড্রিলের ফোটো দেখাই ভাল।

সু—আমিও বলি বিজনকে, ওঁদের অঙ্কিত মহিলা তোমার ভাবী পত্নীর ফোটো না হলেই হল।

বিজন উঠে পড়ল দেখে খগেনবাবু হাসলেন। দাঁড়িয়ে উঠে উষ্মার সহিত বিজন বল্লে, 'যা দেখছি, তা আঁকব না?'

খ—আপনি দেখছেনই না, দেখার অভ্যাস করা চাই।

বি—কি ভাবে অভ্যাস করব? চোখ বুজে, ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে?

খ—চোখ বুজেই দেখতে হয়, নচেৎ বাজে জিনিষের সমগ্রতা চোখকে আচ্ছন্ন করে; সুষুপ্তির অবস্থাই আর্টের পক্ষে সব চেয়ে ভাল, কেন না, জেগে থাকলে অন্য ইন্দ্রিয় ধ্যানচ্যুত করে। দুঃস্বপ্ন নয়।

স্থ—নতুন ছবি দেখে মনে হয় কিন্তু যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি—এমন অদ্ভুত!

খ—দুঃস্বপ্ন হয় গরহজমে। য়ুরোপ নতুন খাবার পেয়েছে অনেকদিন উপবাসের পর, তাই বেশী খেয়ে ফেলেছে। সত্যকারের আর্টিষ্টের হজমশক্তিতে কোন দোষ নেই।

বি—দোষ চোখেই। চোখ বুজলে সরষের ফুলই দেখি। আপনি কি ভাবেন যে বড় বড় লেখকরা চোখ বুজে পৃথিবী দেখেছেন?

খ—আপনি কাকে বড় বলেন?

বি—এই ধরুন চিত্রকরের মধ্যে রেণী, কিংবা গ্রয়েজ, লেখকদের মধ্যে এচ, জি, ওয়েলস্।

খ—নাবালকের চিত্রকর ও সাহিত্যিক।

বিজনের মুখ লাল হয়ে উঠল···

বি—আপনার মতে কে বড শুনতে পেলে আমার বড উপকার হয়।

খ—রবীন্দ্রনাথ পড়েন?

বি—না।

খ—কেন?

বি—জোর নেই লেখায়!

খ—তা বটে, হাতে গুল নেই।···বিজন উঠে দাঁডাল।

বি—ওয়েলস বড নয় কেন?

খ—ভাবী অস্থির, নিতান্তই প্রগলভ, সর্বসাধারণের তুষ্টিসাধন ক'রে, চোখ টেনে বড ক'রে চায়, তাই অত বাজে জিনিষ চোখে এসে পড়ে, সেই জন্য তাঁর সর্ব-বিষয়েই মন্তব্য করা চাই। স্থির নয়, শান্ত নয়, এই যুগেরই লেখক, সর্বযুগের অন্তর দিয়ে যে ধারা প্রবাহিত হয় তার সন্ধান তিনি পান নি। বর্তমান যুগের পিতা যেমন ছেলের বন্ধু হতে চায়, তার সঙ্গে বেশী কথা কয়, উপহার দিয়ে দিয়ে তার স্নেহ প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়, স্নেহের মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলে, ছেলেকে উন্নত করবার জন্য যেন প্রাণপাত করছে দেখাতে ব্যগ্র হয়, ওয়েলস সেই ধরণের সর্ব-সাধারণের বন্ধুপিতা।

বি—তাতে ক্ষতি হয় না, লাভই হয়।

খ—ক্ষতি ভীষণ, ছেলে আব্দারে হয়ে ওঠে।

বি—কি করা উচিত ছেলেকে ?

খ—আত্মীয়কে দূরে রাখলেই আত্মাব মঙ্গল, নিজের এবং আত্মীয়ের।

বি—ছেলে উচ্ছন্ন যাবে না ?

খ—যায় যাক গে……খগেনবাবু সিগারেট ধরালেন।

সু—তিনিও কিন্তু একীকরণের বিপক্ষে।

খ—মুখে তাই বলেন, বাস্তবিক তা নয়, নচেৎ নতুন ব্যবসায়ী বড়লোক দিয়ে জগৎ চালাতে চান ? তারা ঐ একীকরণের সাহায্যেই বড় হয়েছেন।

সু—কিন্তু স্বাধীনতার একটা সীমা থাকা চাইত ?

খ—সীমা ? নিজের চারপাশে যে যতটুকু অবসর তৈরী করতে পারে, সেই টুকুই তার স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্র।

সু—তা ছাড়াও…

খ—তা ছাড়া নয়, তারপর বলুন ! তারপব, তারপব, বোধ হয় নিজের অতিরিক্ত কোন শক্তি কিংবা নিয়তির বাধ্যতা ইচ্ছা ক'রে, জেনে শুনে স্বীকার করার নামই স্বাধীনতা, অন্ততঃ তাইতেই জগতের মঙ্গল ও পরিপূর্ণতা। পিতার মৃত্যুর প্রার্থনা করছি না, তবে যে ছেলে পিতার অধিকারের হেতু আবিষ্কার করে সেই ছেলে ভাল ছেলে. আবিষ্কাবের পব যে বাধ্যতা আসে তাইতেই সংসারের শান্তি।

সু—হেগেল, কার্ল মার্কসের ঐ ধরণের স্বাধীনতার অর্থ আজ রাশিয়ায় নিরর্থক হয়েছে শুনতে পাই।

খ—ইতিমধ্যে তাই হয়েছে, কিন্তু গর্কীর মতন লোক বলেছেন যে রাশিয়াব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সুরু হয়েছে।

সু—সেখানে কিন্তু দলের প্রভুত্ব।

খ—জানি, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। তা ছাড়া, দলের কার্যাবলীর সমালোচনা দলের সভ্যদের মধ্যে এতই রূঢ় যে অনেকের মতে তাতে ক্ষতি হচ্ছে।

সু—উদ্দেশ্য অনুসারেই তা হলে কার্যাবলী বিচার করতে হয় !

খ—উদ্দেশ্য অসাধারণেব। অসাধারণের পক্ষে বনবাস চাই, প্রথম অবস্থাতে, লেনিনেব জীবনী পড়ুন—তাঁর বনবাস জীবনের প্রথমাংশে, যেমন হিন্দুদের শেষাংশে। লোকটা কত ভেবেছিল ! সাইবেরিয়া, সুইজারল্যাণ্ডে বসে—বই-ট লিখেছেন কত ! দেখুন সুজনবাবু, মানুষের একটা অবস্থা আসে যখন নিজেকে সরিয়ে রাখতেই হয়। বড়লোকে কখনও জনসাধারণের নিকটাত্মীয় হতেই পারে

না। এই বনবাস আত্মরক্ষার জন্য, আত্মোন্নতির জন্য, পরের স্বাধীনতা অন্যের সঙ্গে মৈত্রী কি সাম্যের জন্য নয়। আত্মরক্ষা কথাটির অপপ্রয়োগ হয়েছে, আসল কথা আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ স্ব-রাট হওয়া। অন্তরে ভূয়ো, আর মুখে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী। ওসব ধরতাই বুলি, কথার কথা, মন ভুলানো যাদুমন্ত্র। বিজন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা কথার কথা।'

খ—আজ্ঞে হাঁ, ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক থেকে মুখস্থ বিদ্যার লালাক্ষরণ মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে সাম্য নেই, আত্মোন্নতির কে কোন ধাপে রয়েছে তার ওপর সাম্য নির্ভর করছে। স্বাধীনতা বহিঃপ্রকৃতিতে নেই, জড় আমাদের টুঁটি চেপে মারছে জড়ের দৌরাত্ম্যে, জড়ের dictatorship-এ প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে

বি—আর মৈত্রী ?

খ—মৈত্রী, মৈত্রী, ঠিক জানি না।

বি—আপনি আবার জানেন না। সুজন বিজনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল।

খ—না, সত্যই ঠিক জানি না আমি জানি না তর্ক করবার জন্য তর্ক করি না, জেতবার জন্যও নয়, তাই বলছি জানি না মানুষ ভীষণ একলা, তবে সঙ্গ চায় আমার বড় দেরী হচ্ছে, যাই। খগেনবাবু বেরিয়ে এলেন- গেটের কাছে সুজনকে বল্লেন, 'চলুন না বই-এর দোকান পর্যন্ত, এতক্ষণ বই বিক্রীর সময় হয়েছে।' পথে সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মৈত্রী মানে কি ?'

'মৈত্রীর মানে জানি না—বন্ধুত্ব বুঝি, সেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্বন্ধ, সকলের সঙ্গে একের নয়, সকলেরও নয়। বোধ হয় দেহের ব্যাপার কিছু।

'সঙ্কীর্ণ স্থানে অনেক লোক একত্র থাকার দরুণ ব্যক্তির দৈহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, সেইজন্য, ঠিক কি পদ্ধতিতে এখনও জানা যায় নি, মানুষ জনতার মধ্যে নিজের বুদ্ধিসুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে—আপনি কি তাই বলছেন ?

'দেহতত্ত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না বোধ হয়। বন্ধুত্ব হল খানিকটা আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষা, অসম্পূর্ণতা বোধ। লোকে ধরতে পারেনি মৈত্রীটা কি বস্তু। লোকে জানে প্রেমকে, কিন্তু মৈত্রী আরও ব্যাপক। একরকম খিদে বলতে পারেন। হাঁ, দেহগতও বটে খানিকটা। মাটির জন্য যে খিদের পরিচয় পাওয়া যায় বটগাছের নতুন ঝুরিতে, বন্ধুত্ব সেই রকমের, নচেৎ বটগাছ টলমল করে ঝড়ে, উলটে যায় সহজে। রমলা দেবীর সঙ্গে ঐ কথাই হচ্ছিল। আচ্ছা বিজন আপনার কে ?'

'ভাই।'

'আপনার?'

'না।'

'আত্মীয়?'

'মামাতো ভাই।'

'বাপেব এক ছেলে?'

'হাঁ মামীমা নেই।'

'তাই ·

'বিজন চমৎকার ছেলে, প্রাণ আছে, খুব উদার হৃদয়, একদিন নিয়ে যাব আপনার কাছে।'

'বুদ্ধি কেমন?'

'বেশ বুদ্ধিমান—যেমন খেলায়, তেমনি পড়াশুনোয়, অল্প পড়েই পরীক্ষায় ভাল করে। কথা কয়ে দেখবেন!'

'বিজন আমার বিপরীত ধর্মী। আমি কাশী যাচ্ছি।'

'কাশী? কবে?'

'ঠিক নেই। কাশী থেকে অন্যত্র কোথাও যাব বোধ হয়, কোলকাতার ভিড় ভাল লাগছে না।'

'সেখানে আত্মীয় আছেন বুঝি?'

'হাঁ, মাসীমা আছেন তবে আত্মীয়েরই বা দরকার কি? সুজন, মৈত্রীতে বিশ্বাস কর?

'জানি না!

'কি মনে হয়?'

'মৈত্রী মানে Catalysis—সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে দেওয়া—স্বল্পক্ষণের জন্য নিজে বদলে গিয়ে।'

'কিন্তু পুনরায় নিজেতে ফিরে আসা চাই।'

'তা ত বটেই।'

'আপনি আমার মতের দেখছি। অর্থাৎ ঘটকালি করা?'

খগেনবাবু হঠাৎ সুজনের কাঁধে হাত রাখলেন, 'ঘটক ঠাকুর হলেন কবে থেকে? এত অল্প বয়সেই হতে হয়েছে!'

'স্বভাবে ছিল।'

'স্বভাব না ভাগ্য? অবশ্য একই কথা।'
'আপনি মৈত্রী মানেন?'
'পরে জেনে বলব।'
'কবে?'
'কাশী থেকে জানাব।'
'লিখবেন? আমার খুব ভাল লাগবে আপনার চিঠি পেতে; কবে যাচ্ছেন?'
'আজই ভাবছি।'
'আজই!'
'কি জন্য আর থাকব!'
'রমলাদি জানেন আজ যাচ্ছেন?'
'তিনিই যাবার সুবিধা করে দিলেন·· পুরোহিতের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে· জানেন নিশ্চয়। আর মতামতের প্রয়োজনই বা কি!'
'না, তাই বল'ছ।'
'চিঠির জবাব দেবেন ত?'
'আগে লিখুন, তার পর। স্টেশনে যাব?'
'না।'
বই-এর দোকানে লোকজন; প্যাকেট নিয়ে খগেনবাবু বাড়ী এলেন। 'মুকুন্দ, মুকুন্দ, আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই কাশী যে'তে হবে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে। গুছিয়ে নাও নিজের জিনিসপত্র, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল, সেও যাবে। আত্মীয়কে তোমার খবর দাও, বাড়ী আগলাবে। চাবিগুলো কোথায় রে?'

৭

মাননীয়াসু,
আমি প্রায় এক সপ্তাহ কাশী এসেছি। এখনও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারিনি, সেই জন্য আপনাকে পত্র দেওয়া হয়নি। আজ সকালে অবসর পেয়েছি; তাই আপনাকে চিঠি লিখছি।
আসবার দিন সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই। শুনলাম আপনি দমদমা গিয়েছেন। একটু নিরাশ হয়েছিলাম। আপনার আত্মীয়া কেমন

আছেন? সুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, বড় ভাল লাগল। তার প্রকৃতিতে যে ভারসাম্য আছে সেটি স্থানু পদার্থের নয়, চলিষ্ণু জীবের। ভাবছি পূর্বে আলাপ হয়নি কেন? আপনি ঠিকই বলেছিলেন, নিজেকে সরিয়ে রাখতে সে ভালবাসে, সেই জন্য তার অনুগ্র উপস্থিতিতে বিরোধের সম্ভব হয়। বিজন প্রাণময় জগতের অধিবাসী, এখনও অপরিণত। সে ভাবে তার আছে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার যৌবনসুলভ দৈব অধিকার।

কাশীতে কেমন আছি? কাশীতে ধুলো আর ভিড়, ভিড় আর ধুলো, কাশীর ট্রেনে ভিড়, তার বেঞ্চিতে ধুলো। ভিড়ে মুকুন্দ হারিয়ে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে উদ্ধার করি। স্টেশন দেখলাম, 'বাস'! কোথাও টঙ্গা চড়ে পশ্চিমে এসেছি অনুভব করব, না সেই কোলকাতার যান-বাহন! কি যাচ্ছেতাই স্টেশন! মনকে ছোট ও সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়। ওপারে যাবার পুলের আচ্ছাদন ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বোধহয় এদেশের কর্তারা ভাবেন যে পবিত্র স্থানের প্রবেশদ্বার ঐ রূপই হওয়া উচিত; এবং সংসারের চাপে মন কুব্জ, ন্যুব্জ, সঙ্কুচিত না হলে ভগবানের দিকে মন যায় না, ভক্তিরসে মন আপ্লুত হয় না। রস ত পরে আসবে কিন্তু ইতিমধ্যে রাস্তার ধুলো ও রুক্ষতায় মনের আর্দ্রতা শুখিয়ে ঝুনো হয়ে যাচ্ছে যে! রাস্তার দুধারে গাছের পাতা পর্যন্ত সবুজ নয়, কাশীবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্বকেশের অনুরূপ। কিন্তু একটা জিনিষ ভারী তাজা ও ঝকঝকে; পানের দোকানের পিতলের বাসন, ও রং বেরং-এর ফুকো গোলা ও শিশি। দিনের বেলায়ও দোকানের বাহার খোলে। কিন্তু এত ভোগের চিহ্ন! কাশী এসে মানত ক'রে বাবা বিশ্বনাথকে কেউ পান দিয়ে গিয়েছে শোনা যায় নি। কাশীর পানের চেয়ে বাঙালী পরিবারের বাংলা পান সাজা ঢের ভাল। ছাঁচি পান খেতে পারি না।

সহরে প্রবেশ করবার এত খারাপ রাস্তা সভ্য জগতে কল্পনা করা যায় না, আরো খারাপ হয়েছে সারাতে গিয়ে। সংস্কারের অবস্থা কি সর্বক্ষেত্রেই এই রকম? যদি তাই হয়, তা হলে কয়েকদিনের মধ্যে আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারব মনে হয় না। কিংবা হয়ত কাশীর প্রতি অবিচার করছি। কাশী আরম্ভ হয় মোগলসরাই থেকে, আর সব চেয়ে বেশী উপভোগ করা যায় রেলের পুল থেকে। ঘাটে দাঁড়িয়ে এই পুলকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পুল থেকেই কাশীর সঙ্গে ভালবাসা হয়, প্রথম দর্শনেই। কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে দেখা হচ্ছে তার ওপর সৌন্দর্যানুভূতি নির্ভর করে না কি? কিন্তু উপভোগের সময় স্থানের কথা মনে

থাকে না।

মানুষ ভারি অকৃতজ্ঞ, নয় কি? নচেৎ কাশী চলে আসি? মাসীমা একরকম ভালই আছেন বলতে হবে। কিন্তু একেবারে বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন, সে শ্রী আর নেই! এক কালে মাসীমার রূপ ছিল, কিন্তু এখন দেখলে দুঃখ হয়। লাবণ্য পুঁছে গেছে, জড়তা আশ্রয় করেছে, শুখিয়ে গিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে মাসীমার চোখের সে জ্যোতি নেই, মরা গাছের মত চোখ, একটা বুড়োটে চশমা পরেন সুতো বেঁধে। তাঁকে নতুন চশমা পরতে, অন্তত ফ্রেমটাও বদলাতে বল্লাম, রাজী হলেন না। কিন্তু তাইতেই সেলাই করছেন, যখনই সময় পান তখনই পাড়ার কারুর না কারুর নাতিপুতির জন্য কাঁথা তৈরী করছেন। কাঁথা, পেনী ফ্রক নয়, বলেন নতুন কাট ছাট বুঝতে পারেন না, তাঁদের সময় ছিল এক জামা ও দোলাই, পরাতে বিড়ম্বনা হত না, এখন কোথা দিয়ে মাথা গলাতে হবে তাই মাথায় আসে না। মাসীমা পরের জন্য বরাবরই সর্বত্যাগী হতে পারতেন, কিন্তু এই বয়সে, কাশী বসে, সময় অসময়, পরের জন্য কাঁথা সেলাই!—এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। কাঁথা শুনলেই মনে হয় বৎসরে বৎসরে নিয়মিত সন্তানপ্রসব, শিশুমৃত্যু, অনশন, অনটন। কাঁথা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, ভারতবর্ষের সমগ্র দৈন্য ঐ কাঁথার প্রতি সেলাই-এ গাঁথা। অয়েলক্লথও জঘন্য। সস্তায় তোয়ালে পাওয়া যায় না?

কাল দুপুরে, দুপুর নয়, বেলা আড়াইটে তিনটে হবে, মাসীমা দ্বাদশ মন্দির সদলবলে প্রদক্ষিণ ক'রে স্নান ক'রে, স্বপাকে খেতেই বেলা দু'টো, কিছুতেই বামনী রাখবেন না, দেখি, মাসীমা রোয়াকে বসে খুব মন দিয়ে সূচে রাঙা সুতো পরিয়ে কাঁথার ফোঁড় তুলছেন। মনে হল যেন নিয়তি, মুখে কোন প্রকার ভাব নেই, আছে মাত্র একাগ্রতা, নীরবে নিজের কাজই ক'রে যাচ্ছেন, কোন শব্দ নেই, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। চিত্রের বিষয়। মনে হল, ভারতবর্ষে যতগুলো অপ্রয়োজনীয় শিশু মরে ততগুলি লাল সুতোর ফোঁড়। শিশুদের পিতামাতার বিবাহে নিয়তি আপত্তি করেনি কেন? বিবাহ ঘটিয়ে, জন্মের সুযোগ দিয়ে, মৃত্যুকে বরণ করা—এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বড় ভয় হল, মাসীমা চেয়ে দেখলেন, কিছুই বল্লেন না, নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন, সূচের মুখে রক্তমাখা সুতো। ভারি একলা মনে হল—মাসীমার জীবনে আমি অপ্রয়োজনীয় শিশু। মাসীমা আছেন—ভালমন্দের অতীতে বর্ত্তমান। অপ্রয়োজনীয়কে বর্জন করবার নামই কি সাধনা? ভূত ছাড়াবার মন্ত্র মাসীমার কাছে শিখতে হবে।

আমার খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হচ্ছে না। মুকুন্দ খুবই যত্ন করছে—তবে ডাকলে পাওয়া যায় না, কেবলই মাসীমার সঙ্গে মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে বেড়াকগে! আমার কাজই বা কি! মুকুন্দ অনেকদিন পরে অবসর পেলে। বামনটা ভাল, কাশীতে অনেক তরকারি পাওয়া যায়, শুনলাম শীতকালে বেগুন উঠবে—পাঁচ সের পর্যন্ত ওজনে! লোকটা রাঁধে চমৎকার। আপনি নেবেন ওকে। কুড়ি টাকায় রাজি হয়েছে।

নিজের কথাই সাত কাহন। আপনি কেমন আছেন, কি করছেন, কি ভাবছেন জানালে আমাকে কৃতজ্ঞ করা ছাড়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালনও হবে।

ইতি—খগেন্দ্রনাথ

পুঃ চিন্তামণিকে একবার আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবেন, বইগুলোতে উই ধরল কিনা দেখতে। কিছু নিমপাতা ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। যে চিঠিগুলো এসেছে এইখানেই পাঠিয়ে দেবেন। পোষ্ট অফিসে লিখে দিচ্ছি এবার থেকে এইখানে পাঠাতে। সুজনকে বলবেন পরে তাকে লিখব। আমার লাইব্রেরী থেকে সে বই নিতে পারে। আমার সিগারের বাক্স টেবিলে আছে, নষ্ট হয়ে যাবে, সিগারগুলো বই-এর তাকে ছড়িয়ে রাখলে পোকা ধরবে না। খঃ

মান্যবরেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যথাসময়ে উত্তর দিতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন আপনার যাবার দিন সকালে নানা কারণে বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আত্মীয়ার এমন কিছু হয়নি, তিনি ভালই আছেন। আপনার চিঠিপত্র ডাকযোগে পাঠাচ্ছি। মুকুন্দের লোক যথাসম্ভব বাড়ি রক্ষা করছে, কিন্তু ওপরের ঘর চাবিবন্ধ থাকার দরুণ পরিষ্কার হচ্ছে না। চাবি পেলে মধ্যে মধ্যে চিন্তামণি গিয়ে ঝাঁট দিয়ে আসবে—নিজে গিয়ে বইগুলি সাজিয়ে রাখব। তবে আমার সাজানো কি আপনার মনোমত হবে? শুনেছি আপনি অন্য কারুর বই কিংবা টেবল সাজিয়ে দেওয়া পছন্দ করেন না।

এখানকার খবর ভাল। বিজন ভাল আছে, সে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুজনকে আপনি ভাল বলেছেন খবরটি দিতে তাকে বড় ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু লোভ সম্বরণ করেছি। বাস্তবিকই সুজন খুব ভাল। তবে কেন ভাল আগে বুঝতে পারিনি তার মনে অনেক প্রশ্নই ওঠে, কিন্তু সে কোথা থেকে যেন আপনা হতেই উত্তর পায়। সুজন বিজনের পিসতুতো ভাই, ছেলেবেলা থেকেই মামার কাছে মানুষ

পিতৃমাতৃহীন, তার বাবা সন্ন্যাসী হয়ে যান শুনেছি, তার মাকে আমি দেখেছি, গারার আনন্দময়ী মা। সুজনের মামা সুজনকে বড় ভালবাসেন। বিজনই বাড়ির কর্তা, তার পরামর্শেই সংসার চলে, বিজনের মা নেই, কিন্তু সুজনের জন্য শৃঙ্খলার অভাব নেই। বিজনের বাবা বিজনকে সুজনের হাতে সঁপে দিয়েছেন, প্রায়ই তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বিজনের বাবা আমার বাবার বাল্যবন্ধু—সুজনকে আমি এইটুকু থেকে জানি। আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু নিজে মানে না, মানে বৃদ্ধ। তারও দুঃখ যে আপনার সঙ্গে তার ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি। এখন সে কি একটা লিখছে, তাই ব্যস্ত। তবে প্রায়ই এখানে আসে, আপনার কথা খুবই কয়।

বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' বেরিয়েছে, পড়েছেন? কেমন লাগল আমাকে যদি লেখেন তা হলে আমার উপকার হয়। সেই ভাবে আমি বুঝতে চেষ্টা করব। মাসীমার শরীর ভাল নয় জেনে দুঃখিত হলাম। এই বয়সে মানুষের মতিগতি ধর্মের দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। মুকুন্দ আপনাকে যত্ন করছে ও ঠাকুর ভাল রাঁধছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। কাশীর ঘাটে যখন বেড়াতে যান ভাবি, তখন সানাই শুনতে বড় ইচ্ছে হয়। গান ভালবাসি, কিন্তু ভাল করে শিখিনি, পর-তৃপ্তির জন্য শেখান হয়েছিল, পরতৃপ্তির জন্য গেয়েছি। কিন্তু আর শেখা হবে না। মাসীমার শরীর যদি এতই খারাপ হয় তা হলে একটা নিজের জন্য বাড়ি নিন না, লোকজনও সঙ্গে আছে। বলেন ত চিন্তামণিকে পাঠিয়ে দিই? অধিক আর কি লিখব? কোন প্রয়োজন হলে নিঃসঙ্কোচে লিখবেন, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো।

ইতি—রমলা

মাননীয়াসু,

আপনার চিঠি পেয়েই লিখতে বসেছি, ভাবছি আজ আর কোথাও বেড়াতে যাব না। গিয়ে কি হবে বলুন? সেই সব পেনসনভোগী বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল! তবে ঘাট আমাকে টানে, তার অসমতা, তার সনাতনত্ব, তার বৈচিত্র্য, তার অ-পার্থিব ইঙ্গিত আমাকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। ঘাটের ওপর সময়ের ছাপ, সভ্যতার পলি পড়েছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে বিরক্ত সন্ন্যাসী নয়, বিংশ শতাব্দীর বিরক্তিকর স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ, বিতাড়িতা বৃদ্ধা। মা অনেকক্ষণ মারা গিয়েছে, কচি ছেলে মরা মার কোলে শুয়ে দুধ খাচ্ছে। কি রকম গা ছম ছম করে ওঠে না?

এই ঘাটের ওপর যে 'ইতর' জনমানব নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তমনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা ইতিহাসের দান সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা অতীতের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কি রকম জানেন? অন্য উপমা দিচ্ছি, কারণ এঁদের শিশুর সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, ঘুণধরা, টোল খাওয়া, আড়ষ্ট স্বভাব শিশুর নয় নিশ্চয়। পোষ্যপুত্রের মতনই এঁরা অন্তঃসারশূন্য; পোষ্যপুত্র যেমন সম্পত্তি অর্জনের সাধনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন, এবং উদাসীন বলেই সম্পত্তি রক্ষা ও তার চেয়ে দরকারী কাজ সম্পত্তিবৃদ্ধি সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞানী হয় না, কাশীর ঘাটবিহারীরাও তেমনি। ইচ্ছে করে এদেরকে বলি, 'ওরে তোরা জানিস, কি ক'রে বুদ্ধদেব এইখানে প্রাণহীন ও প্রাণনাশী যাগযজ্ঞের বিপক্ষে মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেছিলেন? তোরা জানিস ভগবান বুদ্ধদেবের ভাষা? সে ভাষা সংস্কৃত নয়, অন্তরের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণেরই, সে অন্তর মহাকাব্য শুনতে তৎপর উৎসুক, উন্মুখ। তাঁরপর এই কাশীতে এলেন শঙ্কর হিন্দুধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। কি অদ্ভুত এই লোকটি! আর্যভূমি আর দাক্ষিণাত্যের পার্থক্য ঘুচে গেল, এখন গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরী অধিকার ক'রে মাদ্রাজীরা যেমন ভারতবর্ষের ঐক্য প্রচার করছেন তেমন ভাবে নয়, কেবল তেজ ও দুঃসাহসের জোরে। শঙ্করের মত অসীম সাহস কার? নেলসনের নাটকী সাহসের কথা শুনে হাসি পায়। জ্ঞানের সীমা নেই—উত্তর-ভারতী ও রাজা অমরকের গল্প সত্য নয়—জ্বলছে যেন একটা শিখা। তারপর কাশী মরেও মরেনি—মধ্যযুগের সব মহাত্মারই পদধূলি পড়েছে এই কাশীতে, এখানে এসে সকলেই কৃতার্থ হয়েছেন। বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙ্গে কেন আওরঙ্গজেবের মসজিদ হল বলুন? ঘাটের ভীড় দোষ দেবে আওরঙ্গজেবকে। কিন্তু তাঁর দোষে ধ্বজা ভাঙ্গেনি, তাঁর গুণে চূড়া উঠেছিল। লোকটাকে আমার বড় ভাল লাগে—তার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল, একাগ্রতা ছিল—যা ভাল বুঝত তাই করবার সাহস ছিল—আমার মত দুর্বল ছিল না। মানবেন না? কিন্তু চিঠি লিখতেন চমৎকার! সে যাই হোক, এই কাশীতে মধুসূদন সরস্বতী নামে এক মহাপণ্ডিত বাঙ্গালী থাকতেন—তখনও বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যোগান দেবার ভার নিয়েছিল। ইনি বুদ্ধি দিয়ে হিন্দু-ধর্মকে বাঁচাতে চান। আমি এঁকে টমাস অ্যাকোয়াইনাসের সঙ্গে তুলনা করি। তারপর সেদিন পর্যন্ত দয়ানন্দ, ভাস্করানন্দ এবং আমি যাঁকে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করি—সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীই এ যুগের এক-একমাত্র বৈদান্তিক! বেদান্তের চরম পরিণতি তাঁতেই পাই—reductio ad

absurdum ! অত স্থির, অত ঘন, অত গাঢ় চরিত্র কোথাও দেখি নি। কর্মবীর নন, মৌনী—ছুটো ভিন্ন থাকের চরিত্র—অবতার নন, যোগী। জনসাধারণ অবতার চায়, আমি চাই যোগীকে। যোগী অবতারের চেয়ে বড়, কর্ম লয় পেয়েছে যোগীতে, সেই জন্য যোগী নেমে এসে অবতার হন। যদি সন্ন্যাসী হতাম তা হলে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েই হতাম—যদি তিনি দীক্ষা দিতেন। এখনও কাশীতে হয়ত দু'একজন সাধু আছেন—তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়া শক্ত। কিন্তু এই জনতার মধ্যে আসবারই বা কি প্রয়োজন তাঁদের? হিমালয় কি লোকারণ্য হয়েছে? এলেনই যদি দেখা দেন না কেন? দেখা দিন আর নাই দিন, কাশীতেই হিন্দুসভ্যতার ধারাবাহিকতা অটুট আছে—তবে খুঁজতে হয়, যেমন আমি খুঁজছি। ইংরেজী সভ্যতা, দর্শন ও খবরের কাগজ একে ছুঁতে পারে নি। ধারাটি হল আত্মোপলব্ধির, যার উপায় বই পড়া নয়, সংসার ত্যাগ করা, সন্ন্যাসী হওয়া, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অন্তর্দৃষ্টির সাধনা। আমি বুদ্ধি দিয়ে এই অবস্থায় পৌঁছবার দুরাশা পোষণ করি। যেমন লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি পৌঁছেছিলেন। প্রমাণ তাঁর নোটবুকে। বইটা আমার ঘরে বাঁ দিকের শেলফের ওপর তাকে আছে, তারই পাশে ভ্যালেরীর বইটা আছে নেবেন, খুব ভাল লাগবে, আমি কি বলছি বিশদ করে তাইতে লেখা আছে। পড়বেন কিন্তু—চাবি পাঠাচ্ছি দিয়াশালাই-এর বাক্সে—'দুই বোন' এর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাবেন না।

'দুই বোন' পড়িনি, পড়ব বই-এর আকারে প্রকাশিত হলে। খাপছাড়া ক'রে পড়তে ইচ্ছে হয় না—চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়। রবিবাবুর লেখা কখনও ইচ্ছাপূরণ হিসেবে পড়বেন না। রবিঠাকুরের লেখা পড়বার সময় যদি কেউ টুঁ শব্দ করে আমার তাকে মারতে ইচ্ছে হয়। একবার আমি 'ঘরে-বাইরে' পড়ছি, বইটা আমার এত ভাল লাগে যে কাউকে পড়তে পর্যন্ত অনুরোধ করি না—পাছে ফাজলামি ক'রে দোষ দেখায়—সাবিত্রী ঘরে এসে বল্লে, 'আচ্ছা, আমি যদি মক্ষির মত অন্য কাউকে ভালবাসতাম, তুমি কি করতে?' শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ঘর থেকে বইখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাই—একেবারে শিবপুর। একবার ভারি মজা হয়েছিল—একজন বড় লোকের বাড়ি বৌভাত উপলক্ষে গান বাজনা হচ্ছে, ওস্তাদ হাম্বীরের চৌতাল—'ক্রোরা বখরা' গাইছেন, এমন সময় এক 'ফ.ড়' এসে জোড় হাত ক'রে বল্লেন, 'এইবার আজ্ঞা হয় উঠতে, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।' ওস্তাদজী কাঁধ থেকে তানপুরা এত জোরে মাটিতে রাখলেন যে লাউটা গেল ভেঙে। মেয়েরা ঐ রকম। তারা এমনি সব বোকা প্রশ্ন

ও আব্দার করে! তারা যখন নভেল পড়ে তখন ইচ্ছাপূরণের জন্য চরিত্রের সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিত করে। অবশ্য দুপুরবেলা ঘুম আনবার জন্যও নভেল পড়া পরিচিত ঔষধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমটাই বেশী সত্য, প্রমাণ এই যে পাঠিকারা নভেলে এমন সব ঘটনার বর্ণনা প্রত্যাশা করেন যেগুলি তাঁদের জীবনে ঘটেনি, অথচ তাঁদের বিশ্বাস ও ইচ্ছা যে সবই ঘটতে পারত। একটু অস্বাভাবিক রকমের কিছু ঘটনা তাঁরা সহ্য করতেই পারেন না। তাঁরা পূর্বপরিচিত চরিত্র ও ভাবের ভাবময়ী বর্ণনা কিংবা অল্পদূরপরাহত অথচ তাঁদেরই জীবনে খানিকটা সম্ভাব্য ঘটনার বিবৃতিই পছন্দ করেন। তাঁদের নভেল পড়ার অর্থ হল নভেলিষ্টের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গা, নভেলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন চালান, অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে। পাঠিকা, পাঠিকা কেন, অনেক পুরুষই, বিশেষত বিবাহিত পুরুষ পাঠকই এই প্রকারের পরাশ্রিত জীব। বিক্রি করবার জন্য লেখকরাও মেয়েলী মনোভাবকে রঞ্জন করে থাকেন। যাঁরা লেখেন না, তাঁরা বলেন 'আচ্ছা বেচারিরা রান্নাঘরেই সারাদিন থাকে, ছেলেপুলে মানুষ করতেই সময় চলে যায়, কি করবে!' আমি বলতে পারি কি করা উচিত। এঁদের পালে পার্বনে শাড়ি ও গহনা দেওয়া এবং মাসে একবার দুবার সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আবার অনেক সাহিত্য সমালোচক বলেন, 'নভেলের চরিত্র সম্বন্ধে মেয়েদের জ্ঞান পুরুষের চেয়ে বেশী সেই জন্য নাক-উঁচু নভেল এরা পছন্দ করেন না, আর তাই করেন, কারণ নভেলে গল্পাংশই প্রধান' মজা দেখুন, এঁরা উচ্ কপালে নন, অথচ জীবনে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটুক প্রত্যাশা করেন, জীবনে না ঘটলে নভেলিষ্ট কোথা থেকে আঁকবেন বলুন? মেয়েদের এই প্রকার চরিত্র-জ্ঞান, এবং সমালোচকবৃন্দের এই প্রকার সমালোচনাকে আমি সন্দেহের চক্ষে দেখি। একে মেরে ফেলা হল কেন? এর সঙ্গে ওর বিবাহ না হলেই হত, কিংবা হলে কি হত?—এই সব প্রশ্ন যে সব সমালোচক ও পাঠক তোলেন, তারা সাবিত্রীর সমগোত্রের। মেয়েরা যেমন—আপনি নন—পরান্নভোগী হয়েও বলে, 'আমার গাড়ী, আমার বাড়ি, আমার চাকর, আমার সব'—এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা-সমালোচকও তাই। এঁদের নিজেদের জীবন নেই, তাই নভেলের চরিত্রে আত্মনিবেদন ক'রে দেন, যেখানে দিতে পারেন না, সেইখানেই বলেন লেখার দোষ। পরান্নভোজী কৃমির দল! করেন পরের ধনে পোদ্দারী! নিজেদের জীবন যদি থাকত তবে বুঝতেন পরেরও অন্য ধরণের জীবন সম্ভব এবং আছে। নিজের জীবন না থাকলে, না তা জানলে পরের জীবন বোঝা যায় না, লেখা যায় না।

গানেও তাই হয়। গান-বাজনা শুনে বড় লোকদের পোলাও হজম হয়, তাই খাবার পর তাঁরা রেকর্ড রেডিও, নেহাত ভদ্রলোক হলে, ওস্তাদ বাঈ এর গান শোনেন। গান শুনে মরা ছেলে কিংবা বিলেত প্রবাসী প্রেমিকের কথা স্মরণ হতে দেখেননি? প্রথমটা সহ্য করতে পারি, কারণ নিজেরই লিভার খারাপ, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি না—বিলেত যাইনি বলে কি? একজন কথক রামায়ণ পাঠ করছিলেন, জানকীর দুঃখে শ্রোতারা কেঁদে আকুল, শ্রোতার মধ্যে একজন মুসলমান প্রজা ছিল, সেও কান্না সুরু করলে। জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কাঁদছিস কেন? তুই রামায়ণের কি জানিস? জানকীর দুঃখ তুই কি বুঝিস?' প্রজা বল্লে, 'বাবু ওদের জানি না, কিন্তু কথক ঠাকুরের মাথা নাড়া দেখে আমার সেই পুরানো রামছাগলের কথা মনে হচ্ছে—ওরে মটরুরে…কোথায় গেলিরে, বাপ!' কথক ঠাকুরের দাড়ি ছিল। মেয়েদের গান শোনা ও গাওয়া ঐ প্রকারেরই, সাহিত্যচর্চাও তাই, অনেক পুরুষদেরও। এ বিষয়ে দেশে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে সাম্য আছে—অন্ততঃ এই কারণে দেশের মেয়েরা পুরুষদের মতন ভোটের অধিকারী—।

এই দেখুন, কত লম্বা লেকচার দিলাম—অধ্যাপক না হয়েও! কেন জিজ্ঞাসা করলেন? আমাকে জানেন ত! আপনার সঙ্গে কথা বইতে ইচ্ছে হয়—কতদিন যেন কারুর মনের পরিচয় পাইনি। তাই এত কথা লিখলাম। আমি চাই সাহিত্য আলোচনায় গীতার নিষ্কাম-ধর্ম প্রয়োগ করতে। কারণ জীবনের সেইটাই বড় কথা, এবং আর্ট ও জীবন যুক্ত।

আপনি আমার সঙ্গে থাকলে সানাই-এর সুর কেন ভাল লাগছে বোঝাতে পারতাম না, সুরের নামই বলে দিতাম—তাতে কোন তৃপ্তি হত না। নাম জেনেই যে তৃপ্তি আসে সেটি সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ নয়, পূর্বপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের চকিত আনন্দ। গান কেন ভাল লাগছে বুঝতে ও বোঝাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বোঝবার জন্য কি পোড়াবার প্রয়োজন জানি না—বোধ হয় সাহিত্যপ্রীতি। শুদ্ধতা অর্জন ও উপভোগের জন্য চাই burning of the bush. মনের ওপর ভাষার আধিপত্য না সরালে সঙ্গীতের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সেই কথিত ভাষা ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে বোঝাবার? স্বীকার করি সেটা ব্যাখ্যার পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়, সে জন্য সুরের ভাষারই প্রয়োজন, অতএব সুরকে অব্যক্ত বলে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আপনার পাশে থেকে সানাই শুনলে সুর বেশী উপভোগ করতাম

—আপনি—আপনার কথা জানি না।

দেখুন একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়—আমরা বুঝি বাক্য দিয়ে, সেই জন্য প্রথমে ভাষায় প্রকাশ করা এবং বোঝা একবস্তু হয়ে ওঠে, অথচ প্রকাশের ভাষা একাধিক হতে পারে, অসভ্য জাতির অঙ্গসঞ্চালন থেকে সুরের রেশ পর্যন্ত। তার চেয়েও বিপদ আসে যখন ভাষাকেই সত্তা বিবেচনা করি। এর চেয়ে ভুল আর নেই। লোকে এতদূর পর্যন্ত বলতে সুরু করেছে যে যেটি প্রকাশিত হতে পারে মাত্র তারই আছে সত্তা! আমার কিন্তু সন্দেহ উঠেছে। বাক্যে সব ধরা পড়ে না—এবং সত্তা এবং প্রকাশ এক বস্তু নয়। অনেকটা 'আইস-বার্গে'র মতন, ভাষা কেবল ওপরের ভাসমান ও দৃশ্যমান অংশটুকু। চারভাগের তিন ভাগ থাকে নেপথ্যে। তাকে প্রকাশ করতে হয় সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে। সমগ্র এই কারণে যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৎসদৃশ ভাষাতিরিক্ত অবচেতনা ও উর্দ্ধচেতনা রয়েছে। ঠিক লোকের পাশে বসে গান বাজনা শুনলে অমনি বোঝা যায়, ব্যাখ্যার প্রয়োজনই হয় না।

কত বিপরীত মনোভাবের পরিচয় দিলাম! হোকগে! পরীক্ষা দিচ্ছি না, চিঠি লিখছি। চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই হাসবেন, মনে মনে বলবেন, 'ইনি আবার মৌনী হবেন! একবার উসকে দিলেই হল, অমনি রক্তপুঁজের স্রোত বইছে! ইনি আবার একলা থাকবেন, যিনি ছোট্ট চিঠির উত্তরে মহাভারত লেখেন!' কিন্তু সে জন্যও দায়ী আপনি। আপনি দেখছি তপোভঙ্গ করতে পারেন।

বই কষ্ট করে গোছাতে হবে না, চিন্তামণি মধ্যে মধ্যে গিয়ে ঝাঁট দিয়ে এলেই চলবে। চিন্তামণি এলে আপনার চলবে কি করে?

সুজনকে লিখব দু'দিন পরে। আমার বক্তব্য হল—গানই বলুন, মানুষই বলুন, আর সাহিত্যই বলুন, শুদ্ধভাবে গতি ও রূপটা লক্ষ্য করতে হয়, তারপর ব্যবহার যা হয় হোক—পরে, পূর্বে নয়। পূর্বের ব্যবহার কেবল অভ্যাস, সংস্কার, পুথি-পড়া মুখস্থ বিদ্যা। শুদ্ধভাবে দেখার অর্থ—বস্তুর সত্তা বোঝা—যেটি যা ঠিক তাইটি বোঝা—বোঝা নিজের সমগ্রতা দিয়ে। তা হলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপায় ঠিক করে নেবে। আমার উপায়ের প্রথম স্তর হল অবান্তর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। আপনার উপায় কি?

ছোট চিঠি দিলেন কেন? হাত বুঝি ব্যথা করে?

ইতি খগেন্দ্র

পুঃ—আলাদা বাড়ীর খোঁজ নিতে হবে দেখছি। মাসীমার কষ্ট হচ্ছে—অভ্যাস নেই অনেক দিন কি না।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

চিঠি ও চাবি পেয়েছি। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে সুজন বই পরিষ্কার ক'রে এসেছে। আপনি যখন পৃথক বাড়ী নেবেন ঠিকই করেছেন তখন আমার কিছু বলবার নেই। আমার কেবল ভয় হচ্ছে নতুন বাড়ীতে আপনার কষ্ট হবে। বাড়ীটা স্বাস্থ্যকর ত? শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবেন। আপনি অবান্তরকে দূরে রাখলেও অবান্তর ছুটে আসে।

আপনার চিঠির উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। সুজন বলছিল সব চিঠিরই জবাব যে দিতে হয় তাও নয়। আমি বিদুষী নই, যেমন পড়তে হয় পড়েছি। আমাদের বেলা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটি মাত্র মুহূর্তের সংস্রব—সারাজীবনের সংস্রব নেই। সেই অভাববোধেই নভেল পড়া, গান শোনা। নভেল পড়বার সময় কি মনে হয় বিশ্লেষণ ক'রে দেখিনি—কিন্তু আপনার চিঠি পাবার পর চিন্তা ক'রে দেখলাম, আমরা নভেল পড়ি নিজেদের জন্য, আমাদের অপুষ্ট জীবনকে বহাল করবার জন্য। নভেলই আমাদের জীবনের খোরাক। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, তবে আমার পরিচিতার মধ্যে অনেকেরই জীবনের সন্ধিস্থলে নভেলের নায়ক নায়িকা উপস্থিত হয়ে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন জানি। নভেল পড়ে একাধিক মেয়ের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে কেউ পড়েন ভাল বই, কেউ বা শিক্ষা সুবিধার অভাবে বটতলার! সুজন বলছিল—ইচ্ছাপূরণ ব্যাপারটাই যে খারাপ তা নয়, সদিচ্ছাপূরণের দোষ কোথায়?

গান শুনলে আমার সুর-ব্যতীত অন্য অ-বাস্তব আনন্দ আসে—তাকে তাড়াতে পারি না। আনন্দের মাত্রা কমাতে আমার মায়া হয়—যে কারণেই হোক মাত্রা বাড়ুক না কেন? আপনি যাকে শুদ্ধভাব বলেছেন সেটি ধারণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু আপনার চিঠি বোঝবার চেষ্টা করছি, পারছি না, কেবল ভেসে উঠছে আপনারই ভাবা, যেন আপনি মুখে বলছেন, আর আমি শুনছি। কথা কইবার সময় আপনার সর্বাঙ্গ চিন্তা করে, চোখ উজ্জ্বল হয়, মুখে অন্যভাব আসে। দেহটা আপনার তখন কোথায় কার সঙ্গে মিশে যায়, যে স্থান আপনার দেহ অধিকার করেছিল সেখানে থাকে কেবল দীপ্তি।

আপনি স্ত্রীজাতিকে অত ঘৃণা করেন জানতাম না। তারা আপনার কি করেছে? আপনার মত কে বুদ্ধিমতী হবে? কজন পুরুষেই বা হতে পারে? এই চিঠিটা লিখে আমার ভারি লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু এর বেশী ভাল যে লিখতে জানি না। ইচ্ছে করে আবার ছোট হয়ে যাই, আবার নতুন করে শিখি। কিন্তু সে হবার নয়।

আপনার নতুন বাড়ীর ঠিকানা পাঠাবেন। ভালই করেছেন নতুন বাড়ী নিয়ে। শরীরের যত্ন করবেন। চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

রমলা

পুঃ—বিজনের টাইফয়েড হয়েছে—সুজন খুব সেবা করছে, তার মামা বিদেশে। নার্স রাখা হয়েছে, আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। অতি অবশ্য, দুধ ও জল ফুটিয়ে, ছেঁকে, কর্পূর দিয়ে খাবেন। নিজে দেখে নেবেন, মুকুন্দকে বল্লে হবে না, সে বাসি জল খাওয়াবে আর বলবে গরম জল খাওয়াচ্ছি। তার চেয়ে এক ডজন সোডা কিনে রাখবেন—সোডা ভাঙার কল পাওয়া যায় নিশ্চয় কাশীতে। সামান্য অসুখ বিসুখ করলেও কলকাতায় চলে আসবেন। মাসীমাকে এই বয়সে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

পুঃ—হাত ব্যথা করে না, শক্তিহীন। সুজনকে লিখলেন না?

রমা

রমা দেবী,

আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি না! তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত বেশী প্রত্যাশা করি, পাইনা তাই ক্ষোভ হয়। ক্ষোভে রাগ, রাগে ঘৃণা। তা ছাড়া, স্ত্রীজাতি বলে কিছু জাতি নেই, স্ত্রীবিশেষ থাকতে পারে।

আজ ভারি ব্যস্ত, নতুন বাড়ী চুণকাম করতে দেরী হল—আজই উঠে যাচ্ছি। মাসীমা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন! সকাল থেকে কাঁদছেন—ভয় হচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে যাব। কাল পরশু একটু সৎসঙ্গ করেছিলাম, কোথা থেকে টের পেয়েছেন। কথক ঠাকুরের সঙ্গ নয়, একজন সত্যকার সাধুর। তাঁর কথা পরে লিখব।

আপনার চিঠি আমার ভাল লাগে। সোডা কিনব, কিন্তু বড় দম করে শব্দ হয়। একবার বোতল ফেটে ভীষণ কাণ্ড হয়, সেই থেকে কেমন ত্রাস হয়েছে। জল ফুটিয়ে কর্পূর দিয়ে খাচ্ছি।

বিজনের বাড়ী যাবেন, কিন্তু ইতিপূর্বে একটা ইনজেকসন নিলে হয় না? বিলি ভ্যাকসিন খাওয়াই ভাল, নচেৎ হাতে বড় ব্যথা হয়, জ্বরও হয়—একেই এত

ছোট্ট চিঠি। সুজন ছাড়া বিজনের অন্য কোন আত্মীয় নেই কি? বিজনের বাবাকে তার ক'রে দিন। এই রকম দেশী অভ্যাস আমার বড় খারাপ লাগে—পরিচিত ও আত্মীয়ের দ্বারা নার্সের কাজ করিয়ে নেওয়া। সাহেবরা এই বিষয়ে খুব ভাল—একেবারে বৈজ্ঞানিক—নিজেরাই হাসপাতালে চলে যায়, বীজাণু ছড়ায় না। আচ্ছা, আসি এখন? বাইরে টঙ্গা এসেছে। শুদ্ধ ভাব অর্জন করা শক্ত—। কাল সাধু মহারাজ বলেছিলেন গুরু ভিন্ন উপায় নেই। ইতি—খগেন

পুঃ—সত্যি আমার কথা শুনতে ভাল লাগে? না, সামাজিক ভদ্রতা করেছেন? আপনি এখন ফ্লোরেনস নাইটিঙ্গেল হয়েছেন, কিন্তু তিনিও লম্বা চিঠি লিখতেন।

খঃ

পূজনীয়েষু,

এ কদিন কোন সময় পাই নি—কাল চোদ্দ দিন কেটেছে, কোন উপসর্গ নেই। জ্বর কম। খাওয়া দাওয়া কেমন হচ্ছে? জল ছেঁকে নিতে হয়। শরীর ক্লান্ত। গুরু ভিন্ন উপায় নেই? বোধ হয় সত্য। রমা

রমা দেবী,

এই মাত্র আপনার কয়েক ছত্র চিঠি পেলাম। শরীর খারাপ হয়নি ত? ভাবনা হচ্ছে, পত্রপাঠ চিঠি লিখবেন কেমন আছেন। কাশী মোটেই ভাল লাগছে না। শরীরটা মস মস করছে, বোধহয় একটু জ্বর হবে। অ্যামন-কুইনিন খেয়েছি, ওতে আমার ভারি উপকার হয়। আপনি যদি জ্বর ক'রে বসেন তা হলেই বিপদ। যদি আমাকে অসুখ ক'রে কোলকাতায় যেতে হয় তখন দেখবে কে? কি স্বার্থপর আমি!

খগেন্দ্র

না হয় পত্রের উত্তরে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন। পরের সেবা আপনাদের নেশা। টেলিগ্রামের প্রয়োজন নেই যদি পত্রপাঠ উত্তর দেন। ভাবনা হচ্ছে।

খঃ

আপনার জ্বর শুনে টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল, কিন্তু নানা ভেবে চিন্তে করলাম না—আপনার বারণও ছিল।

এ চিঠিটা দেবার ইচ্ছা ছিল না। পড়ে ছিঁড়ে ফেলবেন। আপনি আমার শরীরের

অন্য ভাববেন না, আমারই কাছে তার কোন মূল্য নেই।

আপনি একবার শ্মশানে বুড়ো বটগাছ-ঠেশ-দেওয়া ভাঙ্গা মূর্তির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে পড়ে? উপমা উপযুক্ত হয়েছিল। একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে—আপনি কি জানতেন, গভীর রাতে এই বুড়ো বটগাছের সঙ্গে এই ভাঙ্গা-মূর্তির কি কথা হয়? ভরা দুপুরে যখন লাল মাঠের ওপর শুখনো হাওয়া চলে তখন তার মুখের পাথুরে হাসি মুখর হয়ে কোন দিগন্তে ভেসে যায়? আর যখন শবযাত্রীর সমাগম হয় সেই বটের ছায়াতলে তখন কি জানেন তার চোখের অবস্থা? সেই উষর ভূমিতে আর রোদ্দুর নেই, তার ওপর নেমেছে ঘোর অমাবস্যা। কিছুই আমার ভাল লাগছে না, বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। নিজেকে ফাঁকি দিতে পারছি না। এইত সেদিন অন্য ছিলাম—আমার সংযম ছিল। সুজন আসে—আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে, আর ভালবাসে—সাবিত্রীও ভালবাসত, আপনার ভাগ্য ভাল। এ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন। আমার ভয় করছে—কি হয়ে গেলাম। আপনাকে নীচু করব না, করব না, করব না। আপনি কোলকাতায় আসবেন না।

রমা

আমি কাশী ছেড়ে যাচ্ছি। বিশেষ প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে। প্রয়োজন কি জানবার জন্য খানকয়েক কাগজ পাঠালাম, ভিন্ন মোড়কে। আবোল-তাবোল যা মনে এসেছে তাই লিখেছি, নিজের কাছে লজ্জা কি? একবার লিখেছিলেন আমার কথা শুনতে ভাল লাগে, এগুলি প্রাণের মনের গোপন কথা। এদের সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর দেহে যেমন ওষধি জন্মায়, আপনার প্রাণ থেকে যেমন স্নেহ ঝরে, তেমনি এই ভাবগুলি আমার সমগ্র প্রাণ মনের সহজ ক্ষরণ। মস্তিষ্কের উল্লেখ করলাম না—কারণ শুষ্ক মস্তিষ্কের একাধিপত্য সহ্য করতে পারছি না! মন-প্রাণ দেহের অতিরিক্ত কিনা তাও জানিনা। একজন পুরুষের চেতনার ইতিহাস, কল্পনার স্রোত, কিংবা অনুভূত চিন্তা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের felt thoughts হিসেবে কাগজগুলো পড়বেন। আমার ডায়েরীর তারিখ নেই—আমার চেতনার অভিব্যক্তির পাঁজি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতার চেতনার ইতিহাসে।

ইতি—খগেন্দ্র

রমা দেবী,

অনেক দিন পূর্বেই এই চিঠিটা পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। আপনার শেষ চিঠি পাবার

পূর্বে আমার মনে বিস্তর সন্দেহ উঠেছিল। আমার মত যেন ওলট পালট হয়ে গেল। চিঠির জবাব আমি প্রত্যাশা করি না। কোথায় থাকব নিজেই জানি না, কতদিন থাকব তারও স্থিরতা নেই। মন বড়ই বিক্ষুব্ধ হয়েছে। দিন কয়েকের জন্য কোথা থেকে ঘুরে আসি, একজন সাধু আমার বন্ধু হয়েছেন, আধুনিক সাধু, অর্থাৎ ভ্রমণ বিলাসী, ফিয়লজিতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েও চাকরী পান নি। শান্তি না পাই চলে আসব। কিন্তু আসব কোথায়? দিন কয়েক পরে একবার কাশী আসব, কাশী ত্যাগ করলেও কাশী আসতে হবে, বাড়ী, মুকুন্দ ও আসবাবপত্রের জন্য।
আপনি বিপরীতধর্মী নন ত? সুজনকে জিজ্ঞাসা করবেন। পুরুষসিদ্ধিই একমাত্র শুদ্ধ প্রচেষ্টা। শুদ্ধ না হলে সিদ্ধি হয় না, শুদ্ধি ও সিদ্ধি একই প্রক্রিয়া। আপনি গুণবতী প্রকৃতিস্বরূপা—আমি আপনার অতিবিক্ত হতে চাই।
আমাকে পরীক্ষা করতে দিন। যেদিন উত্তীর্ণ হব, পুরুষ হব, সেই দিন নিজেই আপনার দ্বারে উপস্থিত হব, তখন আপনি কি হবেন? প্রকৃতি শুদ্ধা হয়ে নারী হয়—সামান্য হয়ে ওঠে বিশেষ। তবে কি উপায় আমি জানি না, নিজেই পন্থা আবিষ্কার করুন। ততদিন পৃথক। অসম্পূর্ণতার ডালি উপহার দিতে অনিচ্ছুক—পুরুষের কর্তব্য নয়, ব্যক্তির অধিকার নেই। আপন পায়ে হেঁটে যাব আপনার কাছে—চৌদোলায় নয়। না, আপনি আসবেন?
ক্ষমা করবেন। ভগবান মানি না—প্রমাণাভাবাৎ নয়, প্রয়োজনাভাবাৎ। তাই প্রার্থনা করতে পারি না। তবু বলি শুদ্ধ হয়ে শান্তি পান। আপনার শুদ্ধি আপনার হাতে। আত্মা এক নয়, বহু। ফুজিয়ামার ছবি দেখেছেন? কেমন নিরালম্ব! হিন্দু বিবাহের আদর্শ কি বলুন ত? খগেন্দ্রনাথ

৮

রমলা দেবী শেষ চিঠিটা পড়লেন। আয়না-টেবিলের ওপর মোড়কটা ছিল। চিঠির কয়েক ছত্র অস্থায়ীর মতন ঘুরে ফিরে মনে আসছিল—কাশী ছেড়ে যাচ্ছি, চিঠির জবাব প্রত্যাশা করি না, কোথায় থাকব নিজেই জানি না, কতদিন থাকব তারও স্থিরতা নেই। হাত কাঁপছিল, গলা আটকে গেল, রমলা দেবী বিছানায় বসে পড়লেন। শিশুরাই সন্ন্যাসী হতে যায়, সন্ন্যাসী হলে সাংসারিক নাম-ধাম কিছুই থাকে না—সন্ন্যাস এক বিরাট শূন্যতা; ভিক্ষে করতে হয়, বিশ্রাম নেই,

সারাদিন পায়ে হাঁটা, রোদ নেই বৃষ্টি নেই—নিজের চাবির ঠিকানা থাকে না, সোডার বোতল খোলার শব্দে ভয় হয়···পারবে না, পারবে না। 'আমি পায়ে হেঁটে যাব আপনার কাছে·· সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে ··' য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ছেলেরা আবৃত্তি করছে রবীন্দ্রনাথের অভিসার·· নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা · যৌবন না ভাঙা মূর্তি। রমলা দেবী বিছানা থেকে ধড় মড় ক'রে উঠে পড়লেন—আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ল, মোড়কটা তুলে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। এখন পড়া হবে না, গভীর রাতে, যখন মাত্র দুজন, রূঢ় ও কুতূহলী দিনের আলো যখন বড় বড় চোখ মেলে অভ্যের মতন চেয়ে থাকবে না। পায়ে কাঁটা ফুটলে সূচের ভয়ে যেমন অনেকে কাঁটা পুষে রাখে তেমনি রমলা দেবী ব্যথাকে ভয়ের দ্বারা স্থগিত রাখলেন। মোড়কটি খোলবার প্রবল ইচ্ছা হল। মুখে পাউডার দিয়ে, সামনের চুল গুছিয়ে চিন্তামণিকে গাড়ি আনতে বল্লেন। গলায় স্কার্ফ জড়ালেন--ইসাডোরা ডানকান মোটর চড়ে বেড়াতে যান, যাবার সময় ঝিকে বলে যান যে আর ফিরবেন না—সেই গাড়িতে স্কার্ফ জড়িয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 'চিন্তামণি, আজ খাব না', তোমরা খেয়ে নিও, বিজনবাবুর বাড়ি চল।' কেবল খাওয়া আর খাওয়া, রাস্তার দুপাশে খাবারেরই দোকান, দোকানে খাওয়া ভালগার ব্যাপার, বড় বড় বাড়ী, আকাশ আর মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, মোটরের ভিড়ে পায়ে হাটা বন্ধ হল, অভাব কমিয়ে বেশ আনন্দে থাকা চলে। পুরুষে পারে না, কষ্ট হয়, পা টনটন করে, ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি হয়, চোখ কবকর করে। চা-এর দোকানে 'গোকুলচন্দ্র' গানটা বাজছিল—'যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে', কোন দেশে? সেখানে পথে ধুলো, গাছের পাতা সবুজ নয়, নরুদ্দেশে। বিজনদের গলির মুখে গাড়ি থামতে রমলা দেবী ড্রাইভারকে সেখানে থাকতে বলে নিজে নেমে পড়লেন।

সুজনকে তার ঘরে না পেয়ে রমলা দেবী বিজনের ঘরে গেলেন। সে এখনও শুয়ে। জ্বর ছেড়েছে এই সেদিন। পূর্বদিকের ঘর, নানা রকমের খেলা জেতার চিহ্ন বর্তমান, ছবিগুলা সব টেনিস খেলোয়াড়ের—টিলডেন, কোসে, বোরোট্রা, লাকষ্ট, লাংলার। সব ছবিই ভঙ্গীর. টিলডেনের গড়ন বিশ্রী, লম্বা লম্বা হাত পা, মুখটাও তাই, সামঞ্জস্যের অভাব, মাস্টারনীর মতন।

'বিজন, তোমার টিলডেন মোটেই সুশ্রী নন।'

'তোমাদের কেবল ঐ এক আছে, কে সুশ্রী, আর কে বিশ্রী!'

'আমরা মুখে বলি, তোমরা কাজে দেখাও—নির্বাচন করে!'

'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।'

'খেলেই ঐ রকম চেহারা—বিশেষজ্ঞের মতন।'

'কিন্তু রমাদি, আমি হ'তে চাই বোরোট্রা—তার মতন খেলতে, তার মতন হাসতে, যেদিন পারব সেদিন সত্যি মানবজন্ম সার্থক হবে। কি ফুর্তি লোকটার, যেন elan vital রূপ নিয়েছে, আম্পায়ার পয়েন্ট দিলে, নিলেনা, আর, কেমন বেরে ক্যাপে মানিয়েছে—সমগ্র ফ্রান্স তার দিকে চেয়ে আছে, ভ্রূক্ষেপ নেই যেন ব্যাডম্যানের ভাই! রমাদি, একেই বলে যৌবন, একেই বলে প্রাণশক্তি। তা নয়, এদেশের লোকেরা যেন ঝিমুচ্ছে, আফিম খেয়ে খেলছে। কেবল পয়েন্ট পাবার চেষ্টা, লব্ আর লব্, সেলিমের মত খেলতে চাই না, অত বুদ্ধি চাইনা আমি। আফিম দেশ থেকে তুলে দিতে হবে—আমাদের ছেলেরা টেনিস কোর্টে নামে যেন ঘুম থেকে উঠেছেন। যেমন ছেলে দেশের, তেমনি মেয়ে,—লীলা কত ছোট্ট দেখেছ? তুমিও যেন কি হয়ে যাচ্ছ!'

'কিন্তু কোশে?'

'কোশের কথাই আলাদা—ও হল জিনিয়াস—না হলে সার্ভিস লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ সিংগলস্ খেলে, সেখান থেকে হাফ ভলিতে ড্রাইভ করে! ও একটা কল, অদ্ভুত কল, ভূতে পাওয়া কল, বোবো।'

'ওর খেলাই ভাল লেগেছিল সাউথ ক্লাবে।'

'ওঃ সে খেলা খেলাই নয়, কার সঙ্গে খেলবে? বেলে খেলা, কিন্তু তুমি যে বলছিলে অষ্টিনের খেলা আরো ভাল লাগে? ইতিমধ্যে মত বদলেছে তা হলে? অষ্টিনের কচি মুখ দেখে বুঝি মায়া হয়েছিল তখন? এখন সে মায়া কোথা গেল?'

'ভূতে পাওয়া লোকের খেলা ভাল লাগে, ছেলে মানুষের খেলা ভাল লাগে না। আচ্ছা, লাংলা কেন অত লাফায়? তোমার জেনী বেশ মরাল গমনে চলে।'

'আবার ঠাট্টা। কেবল ঐ কথা! অন্য কথা কইতেই জানেনা তোমরা? ফের যদি জেনীর নাম কর তাহলে আর—দেখবে মজা! আর খেতে ইচ্ছে হবে না।'

'বিজন, তোরা আজকাল হয়েছিস কি? মেয়েদের অত ঘৃণা করতে শিখলি কবে থেকে? অথচ…'

'যেদিন থেকে ভালবাসতে শিখেছি… তোমাকে, তোমাকে।'

'তা বোঝা গিয়েছে কত দরদ ভাই-এর!'

'কিসে বুঝলে?'

'অসুখের মধ্যে যার নাম করেছিলে তার মধ্যে র-ও নেই মা-ও নেই।'

'আবার! মাথা ধরবে।'

'ভালই হবে, দাদা ও দিদির আদর খাবে—কাকাবাবুকে ভাবিয়ে তুলবে—ম্যাচ খেলাও আর হবে না।'

'আচ্ছা, রমাদি, ম্যাচ খেলা হবেনা?'

'হবে, তাড়াতাড়ি সেরে নাও।'

'আমার গায়ে জোর এসেছে, রোজ যদি বেড়াতে পাই তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে যাব। আজ সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাবে ত?'

'সন্ধ্যাবেলা পারব না, এখনি চলনা, ঘুরে আসি। থাক, বোদ লাগবে।'

'না লাগবে না, আজ দু সপ্তাহ জ্বর ছেড়েছে, তবু রোদ লাগবে। আমি কি ননীর পুতুল যে গলে যাব? অত শীগ্‌গির আমাদের মাথা ধরেনা। এখুনি যাব। চল আমার র‍্যাকেট দুটো স্ট্রীং করাতে নিয়ে যাই, দেশী র‍্যাকেটে আর জীবনে খেলব না, স্ট্রীং করাতে গেলেই বেঁকে যায়। তোমরা যাই বল বিলিতী র‍্যাকেটের ওপোর নেই; স্বরাজ পেলেও আমি বিলিতী র‍্যাকেট খেলব। তার মেজাজই আলাদা, তাতে বল্ পড়লে লাফিয়ে ছুটে যায় আপনা হতে, দেশী র‍্যাকেট ও গাটের দোষ ঐখানে—ঠ্যালা মারলে তবে বল্ ছুটবে।'

'যে রকম বিলিতী জিনিষের গুণ গাইছিস তাতে বিলেত গেলে মেম বিয়ে করে আনবি দেখছি। এখানে থাকলে আংলো-ইণ্ডিয়ানই জুটবে।'

'বেশ ত ফিরিঙ্গীতে যত ভয় হয় যদি, বলছি ত, বাবাকে বুঝিয়ে বিলেত পাঠাওনা, এই বেলা যাওয়াই ভাল, ছেলেবেলা থেকে পড়লে, খেলতে পেলেই ত ভাল হবে। আচ্ছা ফ্লানেল ট্রাউজার্স ও ব্লেজার পরব?'

'এখন? লোকে হাসবে না? আচ্ছা পর, এই বয়সেই তোদের মানায়।'

'টেনিসের পোষাকই সব চেয়ে ভাল, গলা খোলা শার্ট, সাদা ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স, সবুজ কার্পেটের মত ঘাস—কালো লোকদেরও সুন্দর দেখায়।'

'সব লোকে পরে না কেন বলতে পারিস?'

'তা বুঝি জান না? এ যে কৌপীনের দেশ, সকলেই হবু-সন্ন্যাসী। তা ছাড়া সকলে কি টেনিস খেলতে পারে? টিলডেন বলেছেন, ক্ষমতাটা ঈশ্বরদত্ত, অবশ্য অভ্যাস চাই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস না করলে চলে না। এ দেশে কি করে ভাল খেলা সম্ভব বল? কেবল পড়া আর পড়া, জোর আড্ডা দেওয়া আর লম্বা চওড়া কথা কওয়া; ভাল ছেলের মানেই তাই, যে খেলে না, বই পড়ে আর মুখস্থ

বিষে আওড়াতে পারে। দেশের সর্বনাশ হল এদের জন্য।'
'যাবে ত চল, গাড়িটা মোড়ে আছে, ডাকি।'
'না ডাকতে হবে না, ওটুকু হাঁটতে পারব।'
'পারবে? হাঁটাই ভাল, ব্লেজার পরা ছেলের সঙ্গে আমার হাঁটতে ভালই লাগে। ব্লেজারটা পরে নাও, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'
'এই বল্লে রোদ্দুর লাগবে! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, উল্টা-পালটা কথা কইছ।'
মোটর যখন কলেজস্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে তখন একটা দোকানের সামনে রমলা দেবী গাড়ি থামাতে বল্লেন। ইকমিক্ কুকারের দোকান, রমলা দেবী একটি ছোট্ট কুকার কিনে গাড়িতে বসলেন। বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'এ আবার কি খেয়াল রমাদি, আমাকে রোগী বানিয়ে ছাড়বে দেখছি—আমার কুকারের রান্না পানসে লাগে।'
'তোমার জন্য নয় মশাই, অনেকের পানসে খেতে ভাল লাগে।'
'তাঁরা আলোচাল ঘি ও নিরামিষে অভ্যস্ত, মহাপুরুষ সব! খাব না।'
'খেয়ো না।'
'কাকে পাঠাবে?'
'আমার কে আছে যাকে পাঠাব?'
'কি জানি কোন ভাগ্যবান পাবে! তোমার ছেলেমানুষী বুঝতে আমার দেরী আছে। চল গঙ্গার ধারে যাই।'
গাড়ি চলল গঙ্গার দিকে। বহুবাজারের জনস্রোত পশ্চিম দিকে, ট্রামে ও পদব্রজে চলেছেন লালদিঘীর অফিস ভরাতে, চেয়ারের পিঠে কোট ঝোলাতে, অন্নের সংস্থান করতে। জনস্রোত আবার পাঁচটার পর থেকে পূর্ব দিকে ফিরবে। মানুষের জোয়ার ভাটা। ফেরবার সময় মুখে রোদ্দুর লাগে না এই যা, নচেৎ জঘন্য এই ভিড়ের টান। মুখে রোদ্দুর লাগলে এই সব মুখে কালসিটে পড়ত। গৌরবর্ণ যাঁরা তাঁরা তামাটে হতেন, সন্ন্যাসীদের মতন। জনস্রোতের প্রত্যেকেই কেমন সংসারী, পকেটে টিনের কৌটায় খাবার ও পান গৃহিনীরা ভরে দিয়েছেন, ফেরবার সময় সকলেই স্ত্রীপুত্রের জন্য কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যাবেন। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা।
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে রমলা দেবী বল্লেন, 'বিজন, একটা কাজ মনে পড়ে গেল, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তুমি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এস।' স্বরটা

এতই দৃঢ় যে বিজন আপত্তি করলে না। গাড়ি ফিরে রমলা দেবীকে নামিয়ে দিলে।

'রমাদি তোমার অসুখ করেছে ?'

'না।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।'

'বড গরম, বেলা হয়ে গিয়েছে, অফিসের লোকজন যাচ্ছিল দেখলে না ?'

'তাতে আর কি হয়েছে ? আমিও বাড়ি ফিরি।'

'তাই কেব, ব্লেজার পরে কষ্ট হচ্ছেনা ?'

'না, কেন ?'

'তোব গায়ে ব্লেজাব দেখে আমার গরম হচ্ছে। এ দেশে খালি গায়ে চলে। বিকেলে এস, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

'তুমিই এস না ?'

'বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।' গাড়ি বিজনকে পৌঁছতে গেল।

শোবার ঘরে ববাবর গিয়ে রমলা দেবী বিছানাব ওপর শুয়ে পড়লেন। পাখাটায় হাওয়া হয় না, মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল, মেন্থপিপেব কোণ রগে ও কপালে ঘষতে লাগলেন, কপাল থেকে সিঁথীতে, ধীবে থেকে জোরে ; সিঁথীর ধারে খুব ছোট্ট ছোট্ট চুল, আঙ্গুল দিয়ে বড চুল বিলি কাটতে লাগলেন। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, চোখ বুজে এল ঝাঁজে, ডান হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন, শাড়িটা দেহকে সম্পূর্ণ আবৃত করছে না মনে হওয়াতে বাঁ হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন। ঘডিতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল—মিষ্টি আওয়াজ, পর পর তিন পর্দায় বাঁধা, গির্জার ঘন্টাব মতন। ঘডিটা বিবাহের যৌতুক, বিজনেব বাবার। ডান হাত দিয়ে সিঁথীটা ঘষতে লাগলেন। মন্দিবে আবতির সময় শাঁক ঘণ্টা কাঁসর ঝাঁঝর বাজে, ছেলেবেলা মন্দ লাগত না, এখন মাথা ধরে, তবে মন্দ লাগে না। কবি লিখেছেন, জাপানী মন্দিবেব বাদ্যে শব্দের আভিজাত্য আছে, একলাই অবকাশকে পূর্ণ করে, সাহায্যের ভিখারী নয়, শুদ্ধ স্বর। জাপানের ফুজিয়ামার মতন। ওটা তাই লিখেছে। ছবিটা পরিচিত চীনে হোটেলে দেখেছেন, সমগ্র নিসর্গকে উচ্চ মস্তকে একাকী জয় করে আছে,—বাকী সব অবসর। ফুজিয়ামা ভাল, না গৌরীশৃঙ্গ, নন্দা, কাঞ্চনজঙ্ঘা ? আত্মীয়পরিবৃত হয়েই যাদের গৌরব ? খগেনবাবুর আদর্শ ফুজিয়ামা, তাঁর বিশ্বাস মানুষ পৃথক হয়ে জন্মায়, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি দূরত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল মানুষ কেন ? সুজন বলছিল বিজ্ঞানের মতে

অণু-পরমাণুর মধ্যেও দুরপনীয় অবসর। তবু পরমাণু মিলে অণু হচ্ছে ত! যদি সত্য হয়, তা হলে কি কষ্ট এই অনুভূতিতে, সারা জগৎ কাঁদছে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে, দুরত্ব ভাঙতে, কিন্তু পারছে না। এ কি বিরোধ! ইচ্ছার সঙ্গে নিয়মের। কিন্তু মিলতেই হবে—না হলে সমাজে বিবাহ হয় কেন? কি লিখেছেন, 'হিন্দু বিবাহের আদর্শ কি বলুন ত?' বিবাহের আর আদর্শ কি? ও ত আদেশ, হিন্দু বিবাহ বলে পৃথক কিছু আছে না কি? কে জা ন? যেখানে মিলনের কোন আকাঙ্খাই নেই, মিলন অসম্ভব, তার নামই হিন্দু-বিবাহ।
ইকমিক কুকারের ভাতে ফ্যান, মাগো, সে ফ্যান গলান গেল না, অথচ সব মেয়েরাই পারে, ডাল ভাতে ডালা হয়ে গিয়েছে—ডাল ভিজিয়ে বোধ হয় ভাতে দিতে হয়। একেবারে অকর্মার ধাড়ি! কি খেয়াল গেল! ছেলেমানুষী। হোকগে—বেশ না হয় ছেলেমানষীই করা গেল—অত পারা যায় না। কিন্তু খাওয়াও যায় না। 'চিন্তামণি এগুলো নিয়ে যাও, ফেলে দাওগে।' চিন্তামণি নিয়ে গেল, রমলা দেবী দু খানা বিস্কুট মার্মালেড মাখিয়ে খেলেন—কমলালেবুর রং, সন্ন্যাসীদের আলখাল্লার মতন। বড় ইচ্ছা হচ্ছিল মোড়কটা খুলতে। কিন্তু ভয় হল পাছে লেখা থাকে, পাছে লেখা থাকে আর আসবে না, কাশীতেও না, পাছে লেখা থাকে সেই তার উন্নতির অন্তরায়। দরকার নেই খুলে, রাত্রে পড়তে বে, যখন সব নিস্তব্ধ। বিজন আসবে বিকেলে। ড্রাইভারকে ডেকে তিনটের সময় বিজনকে আনতে হুকুম করলেন আর চিন্তামণিকে বল্লেন সাড়ে তিনটের চা-এর সরঞ্জাম রাখতে। দরজা বন্ধ ক'রে, সবুজ মেঝের ওপর শুয়ে পড়লেন।
ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আসবার পরই বিজনের আওয়াজ পেলেন, 'রমাদি, সুজনদাকে ধরে এনেছি।'
'তোমরা বোসো, আসছি।' বেশ পরিবর্তন ক'রে রমলা দেবী বসবার ঘরে এলেন। বিজন সুজন উঠে দাঁড়াল, রমলা দেবী হাসিমুখে বসতে ইঙ্গিত করলেন।
-রমাদি, এখন তুমি কেমন আছ? যে রকম গম্ভীর হয়ে আর রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরলে তাতে ভয় হয়ে গেল বুঝিবা অসুখ করেছে।
—কোন দিন অসুখ করতে দেখেছ?
—আমারও কোন দিন অসুখ করতে দেখেছ?
-তোমাতে আমাতে অনেক তফাত!
—তুমি সেবা করলে, আর আমি সেবা খেলাম—এই যা তফাত!
-প্রতিশোধ নিও।

সু—যদি আপনার অসুখ হয় বিজন বড়ই কৃতজ্ঞ হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে।

বি—না ঠাট্টা নয়, বলনা রমাদি, তোমার শরীর খারাপ হয়নি ত?

র—না গো বাবু নয়—দেখছিস না কেমন হৃষ্টপুষ্ট?

সু—চেহারা দেখে মনের অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে শক্ত।

র—আমার ভুল হয়েছিল, মনোবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা কইছি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার মানসিক অবস্থা মঙ্গল।

সু—মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।

র—ঘুম থেকে উঠলে অনেককে ঐ রকম খারাপ দেখায়। বেশ তর্ক করতে শিখেছ ত সুজন!

বি—শিখবে না, গুরু কে!

র—গুরু কে?

বি—জান না বুঝি!

সু—মনের খবর যখন পাওয়া যায় না তখন দৈহিক ইঙ্গিতের আশ্রয় খুঁজি, দৈহিক প্রক্রিয়ার সন্ধান যখন পাই না, তখন মানসিক বিশ্লেষণের সুবিধা চাই। দেহ ও মন বিচ্ছিন্ন নয়, বোঝবার জন্য যখন যা সুবিধা।

বি—সুজনদা, খগেনবাবুর মত হেঁয়ালী করে তর্ক কোরো না, চা খেতে এসেছ, গল্প কর, চা খাও।

র—বিজন, টেনিস খেলিস বুদ্ধির জোরে, না দেহের জোরে ও মনের জোরে?

বি—আমি তোমাদের সঙ্গে টেনিস আলোচনা করব না, জীবনে তোমরা র‍্যাকেট ধরনি তোমরা টেনিসের মর্ম কি বুঝবে? কোথায় গিয়ে তর্ক পৌছবে আমার জানা আছে, মেয়েরা তর্ক ঠেলে তোলে সেই প্রেমের কোঠায়। তোমরা তর্ক করতেই জান না।

র—এটা বুঝি নিজের কথা!

বি—বই-এর মুখস্থ বুলি খগেনবাবু ও তাঁর শিষ্য সুজনদার মত আওড়ানর অভ্যাস আমার নেই। আমি সাধারণ মানুষ, খাই দাই খেলাধুলো করি, ওয়েলস পড়ি, বাঁশি বাজাই, টেনিস খেলি—ব্যস। নিশ্চয়ই নিজের কথা। তুমি শুনেছ এ-কথা ইতিপূর্বে?

র—না!

বি—যে রকম ভাবে 'না' বল্লে তাতে মনে হয় হাঁ-ই বলা হল। তোমাদের ই

না, আর না-ই হল হাঁ, মাদ্রাজীদের ঘাড় নাড়ার মতন। একবার কি হয়েছিল জান রমা-দি! সাউথ ক্লাবে মাদ্রাজীরা খেলতে এসেছিল, চা-এ নিমন্ত্রণ করি। জিজ্ঞাসা করলাম, চা দেবো? কৃষ্ণস্বামী ঘাড় নাড়লে, আমি চা দিলাম না, সকলেই ঘাড় নাড়লে, আমি মহা অপ্রস্তুত, শরবত পাই কোথায়? লেমনেড আনালাম, প্রথম একজন বল্লেন, 'লেমনেড খাব না, চা খাব—' তারপর আর একজন, তার পর আরো একজন, চা দিলাম, লেমনেডগুলো 'বয়'রা খেলে। তখন বুঝলাম হাঁ মানে না, না মানে হাঁ।'

সু—সেই থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল যে মেয়েদের হাঁ মানে না, না মানে হাঁ। লজিকটা প্রত্যেক ছেলের পড়া উচিত, নচেৎ কথাবার্তার মধ্যে বালসুলভ চপলতা এসে পড়ে। অমৃতম্ খাবার লোভ নেই। রমলাদি, চা আনতে বলুন।

র—সু, তোমার বাড়াবাড়ি। ও কি মন্দ বলছে?

সু—রমলাদি, কেন কাঁদাচ্ছেন ওকে? আবার জ্বর আসবে।

বি—দ্যাখ সুজন দা, প্রতিজ্ঞা না রাখতে পার ভদ্রতা রাখ।

সু—মাপ কর ভাই, তোমাকে জ্বালাতন না করার প্রতিজ্ঞা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, আমার স্মৃতিশক্তি কমে আসছে।

বি—আরো বাজে বই পড়! কোন নতুন আইডিয়া মাথায় আসবে না—মাথা খারাপ হয়ে যাবে—খগেনবাবুর মতন।

র—সেইজন্য বুঝি পড়িস না?

বি—জীবনটাকেই বড় ক'রে দেখা আমার অভ্যাস।

সু—জীবন! অভ্যাস!

বি—ধর্ম।

সু—ধর্ম!

বি—যাই বল, জীবনটা আইডিয়া নিয়ে খেলা নয়, তার চেয়ে ঢের কঠিন কাজ।

সু—টেনিস খেলার মতন!

র—সু, চুপ কর না, বলতে দাওনা ওকে।

সু—চুপ করলাম, একদম চিত্তরহিত!

বি—সুজনদা, অমন গম্ভীর হোয়ো না, সহ্য করতে পারি না। চোখ কোঁচকাতেও শিখেছ দেখছি।

সু—এক রমাদির আদর খাওয়া ছাড়া আর কি সহ্য করতে পার?

র—হ্যাঁরে বিজন, আইডিয়া নিয়ে খেলা নয় কেনরে? আর এক টুকরো চিনি নে।

ব—আচ্ছা দাও, বলছি। কি জান, বই-এর পাতা উল্টে গেলাম, ইচ্ছে হল বন্ধ ক'রে দিলাম, ব্যস, চলে গেল আইডিয়া, আবার খুললাম—এল, আবার বন্ধ করলাম, ফিরে গেল ; কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে কোন ঘটনা বন্ধ করতে পার ? পার না, চলেছে ত চলেইছে, যেন একটা—একটা···

সু—লং র‍্যালী।

বি—কথা কওয়া আমার চলে না তোমাদের সঙ্গে।

সু—অন্তত ভাষার বৈচিত্র্য না অর্জন করা পর্যন্ত।

বি—তোমার গুরুও ত কথা কইতে কইতে আটকে যান—লাফিয়ে যান—Cataract of Lodor-এর মত।

সু—এই ত বিজন বেশ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে ! রমাদি ভুল বুঝো না ওকে—ও কবিতাটির আবৃত্তি শুনেছে ইনস্টিটিউটে। তা হলে বিজন, তোমার মত হল বই আর আইডিয়া একই বস্তু ?

বি—তুমিই তা হলে কথা কও।

র—সেই ভাল। সুজন তোমার কি মত ?

সু—'জীবন' সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই, বিজনের জীবন সম্বন্ধে আমার মতামত আছে, সেটা এতই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় যে তাকে বিশ্বাস বলতে কুণ্ঠিত হব না। আমার বিশ্বাস এইরূপ, জীবনকে সাউথ ক্লাবের বেড়ার বাইরে টেনে না আনলে সেই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ অর্বাচীনতার নামান্তর। অত বড় বিষয়ে কথাবার্তা কইবার ওর অধিকার আছে স্বীকার করি না। এও বলতে রাজি যে জীবন সম্বন্ধে ওর মতামত গড়ে ওঠেনি, কারণ, বেচারি সুযোগ পায় নি। ওর জীবন এখন টেনিস কোর্টের চুনের সমান্তরাল রেখার মধ্যে আবদ্ধ।

বি—দাদার অনেক সুযোগ হয়েছে জানি !

র—বড়াই না সুজন !

সু—আমি বিনয়ী। আপনি বলুন।

র—আমি অজ্ঞ, সত্যই জানি না দু'টো কালো পর্দার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ। এইবার তোমরা চা খাও। আজ নিজে ভাই কিছু তৈরী করতে পারিনি।

বি—ঐ দ্যাখ ! শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে ! তুমি ঢাকতে গেলে পারবে কেন আমার কাছে !

সু—মেয়েরা মনের কথা বিজনের কাছে গোপন রাখতে পারেন না। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। স্ত্রীজাতির মনের কথা ঢাকবার চেষ্টা হল ঢাকনা উত্তোলন করার নিমন্ত্রণ

মাত্র—এই হল বিজনের মত।

বি—আমার মতামত কি তোমাকে প্রকাশ করতে হবে না।

সু—ভুল বিচার করলে। প্রকাশ নয়, সুপ্রকাশ।

বি—সাহিত্যিক মশাই থামুন, কেবল কথার প্যাঁচ, খগেনবাবুর শিষ্য বটে! কি ক'রে হলে! তবু যদি বেশী আলাপ থাকত! মহাভারতের একলব্য বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন!

সু—রমাদি, বিজন শিশুদের মহাভারত পড়েছে।

চিন্তামণি চা ও খাবার নিয়ে এল। বিজনকে খানকয়েক বিস্কুট ও ফল দিয়ে রমলা দেবী বাকি খাবার সুজনের সামনে রাখলেন।

সু—নিজে কিছু খাবেন না?

র—না দেবীতে খেয়েছি। বিজন, চুপ করলে কেন? তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে!

সু—বাস্তবিক রমলাদি, ওর প্রাণময়তা সকলকে আচ্ছন্ন করে। কথাই হল ওর প্রাণ। কথার মধ্যে একটু অন্য কিছু মেশানো থাকলে মন্দ হত না। বলা বাহুল্য, আমি একটু ঘি-এর পক্ষপাতী।

বি—খগেনবাবুর মতন বুদ্ধিতে আমার কাজ নেই সুজনদা। কচকচানি প্যাঁচ কাটা আমার ধাতে বসে না। রস সব শুখিয়ে গেছে ভদ্রলোকের! যার স্ত্রী মরেছে মাত্র দুদিন আগে—মাপ কোরো তোমরা—সে কি করে তর্ক করে! বলবে তোমরা, চিন্তা যাঁরা করেন তাঁদের স্বভাবই ঐ। ও রকম thoughtful লোকের সংস্পর্শে নদীও শুখিয়ে যায়, সাবিত্রীদি ত কোন ছার! তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমাদের হীরোকে আমি নিন্দা করছি বলে। কিন্তু ও কী রকম চিন্তা, যার তাপে সব মুসড়ে পড়ে, নিজের রস, ভাবগুলো পর্যন্ত?

সু—চা দেব?

বি—না সুজনদা, তুমি বল। না হয় রমাদি তুমিই বল।

সু—আমি বলছি। খগেনবাবর চিন্তাগুলি সব এগিয়ে চলেছে, জীবনের সঙ্গে। তিনি সমগ্রভাবে চিন্তা করেন, দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে, চিন্তাব্যবসায়ীর মতন নয়। মস্তিষ্ক তাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত।

বি—অত বাজে কথা কন কেন?

সু—তোমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, তাঁর নিজের পক্ষে নয়। নিজে তাঁকে কতটা বোঝ এইটাই তোমার প্রশ্ন যদি হয়, তা হলে তার উত্তর সহজ—তোমার

নিজের সুরের ওপরই সেটা নির্ভর করবে। আর তিনি কি প্রকৃতির যদি বোধ করতে চাও, তা হলে উত্তর একটু কঠিন হবে।

বি—ধন্যবাদ! বুঝে কাজ নেই। চা খেতে এসেছি চা-ই খাই, তর্ক করব না। চুপ করলাম।

র—কটা বাজল?

বি—এখন যেতে বলছ?

র—না।

বি—দ্যাখ সুজনদা আমি তোমার শত উপদেশেও ঐ রকম অ-স্বাভাবিক ও আত্মম্ভরী হতে পারব না।

র—একটু ফল দেব?

বি—পারব না—মানুষের মধ্যে রস থাকা চাই, শুষ্ক কাষ্ঠ উনুনের প্রয়োজন। আমার মনে হয় খগেনবাবু কখনও সাবিত্রীদির সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসেন নি, সর্বদাই তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, নয় তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছেন। সর্বসাধারণকে তিনি দেখতে পারেন না—কেন না তাতে তাঁর দাম্ভিকতায় আঘাত পড়ে, ভাবেন—'হ্যাঁ! আমার সঙ্গে ওদের একমত! তার চেয়ে উল্‌টো কথা বলি।'

র—চা?

বি—দাও। ভাবছ, বোধ হয়, কবে দেখলাম! এই সেদিন আলাপ হয়েছিল।

র—কবে?

সু—আপনি যে দিন দমদমা যান সেই দিন সকালে। সন্ধ্যায় কাশী চলে গেলেন।

বি—একদিন গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কারুর যে মতামত আছে, কি থাকতে পারে বিশ্বাস করতে চান না। যে বই বলি ভাল লাগে, অমনি লেকচার দিয়ে প্রমাণ করেন বইটা খারাপ, যেই বলি নতুন ধরণের ছবি ভাল লাগে না, অমনি—সে সব কথা মনে নেই, যেই বল্লাম ডিমক্রেসী, অমনি বল্লেন, আন্ধারে ছেলে, যেই স্বাধীনতার কথা উঠল, অমনি বল্লেন, নিজের অতিরিক্ত কোন শক্তির বাধ্যতা স্বীকার করাই জগতের পক্ষে মঙ্গল, যেই সাম্য—অমনি, সাম্য নেই। আর মৈত্রীর বেলা তুমি রমাদি যদি একবার তাঁর মুখ দেখতে তা হলে না-হেসে থাকতে পারতে না—তর্ক. বুদ্ধি সব লোপ পেল—বল্লেন, মানুষ একলা, তবে চায় বন্ধুত্ব, একেবারে আমড়া-আমড়া·· এ লোকের ঐ রকম হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাকলে ভদ্রমহিলা পাগল হয়ে যেতেন। আমার তাঁকে বড় ভাল লাগত—এত

লক্ষীটি ধরণের! ভদ্রলোক বুঝি কাশী গেলেন। সুজনদার তাঁকে বড় ভাল লাগে, রমাদি।

র—তাই নাকি ভাই? সুজন ভারী দুষ্টু ছেলে, খুব বকে দেব ওকে।

বি—তোমার বকা আমি জানি—এই ধমকে এই মাপ চাওয়া—তাতে ছেলে খারাপ হয়।

র—ঠিক বলেছ বিজন—তাতে ছেলে আব্দেরে হয়। আচ্ছা বিজন, যে একলা থাকতে চায় সে বুঝি খারাপ লোক?

বি—নিশ্চয়ই, সে লোক স্বার্থপর, দাম্ভিক। এ জগতে মানুষ একলা থাকতে পারে না, মানুষ একলা থাকার জন্য জন্মায়নি। জগতে পার্টনার চাই।

সু—Mixed এ। বিজন খুব ভাল Mixed Doubles খেলতে পারে বুঝি জা নন না? পার্টনার সার্ভিসে ভুল করলেও বলে My fault। আর যদি ওর মিষ্টি Sorry শোনেন তা হলে অসম্ভব একেবারে সামলানো নিজেকে।

বি—আর বুঝি singles পারি না? এবার দেখো আদত খেলা ঐ।

সু—ছিঃ ছিঃ বিজন, ও খেলা খেলো না, জগতে কেউ singles খেলবার জন্য জন্মায়নি, যে খেলে সে স্বার্থপর, আত্মম্ভরী, অতএব খারাপ খেলোয়াড়।

বি—ঐ খানেই ভুল করলে, singles-এতেও অন্য একজনের সঙ্গে খেলতে হয়, তবে সে নেটের উল্টো দিকে থাকে। কখনও খেলনি, জানবে কোত্থেকে?

র—এ কোর্টে একলা ত?

বি—কৈ সুজনদা, একেবারে চুপ, উত্তর দাও।

সু—সময় পাচ্ছি কই? উত্তর দেওয়া অসম্ভব, অতএব অন্যায়, চল বেড়াতে যাই।

বি—রমাদিও চল, র‍্যাকেট সকালে আনা হয় নি।

সু—তোমরা যাও।

র—সুজনের কোথাও দরকার আছে না কি?

সু—না, অমনি, থাক।

বি—বলই না বাপু, ভারি গুজগুজে লোক! একেবারে খগেনবাবুর হাতঝাড়া আশীর্বাদ পেয়েছ!

র—কেন তখন থেকে বাজে কথা কইছ, বিজন?…কি দরকার আছে সুজন তোমার?

সু—বই-এর দোকানে, পরে হবে। চল বিজন, আগে টেনিসের দোকানেই যাই। তোর ঠাণ্ডা লাগবে না ত?

বি—লাগে লাগুক গে।

সু—মাফলার আন নি কেন? চল বাড়ি থেকে নিয়ে যাই। আচ্ছা, গিয়ে কাজ নেই, কোটের কলারটা উলটে নে। সত্যি, তোর আবার ম্যাচ খেলতে হবে, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবীদের হারাতে পারবি ত?

বি—না পারব না।

র—চল।

বিজন তাড়াতাড়ি নেমে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে এসে বসল দেখে সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'ওখানে কেন?'

'এখানেই ভাল, এঞ্জিনের তাপ পাওয়া যায়, হাওয়া লাগে না। তোমরা দুজন ভেতরেই বোসো না।' গাড়ি টেনিসের দোকানের সামনে এল। 'তোমাদের কষ্ট ক'রে নামতে হবে না' বলে বিজন একাই দোকানে গেল।

রমলা দেবী সুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে টেনিসের বই পাওয়া যায়? বেশ, তা হলে ওকে একটা singles খেলার বই কিনে দাও গে।'

'ও নেবে না, এখন।'

'তবে কাল কিনে দিও।'

'তাই ভাল।'

'তার চেয়ে চল এখনই যাই, তোমারও দরকার আছে ত?'

'পরে হবে।'

'এখনই চল না যাই। কি বই?'

'খগেনবাবু খান কয়েক বই পড়তে লিখেছেন।'

টেনিসব্যাট তৈরী হয়নি, বিজন দোকান থেকে ফিরে এসে বাড়ী যেতে চাইলে। রমলা দেবী সম্মতি দিলেন। সুজনও বাড়ীর সামনে এসে নেমে পড়ল, 'রমাদি, নামবেন?'

বিজন—আসা হোক না?

র—এখন আসা হবে না। সু, কাল আসবে?

বিজন চলে গেল দেখে রমলা দেবী বল্লেন, 'এস, কেমন? লক্ষ্মীটি।'

৯

রাত হয়েছে। চা-পার্টির সামান্য অবশিষ্ট কিছু মুখে দিয়ে রমলা দেবী শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। কথা কইতেই হয়, না হলে সামাজিকতা রক্ষা হয় না, সামাজিকতা বজায় রাখতেই হয়, নচেৎ একলা সারাক্ষণ থাকা যায় না। বিজন আর সুজন ভিন্ন প্রকৃতির, সুজনের সঙ্গে খগেনবাবুর কোথায় মিল আছে যেন, চিঠি লিখেছে·· ভাল, ভাল, ভাল সুজন ভাল, কম কথা কয়, জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করে। বিজনকে খোঁচানো উচিত হয়নি, ছেলেমানুষ, জীবনকে খেলা মনে করে, কিন্তু যারা বুঝেছে যে খেলা নয়, খেলা ছাড়া অন্য কাজ রয়েছে তারা খগেন বাবুর মতনই ব্যবহার করবে। মানুষের ধর্ম বুঝে তার সমালোচনা করা উচিত। বিজনের প্রাণ ছুটেছে অবাধ গতিতে, কোন বাধা নেই তার স্রোতের মুখে, তাই সে অনর্গল কথা কয়! খগেনবাবুর জীবনে বাধা পড়েছে অনেক, নিজের তৈরী বাধা হলে কি হয়! বাধা ত বটে, তাই তিনিও অনর্গল কথা কন। তবে ধ্বনি ভিন্ন প্রকারের, বিজনের হল ভরাই-এর নদীর, খগেনবাবুর হল পাগলা ঝোরার। বাধা তাঁর অন্তরের, বাইরের নয়, অন্তরের বাধাই বড়। পুরুষের কি মেয়েদের? বাধা কি কেবল সমাজের, অজ্ঞতার? সাধারণত তাই। মন ভোলানো কথা মেয়েদের সেই জন্য কইতেই হয়—কিন্তু বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না—বিজনকে ধমকানো উচিত।

রমলা দেবীর মনে খানিকটা শান্তি এল। ড্রয়ার থেকে মোড়কটি বার করলেন। একটি ছোট্ট কাঁচি দিয়ে সুতো ও বাইরের কাগজ কেটে টেবিলের ওপর গুছিয়ে তুলে রাখলেন। সুজনকে কি লিখেছেন?

কাশীর রাতে নিস্তব্ধতা নেই। লোকেরা নিশাচর। দিনে ধর্ম রাতে ভোগ। সহরের অস্ফুট ও অব্যক্ত স্বর কানে আসছে। ছেলে বয়সে একবার পাড়াগাঁয়ে যাই, দুপুর বেলা মাঠে পালিয়ে গিয়েছিলাম, খোলা ধূ ধূ করছে মাঠ, ফসল বোনা হয়েছে, মাটি পরিষ্কার ও নরম, তার ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল, শুয়ে পড়লাম, বোধ হয় ঘুম এসেছিল। তন্দ্রাবস্থায় মনে হল মাটির ভেতর থেকে কলরব উঠছে,

'জায়গা ছাড়, সরে যাও, ফুটতে দাও।' আমি লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যাই—সে আজ কতদিনের কথা। কাশীর অঙ্কুরিত বাসনা আলোর কপট ধর্মকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমার যৌবনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হল, কলরবের রেশ লেগেছে আমার মনে। বহু সাধনার মিথ্যা ভার আজ এই যাদুমন্ত্রে লঘু হয়ে গেল। আমার বাসনা হল উন্মুখ। কাশীর রাতের ভোগস্পৃহা আমাকে আক্রমণ করেছে। দিনের সাধনা, রাতের বাসনা, দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি, তমিস্রার দেহ—এই কি চিরন্তন বিরোধ? বিরোধের অতিরিক্ত কি কিছুই নেই? সামঞ্জস্য কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? এই দোলাতেই কি দুলবো সারাক্ষণ? সাধনা, আদর্শ, বুদ্ধির অত্যাচারে চিত্ত আমার জর্জরিত।

সাবিত্রী চেয়েছিল সামঞ্জস্য! আমার অন্তরে বিরোধ ছিল, তাকে সেই বিরোধের ক্লেশ ভোগ করতে আমন্ত্রণ করেছিলাম। সে কেন বুঝবে? তার ইতিহাস তারই। আমার আদর্শে তাকে গড়তে চাই নি, রমলা দেবী ভুল বুঝেছেন। বিরোধ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই তাকে বলেছিলাম, 'ওগো, একটু ভাগ নেবে?' হুকুম করেছিলাম সম্ভবত? সে ভাগ নিলে না। বাইরের বিরোধের বিপক্ষে সে আমাকে নিশ্চয় সাহায্য করত। কিন্তু সে বিরোধ ভয়ঙ্কর নয়, যুদ্ধের ভান মাত্র। রমলা দেবী আমার অন্তরের বিপ্লব বুঝেছেন। তাঁরও হৃদয় আগ্নেয়গিরির মতন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, কত নিরীহ; মুখ থেকে কেবল মাঝে মাঝে গরম ধোঁয়াই নির্গত হয়, তাতে আশ্রিত ব্যক্তির আতঙ্ক হয় না, বরঞ্চ উৎসাহ আসে। আমি ধোঁয়া দেখে বিরক্ত হতাম। কিন্তু আজ আমি বুঝছি। মনে ও দেহে কম্পন ধরেছে। রমলা দেবী আমার সমধর্মী। আমি তাইতেই সন্তুষ্ট।

রমলা দেবী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলেন……এইত, এইত সব বোঝে, ঠিক বোঝে, নির্ভুল। সমধর্মী যে সেইত সহধর্মিণী—কেন অসম্ভব, একবার সুবিধা আসুক! আশ্রয়? মিলবে না? খুব মিলবে।

ডায়েরীর পাতা আবার পড়তে লাগলেন।

নিজের মনের কথা প্রকাশ করবার ভাষা নেই, ভাবও বেশ সাজানো নয়, তবুও লিখতে বসি। যদি সাহিত্যিক হতাম সমালোচকে বলত, লেখ কেন? কিন্তু

রমলা দেবীকে বলেছি, ডায়েরী লিখব, চিঠি লিখব না। তা ছাড়া, অন্তরের ভাবগুলি আজ আমাকে বড়ই পীড়িত করছে, লিখলে খানিকটা শান্তি পাব। লেখা আমার পক্ষে আত্মসংস্কার, সান্ত্বনা, সোয়াস্তি। মনটা বড়ই ভারি ঠেকছে। আজ আমার জীবনের সব পড়াশুনা, সব চিন্তা নিতান্ত নিরর্থক মনে হচ্ছে। যেন সময় কাটাবার জন্যই সব কিছু করেছি, পড়েছি, ভেবেছি। যেমন রমলা দেবী ভদ্রতা রক্ষার জন্যই হেসেছেন, সেজেছেন, উপকার করেছেন। কিন্তু আজ আমার তাগিদ এসেছে। মনের কি প্রকার গঠন হলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ আপনা থেকেই অর্থযুক্ত হয়। আপনা থেকে হয় কি? বোধ হয়, না। সম্বন্ধই অর্থের উৎপত্তি। সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে হয় না। একের মধ্যে আবার সম্বন্ধ কি? প্রতিজ্ঞাপ্রমেয় নিয়ে যে সম্বন্ধ তার অর্থ তারই কাছে যার সে সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম না করলে চলছে না। আমার সমগ্রতার, আমার চাহিদার সম্পর্কেই সম্বন্ধ অর্থে ও তাৎপর্যে ভরে ওঠে। কেবল আমার কি? এক তরফা-সম্বন্ধ নেই, থাকলেও সে এক প্রকার দোবাত্মা? এতদিন আমার ধর্ম কি ছিল? মনগড়া একটা ধর্ম আমার ছিল নিশ্চয়ই, যদিও তার রূপ আমার কাছে প্রকট হয়নি। ধর্মের প্রয়োজন আমি চিরকালই মেনে এসেছি। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, সমাজকৃত নিয়মাবলীই স্বীকার করিনি। ভূতের ভয় থেকে যে ভগবৎবিশ্বাস তৈরী হয় তারও কোন প্রয়োজন হয়নি। ভাবতাম— আমি যেকালে বিচিত্র, আমার অভিজ্ঞতা যেকালে পরপর চলে আসছে, তখন সে বৈচিত্র্যের একটা মূলগত ঐক্য ও সূত্র থাকবেই থাকবে। অভিজ্ঞতার অন্তরে কিছু পাইনি বোধ হয়, তবু বুদ্ধির দ্বারা একটা ঐক্য সৃষ্টি করতে, একটা মালা সাজাতে গিয়েছি। অন্তরের সূত্র খুঁজে পাইনি, তাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি বুদ্ধির সূত্রে, তাকেই ধর্ম ভেবে এসেছি। যেটা ধারণ করে সেই ধর্ম। আমার সুতোয় সাবিত্রীকে বাঁধতে যাই, তাই সে বাঁধা পড়ল না, সুতো ছিল পলকা, ছিঁড়ে গেল। ভালই হল, রজ্জুতে সর্পভ্রম মায়ামাত্র; মায়া আমার গিয়েছে। কিন্তু জীবনের কোন কাজেই স্থিরসত্য ধারণাশক্তির চিহ্ন পাচ্ছি না। হঠাৎ বড়লোকের বাড়ীর নতুন বৌ-এর গায়ের গহনার মতনই আমার অভিজ্ঞতা আমাকে অসুন্দর ক'রে তুলেছে, আমার দেহকে গুরু করেছে। রমলা দেবীর অলঙ্কার রমলাকে সুন্দর করে, তার দেহ কেন এত লঘু এতদিনে বুঝেছি, না পেয়ে নয়, সুন্দর সামঞ্জস্যে। রমলার ধর্ম আছে, তার অভিজ্ঞতা উত্তমরূপেই ধৃত, তার পদক্ষেপ লঘু। অধার্মিকেরাই স্থূল হয়।

এমন সময় নিজের অতিরিক্তকে যদি জানতাম তা হলে পরিচিতের সম্পর্কে এসে

আমার ভার লাঘব হত, আমার জীবন অর্থপূর্ণ হত।

প্রেমে পড়লে এ-লোক কি করত? এই সব বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা মালায় গ্রথিত হত। রূপ থাকত, গন্ধ থাকত, প্রত্যেকটি ফুলের গন্ধে মনপ্রাণ পুলকিত হত, লাভের ওপর মালার রূপ মোহিত হত, ধারণ করে সুন্দর হত। এ লোক ভালবেসে জীবনকে বাংলা দেশের মন্দির ক'রে তুলত। ভারতীয় ললিতকলায় লতায়িত চম্পক-অঙ্গুলিকে অবলম্বন ক'রে অন্তরের সৌন্দর্য যেমন বিচ্ছুরিত হয় এবং অনন্ত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত হয়, তেমনি তাকে আশ্রয় করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যাহতশক্তি অন্তরের শক্তির আভাস দিত। এ-ব্যক্তি তাকে আপন করত প্রথমে, তারপর তাকে ছেড়ে দিত। তাকে অধীনে এনে স্বাধীন করত। স্বাধীন করত তাকে নিজের চেয়ে বড করে—আদর্শের বাইরে রেখে। এখন বুঝতে পেরেছি আদর্শ অনুযায়ী ভালবাসা পাপ, তাতে অন্যের জীবনকে অপমান করা হয় নিজের স্বার্থের জন্য, নিজেরও স্বার্থ সিদ্ধ হয় না। সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে—তবেই তাকে নিষ্কামভাবে—সে যা তাই হিসেবে পাব। আদর্শের কাঠামোতে মূর্তি গড়া একপ্রকারের কাম। সাবিত্রীর সম্পর্ক নিরর্থক, রমলা দেবীর সম্পর্ক সদর্থক? আমার জীবন শুদ্ধ হোক, শুদ্ধ হোক।

সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে, উঁচু হয়ে নয়, সে যা তাই হবে। আদর্শের মাপকাঠিতে সাবিত্রী কতটা নিচু তারই প্রমাণ খুঁজে এসেছি, পেয়ে এসেছি। মাপকাঠি ছিল বলেই না সুযোগ পেতাম! সাবিত্রীকে বড করতে গিয়েছিলাম ভালবেসে নয়, মাপকাঠি দিয়ে। মাপকাঠি দিয়ে মাপাই যায়, দীঘল করা যায় না। সাবিত্রীকে সার্থক করতে পারিনি—আমার আপসোস রাখবার জায়গা নেই।

বেদান্ত মানতে ইচ্ছা হয় না। সাধুজির উপদেশ, বই পড়া, সব ব্যর্থ হল। আমার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না।

ব্রহ্মই আছেন, আর কেউ ও কিছু নেই। আমার আত্মা কোথায় গেল? বৈদান্তিক সাধু বল্লেন, 'সোঽহংজ্ঞানী হও, তবেই তোমার আত্মার সার্থকতা।' কিন্তু অন্যের আত্মা কোথায় যাবে? তাকেও ঐ উপদেশ? এই সোঽহংজ্ঞানটি কি? অহংজ্ঞান লোপ পাওয়ান, এবং তারপর অব্যক্ত। চিত্রকর গাছের ওপর আলো পড়ছে আঁকবেন—তাঁকে করতে হবে নানাপ্রকৃতির সবুজের সমাবেশ—এই হল তাঁর সমস্যা। এখন আলোকতত্ত্বের অধ্যাপক এসে তাঁকে বল্লেন, 'সব

সবুজই এক শ্রেণীর, সব রং-ই এক জাতির কম্পন, কারণ সবুজ লাল, আলো উত্তাপ সবই কম্পন।' হয়ত খুব খাঁটি কথা—কিন্তু এই জ্ঞানার্জনের ফলে চিত্রকরের ছবি কি স্বতঃই অঙ্কিত হয়ে যায়? ফিকে সবুজ কি আপনা থেকে সোনালী-সবুজের কোলে এসে শুয়ে পড়ে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্থাপন যার সমস্যা—বেদান্ত চর্চাই যার উদ্দেশ্য নয়, যে জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে চায়, তার পক্ষে সোঽহংজ্ঞানী হওয়া একেবারে অসম্ভব। সম্বন্ধ ছেদ ক'রে সম্বন্ধস্থাপন করা অসম্ভব। সম্বন্ধকে মায়া কি সংস্কার বলে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কোন আর্টিষ্টই বেদান্ত গ্রহণ করতে পারে না। আর্টের প্রাণ হল সম্বন্ধস্থাপন। বেদান্তর দ্বারা আমার সাহায্য হবে না।

তার চেয়ে সাংখ্য সন্তোষজনক। বেদান্তকে সাহসের চূড়ান্ত মনে করতাম, কিন্তু মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া কি একপ্রকার কাপুরুষতা নয়? বেদান্তের ভিত্তি অস্বীকারে, তার পদ্ধতি নেতিবিচারে, অস্বীকারে সাহস কম, নেতিবিচারে বুদ্ধির সৃজনী শক্তির প্রযোগ কম। স্বীকারে, ইতি-বিচারে, সাহসের প্রয়োগ বেশী। স্বীকার করলেই বহুপুরুষ মানতে হয়। সাবিত্রীকে মানিনি—তার পক্ষে আমি ছিলাম বৈদান্তিক—আমার সোঽহংজ্ঞান ছিল স্বার্থপরতার নামান্তর, ছিলাম আমি Egotist—। কবি লিখেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়। আমি ভাবি—নেতিবিচারে, অস্বীকারে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়। বৈরাগ্য-সাধনের প্রয়োজন আছে, চিত্তশুদ্ধিতে। এই আমার ধর্ম। সাবিত্রী আর নেই, অতএব তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? সে এখন স্মৃতি—আমার স্মৃতি—নিজের সঙ্গে প্রেম করতে রাজি নই।

এবার যাকে ভালবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে কিছু দাবী না ক'রে। দাবী করলেই নিজের ক'রে নেওয়া হল। দাবী না ক'রে ভালবাসব। আমার ভালবাসার জোরেই সে নিজে থেকে পূর্ণ হবে। যতই পৃথক ক'রে ভালবাসব ততই সে আরো ভাল হয়ে যাবে, তার নাগাল পাব না, সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে, নচেৎ -আদর্শবাদ যান্ত্রিকতার মনভোলানো ছড়া মাত্র। সেকসপীয়র আঁকলেন হ্যামলেটের চরিত্র। কোন মন্ত্রবলে প্রথম দৃশ্যেই সে জীবন্ত হয়ে উঠল, তারপর, তার ওপর সেকসপীয়ারের কোন হাত রইল না, হ্যামলেট চলে গেল তার স্রষ্টার নাগালের বাইরে। কোন অনন্ত মুহূর্তে পুরুষস্ত্রীর মিলনে ডিম্ব সৃষ্টি হল, স্ত্রী মা হয়ে তাকে

প্রাণ দিলে, প্রসূত হয়ে প্রাণী ভিন্ন হল, কিন্তু তখনও সে প্রসূতির আশ্রিত। শিশু বড় হয়ে ভিন্ন মানুষ হল, ব্যক্তিত্ব অর্জন করলে। তখন কি এই যুবকের সমগ্র সত্তাকে সেই মুহূর্তের ক্ষণিক মিলনের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়? সে যে তখন পিতামাতার সম্বন্ধের চেয়েও বৃহৎ। হাইড্রজেনের দুই পরমাণু অক্সিজেনের একটির সঙ্গে মিশে জলবিন্দু, সেই জলবিন্দুর সমষ্টিতে মেঘ, তার ওপর আলোক-পাতে রামধনু, মেঘ থেকে বারিপাত, বারিপাতে ধরিত্রী শস্য-শ্যামলা। কোথায় পড়ে রইল পরমাণুর মিলন। এমনি ক'রে ভালবেসে আমার প্রেমাস্পদকে নতুনতর ক'রে তুলব। আমার প্রেম তার পরিণতির স্তব হবে, আমার সার্থকতা তার উন্নতির সোপান হবে? এ ভালবাসায় আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হল না, মমত্ব-বোধ লোপ পেল না, সমৃদ্ধতর হল। স্থানু নয়, চলিষ্ণু ভালবাসা, যেমন জীবন। এই হল আমার পুরুষসিদ্ধি।

রমলা দেবী বার বার পাতা কয়টি পড়লেন। তাঁর সর্বশরীর অবনত হল। এ কি লিখছেন। এতে লজ্জা দেওয়া হয়। সাবিত্রীর প্রতি খগেনবাবু কোন অন্যায় করেছেন রমলা দেবী মুখ ফুটে কাউকে কখন বলেন নি ত! হয়ত, ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। কে গুরু! কে শিক্ষা দিয়েছে? আমার বিশেষ অস্তিত্ব কিছুই নেই, সবটাই আমার ছায়া। আমি অতিরিক্ত হতে চাই না—চাই না, চাই না। একলা থাকতে বড় ভয় করছে, গা শিউরে উঠছে। শিশু যেমন মা-এর কোল ছাড়া থাকতে হলে হাত পা গুটিয়ে মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শোয়, রমলা দেবীও তেমনি বিছানার চাদর তুলে নিজেকে আবৃত করলেন, হাঁফ ধরল, গা হাত পা ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, গলা শুখিয়ে গেল। চাদরের মধ্যে শুয়ে ডায়েরীর পাতাগুলি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। বড় ভয় করছে, আশ্রয় চাই, আশ্রয় নেই, প্রশস্ত বুকের মধ্যে নীড় বাঁধা হল না, সেই সেদিন স্নানের ঘর থেকে বেরোবার সময় বুকটা চওড়া দেখাচ্ছিল, গেঞ্জী না দিলেই হত। গা'টা কেমন করে ওঠে ভাবতে গেলে, কিন্তু ভয় যায় কমে, সর্বাঙ্গ যায় শিথিল হয়ে, হাঁফ লাগে, তৃষ্ণা বাড়ে। রমলা দেবী চাদর থেকে মুখ বার করলেন, ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেলেন—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, পুঁছতে ইচ্ছে হল না, হাত বাড়িয়ে শিয়রের জানালা দিলেন খুলে, হাওয়া, শীতল হাওয়া এল ঘরের মধ্যে। শীতল মধুর আহ্বান এই জানালার। ডায়েরীর পাতা মুঠোর মধ্যে নিয়ে জানালার

ধারে এসে বসলেন। রাস্তার লোক চলাচল থামেনি, তবে ভিড় নেই, মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণের ভীষণ কর্কশ শব্দ নীরব অনুভূতিকে বিদীর্ণ ক'রে চলে যাচ্ছে ·· হুঙ্কার যাচ্ছে সরে সরে, পিছনের নিস্তব্ধতা দ্রুতভাবে সেই ফাঁক ভরে দিচ্ছে, জাহাজ চলার পর জলের ত্রিকোণ অবসর পূরণের মত ·দূরে, অন্ধকারের মধ্যে একটা নারকেল গাছ· না ছায়া? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে হয়, খানিক দূরে ছাতের ওপর একজন লোক পায়চারি করছে, ঐ বাড়ীতে অসুখ হয়েছে একটি মেয়ের, আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে · সুখ পেল না···আরও দূরে তেতলা বাড়িটার তিন চারটে ঘরে আলো জলছে, মেস বাড়ির ছেলেরা পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে, কপালে হাওয়া লেগে সোয়াস্তি হল। রমলা দেবী জানালা থেকে নেমে বসে ডায়েরীর নতুন পাতা পড়তে লাগলেন।

বই পড়তে ভাল লাগছে না। পাতা উলটে যাচ্ছি, কি ভীষণ নেশা মানুষের। আমি বই পড়ি কেন? একলা থাকতে পারি না বলে? রমলা পার্টিতে যায়, অন্যের সেবাশুশ্রূষা করে, বাড়িতে যুবকের দলকে নিমন্ত্রণ করে, একলা থাকতে পারে না বলে। আমিও লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, তাই লোকের লেখা পড়ি। একই কথা। লেখা ও মুখের ভাষা একই বস্তু, লেখা কেবল দ্বিতীয়বারের ছাঁকা ভাষা মাত্র। এই যে ডায়েরী লিখছি, এও নিজের মনের সঙ্গে আলাপ এক প্রকারের। রমলা বলেছিল, 'একবার দেখিয়ে দিন না কি ক'রে একলা থাকতে হয়।' চিঠি আমি আর লিখব না।
সামাজিক হাসির অন্তরালে কান্না রয়েছে। রমলা বাক্স গোছাতে বসে কাঁদছিল —কার জন্যে? সাবিত্রীর জন্য, না নিজের জন্য? নিজের জন্য এবং সাবিত্রীর জন্য। মানুষ কাজ করে একটা কারণে কি?···কিন্তু পাথরের মূর্তি কাঁদে যখন শ্মশানের হাওয়া খোলা ধূধূ করা মাঠের মধ্যে হুহু করে বইতে থাকে। কি ভীষণ শূন্যতা ওর বুকে!
আমার এক বোন একবার তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা বলেছিল! তার স্বামী মহা পণ্ডিত, পড়বার সময় তার স্বামীর মুখে দিব্যভাবের আবির্ভাব হত, সেই ভাবটি লক্ষ্য করবার জন্য সে পর্দার আড়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত, লক্ষ্য ক'রে সে গৃহকর্মে চলে যেত। সাবিত্রী কখনও অমন অপেক্ষা করেনি, রমলা কখনও করেছে না কি? আমি কিন্তু ভাবি—আজ যদি আমাকে গোপনে লক্ষ্য করবার কোন লোক থাকত, তা হলে হয়ত আমারও মুখে কোন অজানা

লোকের আলোক সম্পাত হত। বিশ্বরশ্মির দ্বারা বিকীর্ণ শক্তির আপেক্ষিক ক্ষতি-পূরণ হয় শুনেছি। কার কালো চোখের চাহনি আমার খরচের বিপক্ষে জমার হিসাব বাড়াবে? এমন ভিখারি মন নিয়ে কতদিন চালাব? কার গোপন চাহনির অপেক্ষায় নিজেকে নিঃশেষ করব? এই চিরন্তন প্রতীক্ষার শেষ কোথায়?

রমলা কাঁদে টের পেয়েছি। তাব অনেক দুঃখ। কিন্তু অন্যেও যে একলা ঘরে খাঁচায় পোরা হায়নার মত ঘুরে বেড়ায় সে কি জানে? বোধ হয় জানে। এ সম্ভাবনাই কি তার মনে উদয় হয়ে তার হৃদয়কে স্নেহশিক্ত করে? জানি না।

যে শূন্যতার বুকের মাঝে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করি সেটা কেবল অট্টহেসে আমাকে বিদ্রূপ করে। আশ্রয়বিহীন পাখীব মতন ঝড়ের মুখে ভেসে বেড়িয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি। আজ আমাব সকল অঙ্গ বিকল, মন কাজ করছে না, বুদ্ধি নিষ্প্রভ, চোখ নিস্তেজ, জড়ের মত শিথিল হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। অন্যের কাছে আমার এই অবস্থা কচি ছেলের নষ্টামিব মতন মনে হবে। হোক গে! স্বীকাবই কবছি -নিজেকে নিষ্ক্রিয় ক রে কারুব স্নেহের পাত্র, কারুর চাহনির বস্তু, কারুর মধুব ব্যগ্রতার বিষয়ে পরিণত করতে ইচ্ছে হচ্ছে—সাবিত্রী যেমন নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে ফুলশয্যার রাত্রে গৃহীত হবাব জন্য অপেক্ষা করেছিল।

দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীবে, গোপন সঞ্চারে—আমার প্রিয়াব মত তার নম্রগতি, দুঃখ নামে করুণাব মতন, আমার প্রিয়ার মত বিষাদমাখা স্মিতহাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন। যমুনাব কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে আজ আমাব মন সেই আনন্দে ভবে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল। তীব্র অনুভূতি নেই, আছে প্রবৃত্তিশূন্যতা। এতে শান্তি আছে, কি নেই, তার কোন অনুভব নেই, আছে কেবল বিস্তারিত সাধারণ অনুভূতি, যেটি ব্যক্তিসম্পর্করহিত বলেই অনির্দিষ্ট, কিন্তু অনির্দিষ্ট হলেও সত্য। কোন সূত্রের চারধারে এই সাধারণ অনুভূতি দানা বাঁধল? না · জানতে চাই না, ভয় করে, বিশেষেব চেয়ে সাধারণ সুখময় শান্তিদায়ক। দানা বাঁধলেই কামনা তীব্র হবে, আমার চিন্তা কেন্দ্রীভূত হবে, আমার গঠন বিন্যস্ত হবে, আমি কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হব। তখন তাকে সেই তীব্রতার মধ্যে এনে, সেই বিন্যাসের মধ্যে এনে, বিপর্যস্ত করব, তার সম্পূর্ণতা ও বিভিন্নতাকে ক্ষুণ্ণ করব। এ আমি চাই না, কিছুতেই চাই না। সাবিত্রীর শান্তি কেউ যেন না ভোগ করে। চিরকাল ভাসমান অবস্থায় যদি নাই থাকতে পারি, তবে যেন ডুবে যাই অতল তলে…।

আজ আমার জন্মদিন। এতদিনের হিসাবনিকাশ করা উচিত। কিন্তু ঔচিত্যজ্ঞান আমার নেই—আমার কাছে এতগুলো বৎসরের কোন মূল্য নেই। কালের ভাগ করা আমার ভাল লাগে না। কালবিভাগ সুবিধার জন্য। সুবিধাকে সুবিধা বিবেচনা করলেই তার প্রভাব কেটে যায়। জীবনটা চাকরী নয় যে পাঁচটা বাজবার জন্য, শনিবারের জন্য প্রাণ উৎসুক হয়ে উঠবে। ভাগ্যিস্ চাকরী করতে হয় নি। মৃত্যু সম্বন্ধে এত বেশী চিন্তিত নই যে মিনিটে ষাট মিনিট বেগে জীবন ছুটছে ভেবে প্রত্যেক মুহূর্তকে আঁকড়ে কামড়ে ধরে থাকব। এই ত সাবিত্রী মরে গেল, সত্য কথা বলতে কি—আমার জীবনের কি ভীষণ পরিবর্তন হল? কিছুই না—সূর্য রোজই উঠছে, রোজই অস্ত যাচ্ছে, কাশী চলে এলাম, এই মাত্র, এখানে মাসীমার পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, এইমাত্র, সাবিত্রী বেঁচে থাকলেও মাসীমা বৃদ্ধা হতেন। সাবিত্রীর মৃত্যুতে পৃথিবীর ব্যাস বেঁকে যায় নি। আমার ইচ্ছাশক্তিও এত প্রবল নয় যে জীবনের প্রত্যেক পল বিপলের মধ্যে একটা না একটা কর্তব্য পুরে দিয়ে সময়কে ভারি ও তার গতিকে রুদ্ধ করব। যাত্রাপথে লাগেজ বওয়া বোকামি। শরীর ও মন বড়ই অবসন্ন ঠেকছে।

আমার জীবনের ক্ষণগুলি রঙ্গমঞ্চের নর্তকীর মত লঘুপদে নাচে, ফ্যাকাসে তাদের রং, পাউডার মাখা তাদের মুখ, রাত্রি জাগরণে, অত্যাচারে, চিত্তশূন্যতায় তাদের চোখের কোলে কালিমা পড়েছে, কৃত্রিম তাদের আভা, তাদের নিজস্ব নেই, নৃত্যশিক্ষকের আদেশ অনুসারে ছক তৈরী করাই তাদের চরম স্বার্থকতা। এই আকস্মিকের ছক তৈরী করার নামই জীবন, আমার জীবন। তার মধ্যে রূপের ঐক্য নেই, মালার সাতত্য নেই, সুরের অবিচ্ছিন্নতা নেই। ঘটনাবলীর মধ্যে ফাঁকটাই আমার আজ চোখে পড়েছে। বই-এর প্রত্যেক পাতার সেলাই-এর গর্তটাই আমার কাছে আজ প্রধান।

আমার এই মনোভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে আশ্বস্ত হতে পারছি কই? আমার মনে দুটি বিপরীত ভাব একসঙ্গে কাজ করে, একটির গতি বিচ্ছিন্নতার দিকে, অন্যের গতি সম্পূর্ণতা ও ঐক্যের দিকে ঝোঁকে। কিছুতেই তাদের মেলাতে পারছি না। বুদ্ধি দিয়ে হয়ত খানিকটা পারি—যদি এই polarisation-কেই নিয়ম বলে গ্রহণ করি। কিন্তু সে গ্রহণ করা দায়ে পড়ে, আমাদের অজ্ঞানতা ও অক্ষমতাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা বুদ্ধির জুয়াচুরী ও কাপুরুষতা। যদি বলি বাঙময় জগতের ধর্ম এক, আর প্রাণময় জগতের ধর্ম ভিন্ন, তা হলে কেবল বাক্যই বলা হয়, দ্বন্দ্ব ঘুচল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য যদি পৃথকীকরণ হয়,

তা হলে বিরোধের অবসান তার সাহায্যে সাধিত হবার ভরসা নেই। কিন্তু বিরোধের দোটানায় আমার সকল শান্তি ঘুচে গিয়েছে।

আমার বিরোধটা কি? সাবিত্রী আমাকে সঙ্কুচিত ক'রে আনছিল, সে চাইত যে আমি কেবল স্বামী হয়েই থাকি, স্বামিত্বেই যেন আমি নিঃশেষিত হই। তা ছাড়া সমাজও তাকে সাহায্য করছিল। সাবিত্রী ও সমাজ আমাকে পিষে সামাজিক স্বামী ক'রে তুলছিল। দুই চাপের মাঝখানে আমি কর্মঠবৃত্তি অবলম্বন করলাম, আত্মরক্ষায় সচেতন হলাম। আমার অর্থকষ্ট ছিল না বলে সমাজকে অন্তত অবহেলা করতে পেরেছি, বিশেষ কোন শারীরিক কষ্ট-ভোগ করতে হয় নি। সাবিত্রীর তাগিদ ও চাহিদা থেকে উদ্ধার পেতাম বই-এর পাতায়। কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়। কিন্তু এধারে যে মানুষ ভুলতে চায় নিজেকে—নিজের সম্বন্ধে সবক্ষণ সচেতন থাকা হ্যামলেটিয়ানা, সুস্থতার চিহ্ন সেটা মোটেই নয়। লরেন্স ঠিকই বলেছেন। ঐ ছাখ, আবার লরেন্স! কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি! একধারে সংসাব, অন্যধারে সমাজ, দু'এর মধ্যে কি? আশ্রম। সাবিত্রী ও রমলাব মধ্যে সন্ন্যাসগ্রহণ?

বিবোধ অবসানেব আশায় যদি মানুষ আশ্রমবাসী হয় তা হলেও সে ভুল করে। আজ সকালে আমার এক অভিজ্ঞতা লাভ হল। সাধুজীর ভক্তদের মধ্যে দুটো দল, কেউ বলেন তিনি স্বয়ং ভগবান, কেউ বলেন অবতার। পাদোদক নিয়েই কেবল দলাদলি নেই দেখলাম। তা ছাড়া, সাধুজী এবং ভক্তবা আমার কাছে একটু বেশী মাত্রার চাঁদা প্রত্যাশা করেন। সাধুজী বলেন, বই পড়ে কি হবে? সাহেবেবা কিছুই জানে না। অথচ নিজে কিছুই পড়েন নি। আমাব বড সুখ্যাতি করেন, আমার সেবাধর্মের প্রয়োজন নেই, আমি তাব অনেক ওপরে, যে-বস্তু ইতিপূর্বে কেউ লক্ষ্য করেনি তিনি তাই আমাতে দেখেছেন, কপালে রাজটিকা, চোখে জ্যোতি। নতুন ভদ্রলোক দেখলেই বলেন যে আমি মস্ত জমিদার ও বিদ্বান। ভারী খারাপ লাগে, টান পড়ে আমাব গোটা কয়েক শেকড়ে। বিরোধ এখানেও। এ হল না—আর একটা আশ্রম দেখলে মন্দ হয় না। তাও পছন্দ না হয় বেরিয়ে পডব।

এই সেদিন মনে হল শান্তির সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সাহসভরে শান্তি গ্রহণ করতে পারলাম না। সাহসের অভাবই হল আমার প্রধান বিপত্তি, ভয়ই আমার প্রধান রিপু। সেই জন্য মনে হয় আমাব চবিত্রে কোথায় যেন পিউরিট্যানিজমের

আমেজ রয়েছে। কোন কাজকে নিষ্কাম ভাবে দেখতে পারি না, সব কাজকে আত্মোন্নতির ধাপ হিসেবে দেখি। আঁদ্রে জীদের gratuitous act-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে শক্ত—কিন্তু এটাও তাঁর নিজের গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া। ভয় করি সমাজকে—সেটা যদি বা পিতৃপুরুষের কৃপায় কাটিয়ে উঠলাম, অমনি অনাগতের ভয় এসে জুড়ে বসল। এর নামই নিজেকে ভয়, সাবিত্রী একাই ভীতু ছিল না, তাকেই বা দোষ দিই কেন? অনাগতের ভয়কে জয় করা যায় না—এই জন্যই বোধহয় রমলা দেবী ভাবেন যে আমি একলা থাকতে পারব না। এক এক সময় তাঁর কথায়, আচরণে মাতৃত্বের ভাব যে ফুটে ওঠে সেটা বোধহয় আমার ভীরু স্বভাব বুঝেই।

জীবনের ভয় বড় ভয়, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। প্রেমে যে বিরোধের অবসান সে অবসান আমার নয়।

একটা দিন-রাত শেষ হয়েছে। কালকের সঙ্গে আজকের কি তফাত? কিছুই নয়। নায়ক নায়িকার মনে দুঃখ এসেছে, অমনি সূর্য চন্দ্র তারকা পাণ্ডুর হয়ে গেল। সব কবিতা? মাথা খুঁড়ে মর, প্রকৃতির দুর্নিবারতা প্রতিহত হবে না। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন বই পড়লাম, বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বনিয়তির দ্বারা পরিচালিত। জন কয়েক অনিশ্চিত বিধি নিয়ে মাতামাতি করছিলেন, মাক্স প্লাঙ্ক গায়ে জল ঢেলে দিলেন, আমার প্রাণও অন্তত ঠাণ্ডা হল। জীববিজ্ঞানের নতুন বই পড়লাম—কোন recessive trait-ই দূর করা যায় না দেখলাম। যাবে না কেন, ত্রিশ চল্লিশ হাজার বছর পরে যাবে। কি আশ্চর্য! সন্ন্যাসীরাও ঐ সব বই ঘাঁটেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁদের মনের গঠন, সব তথ্যই যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করছে। অথচ একটাও করছে না। করুক আর নাই করুক, এটা ঠিক যে পুরুষকার নিয়তিকে কিছুতেই খণ্ডন করতে পারছে না। অখণ্ডনীয়তাকেও যদি গোড়া থেকে নিয়তি বলা হয়, তা হলেই 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' বলা চলে। কিন্তু প্রকৃতি আর নিয়তি ঠিক এক বস্তু কি? সাংখ্য এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেছে কি? বুঝতে পারলাম না। আমার দ্বারা সাংখ্যের সাধনা বোধ হয় অসম্ভব। বর্তমান সভ্যতার অকৃতজ্ঞ সন্তান হব কি ক'রে। কিন্তু দুঃখই বা হচ্ছে কেন? ভেবেছিলাম সাংখ্যই বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃত দর্শন। সাধুজীকে বললাম, আমার দ্বারা ওকাজ হবে না। তিনি বল্লেন, হবে।

প্রকৃতির অনিবার্যতা মেনেও শান্তি পাওয়া যায় না। জ্ঞানের দ্বারা নিয়তিকে

জয় করা যায় অনেকে বলেন—কিন্তু এ জয়ের পর মানুষ কি বেঁচে থাকে? এ যে আস্কুলামে পাইরাসের জয়! আমার অশান্তি বেড়েই চলেছে! শান্তি কোথায় মোর তরে হায়! কিন্তু বীণা বাজাবার জন্যও অশান্তির আঘাতকে বরণ করতে চাই না। বীণা যে শোনে তাঁর হয়ত তৃপ্তি আসে, কিন্তু এখানে আমিই যে বীণা। ভাঙ্গা বীণা খোলের মধ্যে লুকিয়ে থাক জড়ের মতন। তাও রাখতে পারি না।

সাধনার মাত্র তিনটি উপায় আছে—ধর্ম, বিজ্ঞান, আর্ট। প্রাণবাদীরা বলেন জীবনটাই সাধনা। অর্থাৎ তাঁদের মতে—প্রেম। কিন্তু প্রেমের পরিণতি জীবনের পরিণতিতে, অর্থাৎ মৃত্যুতে। বাকি থাকে, ধ্যান, আত্মস্থ হওয়া, খৃষ্টান মিষ্টিকদের মতে contemplation, meditation নয়। আমি তাকেই ধর্ম বলি। দর্শনালোচনা কথার মার প্যাঁচ।

ধর্ম সাধনা হল না, বিজ্ঞানের সোয়াস্তি নেই, প্রেম সেই বিবাহিত জীবন ত? আর না। অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন জীবনটাকেই আর্ট করে তুলতে। ড্যানানৎসিওর মতন হব নাকি। শুনেছি এ কাজটি নাকি ভারি শক্ত, তাজমহল রচনা করার চেয়েও কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। সব বাজে কথা।

আর্টের উপাদান জড়, রং তুলি অক্ষর স্বর পাথর কাগজ কলম, এবং মন, যেটি সাধারণ গুণ। জীবনের উপাদান ঘটনা, তাকে মন নিজ বশে আনবে কি ক'রে? ঘটনার নিজের অস্তিত্ব আছে, ইতিহাস আছে। কৈ আমি কি রমলা দেবীর মনে সুখ আনতে পারি, তাঁর সে-রাত্রির ইতিহাস পুঁছে দিতে পারি? ঘটনা স্থির নয়, ধরতে গেলেই গত। ভবিষ্যতের ওপরও হাত নেই। আর বর্তমান! পিচ্ছিল, specious, নেই বল্লেই চলে। এ উপাদান নিয়ে আর্ট হয় না। ঘটনাকে নির্বাচন করা চলে না, গায়ে পড়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করবেই করবে, কাশীর ঘাটে স্বাস্থ্যান্বেষীর মতন। জীবনকে আর্ট ক'রে তুলব ভেবে মৃত্যুকে বাদ দেওয়া যায় কি? রমলার ছেলে কেন মরে গেল? আবার, মৃত্যুকে সুন্দর ক'রে তুলব ভেবে জীবনকে তাচ্ছিল্য করা যায় কি? সাবিত্রীর স্মৃতি পূজা ক'রে আমার জীবনকে অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত করতে পারি না। সব ঘটনাই জীবনের ওপর দাগ কেটে যায়, সেই দাগগুলিই organic memory, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাদের বাচ বিচার নেই। স্মরণশক্তি যার প্রবল, স্নায়ু যার জীবন্ত, মস্তিষ্ক যার শ্রীক্ষেত্র, তার কি হবে? রমলা বলেছিলেন মেয়েদের

স্মরণশক্তি নেই। ভুল, না থাকলে সে স্বামীর ঘর করতে পারত, কিন্তু পারল না, স্মরণশক্তি আছে বৈকি? আমার আছে? নেই, নচেৎ সাবিত্রীর মৃত্যুর পর অন্য দশ জনে যেরূপ ব্যবহার করে সেরূপ করিনি ত! হয়ত, অন্য দশ জনের চেয়ে বেশী পরিমাণে আছে, তাই কাতর হই নি।

আমার জীবনের ঘটনারূপী উপাদান গোবাদের মতন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সজ্জিত নয়, ভাবি এলোমেলো, এ ওর ঘাড়ে পড়ছে। এমন কি এক সমতলেও দাঁড়িয়ে নেই নড়ে বেড়াচ্ছে এ প্লেন থেকে ও প্লেনে, অনেক সময় দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে, কখনও ব্যবহারের প্লেন, কখনও চিন্তার, কখনও ব—কার? আত্মার? জানি না। নাম দিতে ভয় হয়। এই জীবন। তাকে কি ক'রে, কার আদেশে সাজাব। এ কি অধ্যাপকের লেকচার নোট যে পর পর জল করে বুঝিয়ে বলাই তার চরম সার্থকতা।

এমন মানুষ আছেন যাঁদের স্বভাবই হল একবোখা। তাদের স্বভাবে মাত্র একটা প্রবৃত্তি সজোরে ফুটে ওঠে। এই জোরের জন্য তাদের অনেক অভিজ্ঞতা বাদ পড়ে। যেগুলি প্রধান প্রবৃত্তির অনুকূল সে গুলি তার দাসত্ব করে, তারই হুকুমে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তারই হুকুমে নির্বাচিত হয়। এই রকম একরোখা-ঝুঁকি মানুষ অনেকে আছেন—বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, ভট্টাচার্য মহাশয়রা। আমার সাধুজী ঐ ধরণের, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাকে সাংখ্যতত্ত্বের খপ্পরে তাঁর ফেলা চাই। অবশ্য এই সব ধর্ম-গোঁড়া, বিশেষজ্ঞ, দাবাখেলোখাড় প্রভৃতি জীবের প্রয়োজন আছে এ পৃথিবীতে। সবই তাঁদের সিসটেম, এবং সিসটেম না হলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশঙ্কাও বেড়ে চলেছে যে। ঐ প্রকার অদ্ভুত জীবের জীবনকে আর্ট বলা চলে কি? এই পিউরিটানের দল আবার জীবন ছাড়া অন্য আর্টের ভীষণ শত্রু।

যে মানুষ ঠুলিপরা বলদের মতন একই কেন্দ্রের চারপাশে জাবর কাটতে কাটতে, ঘুমুতে ঘুমুতে, ঘুরতে পারে, তাকে আমি মানুষ বলি না। জন্তুর গন্তব্য এক, অতএব গতিও সেই গন্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার গন্তব্যের কোন ঠিকানা নেই, মানুষের গন্তব্য একাধিক, একটি টানছে এধারে, অন্যটি টানছে ওধারে, বিপরীত দিকে, মধ্যে মধ্যে দিকনির্ণয়ই হয় না। এই শত শত টানের মধ্যে গোটাকয়েক অন্যের চেয়ে প্রবল, কেবল এই মাত্র চোখে পড়ে। যে ঘোড়া হাঁকায়, বলদ চালায় সে ইচ্ছা করে তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য আকর্ষণ থেকে তার চালিত জীবকে রক্ষা করে। একরোখা লোকের প্রবলতম

প্রবৃত্তি এইভাবে চালকের কাজ করে, তার সঙ্গে ঘোড়া ও বলদের পার্থক্য কম। আমার গুরু আমাকে বলদে পরিণত করতে চাইছেন, চোখে ঠুলি পরিয়েছেন, নিশ্চয়ই নিজের স্বার্থ আছে—শিষ্যের দল বাড়ানো। তাঁর সাংখ্যতত্ত্বের সাহায্যে অনেক তৈল সংগ্রহ হবে।

তারই বা দোষ কি? আমিই বা কি করেছিলাম! আমিও সাবিত্রীর চোখে আমার আদর্শের ঠুলি পরিয়েছিলাম—স্বার্থেরই জন্য। তবে, জানতাম না, জেনে-শুনে করিনি। আমার অন্যায় হয়েছিল।

রামপ্রসাদ বলেছেন—আমরা সকলেই বলদ আর জগন্মাতা কলু বিশেষ। এ তুলনা একালের কবিতায় অচল—এইটাই তার একমাত্র দোষ নয়। তুলনাটি সত্য, একরোখা পিওরিট্যানেরই পক্ষে, এই তার প্রধান গলদ। কিন্তু জগতে অন্য ধরণের মানুষ আছে—তাদের সংখ্যাই বেশী। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি আগ্রহ একদেশদর্শী নয়, সর্বতোমুখী। গ্যাসেট বিশেষজ্ঞদের অসভ্য বলেছেন—তাঁর মতে এঁরাই সভ্যতার অন্তরায়। আজকালকার যুগে অসাধারণ ব্যক্তিরা হলেন বৈজ্ঞানিক, তাঁরা নিয়তিবাদী—তাদেরও গোটাকয়েক অবাস্তব খেয়াল থাকে, ছয়টি রিপুর মধ্যে একটা না একটা থাকেই, তা ছাড়া হয় ভূতে না হয় ভগবানে বিশ্বাস রয়েছে। যে ষ্টেশন যত বড় তার সাইডিং তত বেশী। তাঁরা কী ভাবে সব শক্তিকে, সব আকর্ষণকে, সব আগ্রহকে সংযত করে আর্ট করে তুলবেন? তাঁদেরও একটা উদ্দেশ্য বলবতী থাকেই থাকে, কিন্তু অন্যগুলির সঙ্গে সেটির সমান সম্বন্ধ নেই বল্লেই হয়। নচেৎ মহ মহারথী বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলেই একেবারে ছেলেমানুষী করে ফেলেন কেন? তাঁদের জীবনও অত ছন্নছাড়া হয় কেন? অথচ তাঁদের বলাও চাই, জীবন ধারণ করাও চাই। আর্ট সামঞ্জস্যেরই প্রয়োজন, আগ্রহাতিশয্যের নয়। আর্টে কি হয়? নভেলে একটা মূলসূত্র, এবং তারই চারপাশে অনেক ছেড়া সুতো থাকে। কিন্তু প্রধান অংশের চারপাশে থেকেই তাদের সার্থকতা। আধুনিক নাটকেও তাই। অবশ্য আগেকার নাটকে ছেঁড়া সুতোর স্থান ছিল না। কারণ জীবন তখন অত বিচিত্র হয়ে ওঠে নি। আমাদের সঙ্গীতেও তাই। কাল সন্ধ্যায় সানাইএ চমৎকার পূরবী বাজছিল, কিন্তু সেটি পুরিয়া-ধানেশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবী থাকলে বুঝিয়ে দিতাম যে সবই শ্রীর ঘরে, পূরবী অঙ্গের —অর্থাৎ সকলেরই মধ্যে আছে কোমল রি, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, আর

বাকি স্বর শুদ্ধ—তবু পকড়ের জন্য, আরোহী অবরোহীর জন্য রূপের পার্থক্য ঘটছে। কীর্তন, ক্যাওয়াল, হার্মনিপ্রধান স্বরপদ্ধতিতেও তাই। মূল থীমের চার পাশে ছোট ছোট phrase ঘোরে ফেরে। আগে প্রধান অ-প্রধানের মধ্যেকার সম্বন্ধ ছিল ব্রাহ্মণ শূদ্রের, রাজা প্রজার মত স্থির ও পূর্ব হতেই নিয়ন্ত্রিত। তারই নাম unity of action। কিন্তু এ যুগের জীবন বিচিত্র, সমৃদ্ধ, তাই unity-র আজ কোন খাতির নেই। Counter point-এর মত প্রধান অ প্রধান জুড়ে যেতে পারে, এখনকার আর্টে সুতো জড়িয়ে গেলে সর্বনাশ হয় না, সমালোচকও বিচলিত হন না। সবটা মিলে একটা অখণ্ড কিছু উপভোগ্য হলেই হল, যেমন Joyce-এর Ulysses-এ হয়েছে। ব্রাদার্স ক্যারামাজভকে কেউ খারাপ নভেল বলতে পারে? জনসাধারণের উপদ্রবের তাৎপর্য এই। অপ্রধানের প্রয়োজন আছে।

অখণ্ড প্রকাণ্ড না হলেও চলে, তবে সুন্দর হওয়া চাই। তাই কি? সৌন্দর্যসৃষ্টিই আর্টের পরম উদ্দেশ্য কে বল্লে? যদি তাই হয়, তা হলে এই নতুন জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে সুন্দরের নতুন অর্থও ধারণা করতে হবে।

রাশিয়ান ফিলমবাজো নতুন পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। প্রথমে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির অনেকগুলি একই মনোভাব-ব্যঞ্জক ছবি তোলা হয়, তারপর ডিরেকটার বাহাদুর তার মধ্যে থেকে সব চেয়ে উপযুক্ত ছবিটি বেছে নেন। এইটুকু ছাড়া বাকি সব কাজই জনগণের। সিনেমাতে পরপর ছবি সাজান থাকে, কিন্তু তার পিছনে থাকে এই montage। আর্টিষ্টের মন সম্বন্ধ স্থাপন না ক'রে থাকতেই পারে না। রমলা ঠিক বুঝেছেন—সম্বন্ধ চাই। নচেৎ জীবনটা জীবনই হবে না। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ হতে চাই, কার্বনের চার হাত জোড়া চাই আমার।

অ-প্রধান সম্বন্ধে অচেতন কিংবা নিরাগ্রহ হওয়া চলে কি? চিত্রেও অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তরের প্রকাশ সম্ভব, সেই জন্য হয়ত বড় ছবি কিংবা ফ্রেসকোই বর্তমান সভ্যতার উপযুক্ত। অজন্তার গুহাগাত্রে নেই কি? বানর, সাপ, পাখী, নাচগান, মানুষ, দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, সব চলেছে, কিছুই বাদ পড়েনি—অথচ এঁকেছিলেন আশ্রমবাসী অবিবাহিত ভিক্ষু সম্প্রদায়। কেবল ভগবান বুদ্ধের জীবন কাহিনী চিত্রিত করলেই পারতেন ত! তা করেন নি—কারণ তখন জীবন ছিল।

টিনটরেটোর ক্রুসিফিকসনে নেই কি! অথচ সেটি জ্যামিতির কোন চিত্রের মতনই শুষ্ক কঠিন প্রাণহীন আড়ষ্ট নয়। কম্পোজিসন রয়েছে—কিন্তু চিত্রকর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন না। যীশু ক্রুশে ঝুলেছেন। তবুও জীবন থামে নি।

নিম্নাংশে বিস্তর লোকের ভিড়, তাদের কাছে ঘটনাটির তাৎপর্য গুরু নয়, নিতান্তই সাধারণ, এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে কর্তব্যের খাতিরেই এসেছে, তারা কাজই ক'রে যাচ্ছে, কাজও সব ছোট ছোট, মানুষ লটকাবার ছোট খাট কাজ। অত বড় ছবিতে কত না লোক, কিন্তু যীশুর জন্য তাদের মুখে কিংবা ভঙ্গীতে কোন দরদের চিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষ যেমন হয় চিত্রকর তাদের তেমনি এঁকেছেন—তাদের মুখের ভাবও সাধারণ। এই সত্যকার জীবনের প্রতীক। অ-প্রধান প্রধানের সম্বন্ধ নেই—অ-প্রধান, অ-প্রধান হয়েই প্রয়োজনীয়।

ক্রুসিফিকসন নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন। দুটি গল্প এখন স্মরণ হচ্ছে। একটির নাম দাঁত কনকনানি—লেখক বোধ হয় ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ, কি আঁদ্রিভ, দ্বিতীয়টি জুডিয়ার লাটসাহেব—লেখক আনাতোল ফ্রাঁনস, আমার প্রিয়। প্রথমটিতে লেখক দেখিয়েছেন যে দাঁত কনকনানির কাছে যীশুর মৃত্যুও তুচ্ছ। দ্বিতীয় গল্পটি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গল্প—তার শেষাংশে অনেকে সিনিসিজমের গন্ধ পেয়েছেন। পন্টিয়াস তাঁর বন্ধু ল্যামিয়ার সঙ্গে জুডিয়ার পুরানো কথা কইছেন, মেরী ম্যাডলিনের কামোত্তেজক মূর্তি বন্ধুর স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে, তিনি পন্টিয়াসকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, জীসাস বলে একটা লোক ছিল, তার দলে ঐ মেয়েটি ভিড়েছিল···সে লোকটা কোথায়?' পন্টিয়াস ভ্রূ কোঁচকালেন, স্মরণ করবার জন্য হাতটা কপালে ঠেকালেন, অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে বল্লেন, 'জীসাস, জীসাস, —ন্যাজারেথের জীসাস—কই, মনে পড়ছে না ত?' এইখানেই গল্পের শেষ। বর্তমান সভ্যতার আদি ও শ্রেষ্ঠ ঘটনার তাৎপয এতই ছোট একটি স্ত্রীলোকের স্মৃতির তুলনায়। শেষাংশের অন্য একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে। যে ঘটনাটি বর্তমান সভ্যতার তুলনায় অত মূল্যবান সেটি রোমান অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব সভ্যতার কাছে কতই তুচ্ছ। আনতোল ফ্রাঁন্‌স এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন।

গল্প দুটির টেকনিক হল এই—মূল্যবিচারের আপেক্ষিকতা প্রমাণের জন্য অপ্রধানের চোখ দিয়ে দেখিয়ে প্রধানের প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতির ফলে কিন্তু রসিক ব্যক্তিব কাছে প্রাধান্যটুকুই ধরা পড়ে, কারণ আনাতোল ফ্রাঁন্‌সের সমগ্র গল্পটি পড়তে পডতে রোমান সভ্যতার বিরাট ঐশ্বর্য ও বৈদগ্ধ্যে মন অভিভূত হয়ে পড়ে, এবং শেষে খৃষ্টের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা বোঝা যায়, পাঠকেরও শ্রদ্ধা বাড়ে। একজন ব্যক্তি যে-শক্তির জোরে অত বড় সভ্যতাকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিল সেই শক্তির কথা ভাবতে ভাবতে তার প্রতি শ্রদ্ধায় মন প্রাণ অবনত হয়। মূল্যনির্ধারণের এও একটি চমৎকার পদ্ধতি—আর্টিষ্টের

কাছে। আধারের দিক থেকে তাৎপর্য বুঝতে হয়। লিখনভঙ্গীর সাহায্যে ক্ষুদ্র আধার কিংবা উপহাস বৃহৎ তত্ত্ব বহন করতে পারে। অবশ্য আধারটির এবং উপহাসটির double reflection দেবার ক্ষমতা দেখান চাই। ছোট বড়র এই সম্বন্ধ, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের এই সমাবেশ স্থাপিত ও সাধিত হতে পারে তখনই যখন লেখক ঘটনা পারম্পর্যের বাইরে দাঁড়াতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমান বড়ই পিচ্ছিল, দোটানার মধ্যে পড়লে স্থিরবুদ্ধি রাখা বড়ই মুস্কিল। আর্টিষ্টের নিরাগ্রহ অবস্থা সাধনালব্ধ। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাগ্রহতা, negative capability ঔৎসুক্যবিহীনতা ইচ্ছাকৃত জড়তারই নামান্তর। অতএব আর্টের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অর্থও যা ধর্মের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষার অর্থও তাই! ধর্মের নিষ্কাম সাধনা আর্টের নিরাগ্রহ উপহাস।

সম্বন্ধ, অর্থাৎ বড় ছোট'র, প্রয়োজনীয় অ-প্রয়োজনীয়ের আত্মীয়তার স্বরূপ না নির্ণয় করতে পারলে সাধনার কোন অর্থই থাকে না। আমি সেই অর্থ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। এক এক সময় সন্দেহ হচ্ছে আর্টেই অর্থের সন্ধান পাব। মনঃস্থির করতে পারছি না। টিনটরেটোর ছবিটা আজ ভাল করে দেখলাম—কাল কি লিখেছি আবার পড়লাম। একটা নতুন কথা মনে উঠছে।
বেশ বুঝতে পারছি যে টিনটরেটোর অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল—দর্শকবৃন্দের দৃষ্টির সামনে ছবিখানি রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। ছবিতে আপামর সাধারণের ওপর এক স্বর্গীয় আলো পড়েছে, গতি দেখে মনে হয় যেন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এক স্বর্গীয় মলয় বইছে, হাওয়া আসছে ওপর থেকে। সমগ্র দৃশ্যটা যেন আলো ও হাওয়ায় ভাসছে। ছবির নিম্নাংশই পার্থিব দৈনন্দিন ঘটনার পটভূমি। এই মুক্ত হাওয়া ও আলোর যথাযথ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য হিসেবে ছবিটা দেখলে দম বন্ধ হয়ে আসে। আনাতোল ফ্রাঁন্সের গল্পেও ঐ রকম খোলা হাওয়া ও আলোর সন্ধান পেয়েছি। এই স্বর্গীয় আলো-হাওয়াই নিম্নাংশের ছোট খাট অ-সম্বন্ধ ঘটনাবেশকে জীবন্ত করছে। এখানেই আর্টিষ্টের নিরপেক্ষতা। খৃষ্টান মিষ্টিক একেই গ্রেস বলেন। টিনটরেটোর ছবিটায়, আনাতোল ফ্রাঁন্সের গল্পের আলোক-সম্পাতে, হাওয়ার খেলায় যেমন ছোট-বড় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ ও যুক্ত ঘটনা একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে, তেমনি হয়ত ভগবানের অনুকম্পায় কোন ব্যক্তি অথবা ভক্তের জীবনের ঘটনাবলী সুসজ্জিত সুসম্বদ্ধ ও অর্থপূর্ণ হতে পারে। তখন বনফুল হয়ে ওঠে মালা।

টিনটরেটো ছিলেন ধার্মিক ও খৃষ্টান, আনাতোল ফ্রান্স্ ল্যাটিন সভ্যতা এবং ক্যাথলিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আমার শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন। ওপর থেকে কৃপাবৃষ্টি চাতকেই প্রত্যাশা করে। তার চেয়ে যে গুণ পনটিয়াস পাইলেটের চরিত্রে ফুটে উঠেছে তাতেই আমি মুগ্ধ। খৃষ্ট জন্মাবার সময় গ্রীক দর্শন ও পূর্বাঞ্চলের প্রভাবে রোমান সভ্যতার কাঠিন্য মোলায়েম ও মৃদু হয়ে আসছিল। আগেকার রুক্ষতা নতুন সভ্যতার পালিশে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাত্র। ভেতরে ঋজুতা রইল, বাইরে এল ভদ্রতা, চারপাশে আলো, বাতাস, ওপরে মুক্ত আকাশ, আপনাতেই সম্পূর্ণ। এই উজ্জ্বল কঠিন আবরণ ভেদ করবার ক্ষমতা কোন ধর্মের ছিল না। রোমান সভ্যতার নিজের মধ্যে দুর্বলতা না এলে খৃষ্টান ধর্মের প্রসার অন্য দিকে হোত। এই সন্ধিক্ষণে গ্রীক, রোমান ও পূর্বাঞ্চলের সভ্যতার সংযোগে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হল তারই চরম বিকাশ ঐ পন্টিয়াসে। আমার ঐ রকম চরিত্র বড় ভাল লাগে। এই হল সত্যকারের grace। সুষ্ঠুতা, শালীনতা, মাধুর্য, আলোর প্রতি উন্মুখতা, আকাশে বাতাসে ধন্য হবার ব্যাকুলতা, ভবিষ্যতের ক্রমপর্যায়ে মুক্তির আকাঙ্খা—এই সমাবেশে সৃষ্ট মন যে আলো বিকিরণ করে তার দীপ্তি তীব্র নয়। রমলা কি এই আলো আমার মুখে দেখেছেন? আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শিখা দেখাতে চাই না। আমি তাপ চাই না, আলো চাই না, বিরোধ চাই না, সমন্বয় চাই, সেই আলোতে প্রতিফলিত হতে চাই—তবেই আমার আর্টের সাধনা সফল হবে, আমার জীবনে সুচারু সামঞ্জস্য ফুটে উঠবে। আমার সাংখ্য বেদান্ত পড়া মিথ্যে। আমি নিতান্তই এ যুগের মানুষ। আমার ভেতর দিয়ে সমগ্র সভ্যতার সমন্বয় হোক—আমি সমগ্র ইতিহাসের সৃষ্টি। আর্টের কাছে আমি সত্যই ঋণী।

এইমাত্র এক ব্যাপার ঘটল। খেয়ে দেয়ে শুয়েছি, হাতে গ্রন্থ রয়েছে, চোখের সামনে রমলা এসে হাজির, চোখের কোণে জল, অনুভব করতে পারলাম অশ্রুর তাপ. চেঁচিয়ে বল্লাম, 'পুড়ে যাবে যে। জ্বালা করছে না?' কলের পুতুলে যেমন ঘাড় নাড়ে সে তেমনি ঘাড় নাড়তে লাগল, আর থামেই না, ভয় হতে লাগল, মুখ ফুটে বলতে গেলাম, থাম, থামেই না, বড় কষ্ট হচ্ছিল,, হাত জোড় করতে গেলাম, হাত উঠল না·· কতক্ষণ এই চল্ল! সন্দেহ হল হয়ত রমলা মারা গেছে এবং তার আত্মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে·· কিন্তু সন্দেহের উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠল—তার আত্মা আমার সঙ্গেই বা দেখা করতে

আসবে কেন? আমি তার কে? তার পর হঠাৎ দেখি রমলা কালো হয়ে গেছে, কষ্টিপাথরের মতন কালো—হাতটা তার ভেঙ্গে গেল, তার পর গেল একটা পা, দেহ তার হেলে গেল, ঝুঁকে পড়ল খাটের ওপর, সামলে নিলে অন্য পা দিয়ে, বেশ দেখতে পেলাম। চোখ তুলে দেখলাম অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা, ভারী দুঃখ হল, মূর্তিটা যাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যায় সেজন্য বিছানা থেকে উঠে সাহায্য করতে গেলাম, পারলাম না, মূর্তিটা পড়ে গেল সশব্দে, ভাঙ্গেনি আঃ, দেখতে পেলাম ট্রাঙ্কের ধারে পড়ে রয়েছে, নিজের মন হল দুঃস্বপ্ন দেখছি, ইচ্ছাশক্তির জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম—শব্দ কানে এল গোঙানির মতন মুকুন্দ বাবু-বাবু বলে ঠেলতে লাগল, বল্লে, ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি ঘুমোইনি—কেননা চোখ আমার খোলাই ছিল। ব্যাপার এই, পাশের টেবিলের ওপর হাত পড়েছিল, বাতিদান থেকে বাতি গলে হাতে পড়েছে, হাত সরাতে গিয়ে ছোট টেবিলটা উলটে পড়েছে। যখন মুকুন্দের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছি তখনও হাতের ওপর মোম শক্ত হয় নি। অথচ মনে হয়েছিল যেন রমলা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যকারের কয়েক সেকেণ্ড স্বপ্নের কতক্ষণ!

ভাবতাম, বর্তমান নেই, ভাবতাম সূর্য ওঠে আর নামে, এইটাই সত্য, ভাবতাম সময় চলে একদমে, এক কদমে, তার ব্যতিক্রম নেই। তা নয় বোধ হয়। মহাকালকেই নিয়তি বলে এসেছি, তার হাত থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা বিফলই হয়েছে। আজ, এখন মনে হচ্ছে, কালের মধ্যে নিয়ম নেই, কারণ কাল কি বস্তু আমরা জানি না, জানি কেবল পারম্পর্য, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, বীজ হতে গাছ, গাছ থেকে ফুলফল, ফুলফল শুখিয়ে বীজ, সভ্যতার উত্থান পতন, ঋতুর পরিবর্তন—মাত্র এই টুকুই আমরা দেখে এসেছি, ধারাবাহিকতাতেই আমরা অভ্যস্ত, অতএব তাকেই দুর্নিবার ভেবেছি।

এ যেন একটা সমতল ক্ষেত্রের গতি। কিন্তু এই সমতাকে ভাঙ্গা যায়, মানুষ প্রায়ই ভাঙ্গছে অসম করছে, যেমন স্বপ্নে হল। জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষে ভাঙ্গছে নানা উপায়ে। প্রথম উপায় স্মৃতি। স্মৃতিই নিয়তির প্রধান শত্রু। রমলা বল্লে, স্মৃতি তার নেই। তার নেই হয়ত, সেই জন্য বোধ হয় তার ধারণা যে নিয়তি তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। না না, স্মৃতি তার আছে··সেই কালরাত্রির স্মৃতির জোরেই সে কালস্রোতের বিপক্ষে লড়ছে, সেই জন্যই তার দেহশ্রী অটুট রয়েছে, বয়স তার রুদ্ধ।

কিন্তু স্মৃতি নানা রকমের—এক হল জড় করা, পাশের বাড়ীর পাগলা ছেলেটা যেমন রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কাপড় কুড়িয়ে বাক্সে তুলে রাখত, সাবিত্রী যেমন সর্বদাই তার ছেলেবেলার ঘটনার উল্লেখ করত! আর এক রকমের স্মৃতি, যেমন প্রুস্তের, এই প্রকার স্মৃতি নির্বাচন করতে করতে একটা অর্থপূর্ণ সমগ্রতা সৃজন করে; নির্বাচনের মূলে থাকে অর্থ-সঙ্গতি—ধারাবাহিকতার সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই, স্রোতের সঙ্গে তুলনা হয় না, হয় গানের সঙ্গে, টানা-পোড়েনের সঙ্গে—সেই ছেলে বয়সে মা এসে ঘুমোবার আগে চুমু খাবে কি খাবে না তার আশঙ্কার বর্ণনা—তারপর দু তিন হাজার পাতা পরে, ফুটপাথের ওপর এক পা দিয়ে অন্য পা রাস্তায় রেখে সেই আশঙ্কার স্মৃতি ফুটিয়ে তোলা। এটা প্রুস্তের আঙ্গিকে। কালাতিপাতের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় আছে—যেমন ছোট্ট খাট্ট দৈনন্দিন কর্তব্য দিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তকে ভরিয়ে দেওয়া। একেই অনেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান বলেছেন। কিন্তু নিছক কর্মীর পক্ষেই ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব। অনিবার্য কি এত সহজেই পরিহার! জন্তুরাই নিছক কর্মী।

প্রুস্তের মতন বাইরের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি—তাঁর মতন আমারও শরীর খারাপ, অন্তত রমলার তাই ধারণা। স্বভাবেও মেলে—আদুরে পানায়। (বার্গসঁ-এর Time and free will-এর এক স্থানে লেখা আছে যে মিষ্টিক অবস্থায় সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু মিষ্টিসিজমের সাধনায় নিজেকে ভেঙ্গে গড়তে হয়, তা আমি পারবো না।

কালের পারম্পর্য ভেঙ্গে নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য উপায় খুঁজে পেলাম স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে। বুঝলাম সময়ের হার এক নয়, কদম এক নয়, কখনও সময় চলে দ্রুত পদক্ষেপে, কখনও ধীরে, কখনও গতি তার রুদ্ধ। গতির হার বাড়ায় কমায় ভাবগুচ্ছ, আগ্রহ ঔৎসুক্য, যাকে ভালোবাসি তার জন্য যখন প্রতীক্ষা করি তখন মনে হয় সময় যেন আর কাটতে চায় না, যখন সে এসে হাজির হয় তখন মনে হয় কোথা দিয়ে চলে গেল। সময় ছুটে চলবে না ঠায়ে চলবে নির্ভর করে আমার আগ্রহের ওপর। এখন যদি আমার অন্তরের মনোমত ভাবের তোড়া বাঁধা যায়, তা হলে নিয়তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। ভাবগুচ্ছ সময়ের নতুন সংজ্ঞা, নতুন unit তৈরী করে। নতুন টিন খুলে তামাক পাইপে ভরে টান দিচ্ছি—ধোঁয়া গোল হয়ে আসছে, এই মুহূর্তটাই আমার কাছে অনন্ত—বাইরের সময়, ঘড়ির সময় এখন দম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে—যেন মড়া; ভূমিকম্পের সময় সব দেওয়াল-ঘড়ি যেমন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

লরেন্স ঠিক বুঝেছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দৈহিক মিলনের তুলনা করা হয়েছে—তান্ত্রিকদের মতও অনেকটা ঐ ধরণের।

কিন্তু যে যাই বলুক—দৈহিক সুখ নীচুস্তরের। দেহকে ঘৃণা করি না, কিন্তু ঐ প্রকারের ক্ষণিক সুখের দ্বারা মহাকালের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এক-ধারে দেহ, অন্যধারে ব্রহ্মজ্ঞান ও তুরীয় অবস্থা, মধ্যে হয় কর্তব্য, না হয় আর্ট ও বিজ্ঞান। কর্তব্যবুদ্ধি মনের বৈশ্যবৃত্তি, বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নয়, সুবিধাজনক পদ্ধতি মাত্র, অনুভবের অনুকল্প মাত্র। কর্তব্যে আমার কিসের প্রয়োজন? আমি সামাজিক নই। কার ওপর কর্তব্য করব? আমার সমাজ নেই। নিজের ওপর কর্তব্যকে কর্তব্য বলে না। তা ছাড়া সমাজও যদি থাকে, তবু স্বরাট না হলে পরের ওপর কর্তব্য কিংবা দেশের উপকার করব কি করে? আগে গোটা মানুষ হই, তার পর সব হবে।

রমলা বলে একলা থাকতে কষ্ট হয় কেন হবে? সৃষ্টি করলে কষ্ট হয় না। অবশ্য বৈদান্তিকের মতন নিরালম্ব হওয়া যায় না। সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই-ই চাই। ভুল লিখলাম, সম্বন্ধ স্থাপন নয়, সম্বন্ধ সৃষ্টি, নতুনক্ষেত্রে। তাতে পুরানো মানুষ বাদ পড়ে, কিন্তু নতুন মানুষ তৈরী হয়। আর্টেও বস্তুসত্তাকে প্রথমে মেরে ফেলতে হয় তার পর নতুন সত্তা গড়ে তুলতে হয় নিজের ও মনের মতো। যারা যে নভেল লেখে সে বড় জোর একখানা নভেল লিখতে পারে—কিন্তু সে আর্টিস্ট হতে পারে না। বিজ্ঞানের সীমা নিয়ে এতদিন ভুল ভেবে এসেছি। বিজ্ঞানেও যে নৈতিবিচার, অর্থাৎ isolation থাকে সত্যের উদ্দেশ্য নতুন সৃষ্টি ভাবলেই চলে। এ-ক্ষেত্রে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধটিও সাদৃশ্য মূলক। তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, legend-এর সঙ্গে legend এর। স্বপ্ন সবই। সম্বন্ধই সত্য। আর সেই ভাঙা গড়ার নামই জীবন।

আজ বড় ঘুম পেয়েছে।

এই কি জীবন? জীবনে কী জানি না, জানি না কি করতে হয়। বুদ্ধির মুখে শতেক উনুনের ছাই পড়ুক। বুভুক্ষু উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিশোধের চাপ আমার কৃত্রিম শুষ্কবুদ্ধি সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। জগতের সামনে বুদ্ধির এই অভিনয়, মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা-আচরণ আর সহ্য করতে পারি না। মেকীবুদ্ধির ফেরী করতে প্রাণ আর চাইছে না। আজ, এই গভীর রাতে, নিজের কাছে আমার সত্য মূর্তি প্রকট হচ্ছে। স্থির দেখতে পাচ্ছি না…দূর আকাশে

বিদ্যুতের মতন চমকে উঠল···চোখ বড় জ্বালা করছে।

যার সংস্পর্শে আমার এই অনুভূতি হল তাকে ধন্যবাদ। শুধু ধন্যবাদ নয়, আরো কিছু তাকে দিতে চাই—তার সামনে আমার এই মূর্তি ধরতে চাই—তোমার সৃষ্টি স্বচক্ষে দ্যাখ, মা যেমন নবজাত শিশুকে সগৌরবে শিশুর পিতার সামনে ধরে। তোমার সৃষ্টির দ্বারা তোমার পূজা হোক—আমার লজ্জা অন্তর্হিত হোক আমার অভিমান অপসৃত হোক---আনন্দ আসুক।

সে কি অন্তরালে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার জন্য প্রতীক্ষা করে না? সে কি আমার অন্তরের মিথ্যার সঙ্গে যুঝছি দেখেছে? 'আমার অন্তরের শূন্য-পিঞ্জরে ডানার কিছু ঝাপটা শুনে তার চোখ কি ছলছলিয়ে ওঠে না?

তবে কি সব চেয়ে তার সৃষ্টিই মহৎ? সে চলে রাজকুমারীর মত, তার দৃষ্টিতে ফুল ফোটে, তার চরণক্ষেপে ধূলা সার্থক হয়ে ওঠে, তার স্নেহ কটাক্ষে হৃদয়কোরক উন্মুক্ত হয়। কিন্তু সবই কি তার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায়? কি অকৃতজ্ঞ! যার চিত্ত সব কৃপা। আজ পুষ্পিত হয়ে উঠল তা কি ভোলা? সবই তোমার সৃষ্টি, তবে কেন এত অমনোযোগ! নিষ্ঠুর বলি?

নিজেকে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মনে হচ্ছে। কিন্তু লজ্জাই বা কেন, কিসে?

সম্বন্ধ সৃষ্টিই যদি জীবন হয় তা হলে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রইল না ত! সমবেত জীবনকে অগ্রাহ্য করে এসেছি, অগ্রাহ্য কেন, ঘৃণাই করেছি। একত্র সৃষ্টি করার আনন্দেই যে জীবন পুষ্ট হয় বুঝি নি। সম্বন্ধেই আনন্দ। নার্সিসাসের মত নিজের মুখই দেখে এসেছি, কর্মের সোনার কাটিতে অন্তর জেগে ওঠে, শুষ্ক চিন্তাধারায় জেগে ওঠে না। জানিহ আত্মানম্--কিন্তু

Know thyself! I? And what's that for my pay?

Why, if I know myself I'd run away.

যতটা বাইরের জগৎকে জেনে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ঠিক ততটাই উদ্‌ঘাটিত হয় তার নিজত্ব, ততটাই সৃষ্ট হয় তার নতুনত্ব। আজ আশ্রমে সেবা ক'রে এই বুঝলাম।

নাত্মানমবসাদয়েৎ—এই হল রাশিয়ার মূলমন্ত্র। গ্লাডকভ্-এর সিমেণ্ট বড় ভাল লাগল।

নিজের ওপর বিশ্বাস আনবার জন্য কর্ম চাই, দৈনন্দিন কর্ম। ভেবেছিলাম কালই

গ্রামে যাবো। ফাউষ্টের মতন চাষ করতে নয়, মহামারী লেগেছে সেবা করতে। আশ্রমকর্তা বারণ করলেন, আমার কোন শিক্ষা নেই। দিন কয়েকের জন্য কাশী ত্যাগ করতে হবে। নিষ্কর্মা, সম্বন্ধচ্যুত, চিন্তাময় জীবন ভাল লাগছে না। এখানে থাকতে পারছি না। কোথাও ঘুরে আসি।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, টাঙ্গার ঘণ্টা ও শোনা যাচ্ছে না। [illegible] মনটা স্থির ও শান্ত হয়ে এল আশ্রমকর্তা ভালই বলেছেন [illegible] না দিয়ে। কেবল চিন্তাই বয়ে এনেছেন, মন অস্থির আমার [illegible] নেই। কিন্তু আমি ডিগ্রি নিয়ে কি করবো? সব [illegible] সেবা করতে পারে—যার যা কাজ [illegible] কালকাতার [illegible] পর নিজের বাড়ীতে বসে থাকছি। [illegible] কিছুই [illegible] প্রফেসারী জুটে যাবে [illegible] বিজনের সঙ্গে [illegible]। আর আমাকে যদি এত ভয়, আমি কোনো বিরক্ত করব না [illegible] কৃতজ্ঞ কেন? আমি কিছুই উপকার করিনি [illegible] স্বভাবত ওদের অথচ কাউকে না হলে চলবে না। আমি থাকব দূরে দূরে। দূরে দূরে থাকতে কষ্ট হবে, ওঁরা হয়ত কাছে আনতে চাইবেন। তখন তখনকার কথা। তখন·

কমলা দেবী আলো নিভিয়ে দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে কোন শব্দ নেই তবু মাথা জ্বালা করছে

১০

ভোর বেলাতেই কমলা দেবীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সহর [illegible] বেশ জাগ্রত, রিকশওয়ালা ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, মাথায় ভার নিয়ে [illegible] যাচ্ছে, তার পিছনে পিছনে মেছুনি ছুটছে, বাসগুলো জোরে চলছে, দূরে স্টেশনের এঞ্জিনের বাঁশী, শহরের শব্দ জট পাকিয়ে গেল যেন। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, শরীর উত্তপ্ত, স্নানের ঘরে গিয়ে কমলা দেবী কানের পাশে ও মাথায় জল দিলেন।

ক্যান ও মাথা দিয়ে তাপ বেরুতে লাগল। হেয়ার লোশন মাথায় দিলেন, চোখ জ্বালা করছিল, গোলাপজল দিতে ইচ্ছে হল না। বিছানা ঝেড়ে তার ওপর ছিটের চাদর ঢাকা দিলেন। হাতঘড়িতে তখনও ছটা বাজেনি, মনে হল ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কানের কাছে ধরে দেখলেন যে চলছে, দম দিলেন, কুরকুর শব্দ বেশ শুনতে লাগে। ঘড়িটা চমৎকার, সপ্তাহে এক মিনিটের ব্যতিক্রম হয় না, আজকাল পড়া হয় না, সময়ের তাঁর আর কিসের প্রয়োজন? ভদ্রতা রক্ষার তাঁর আর কোনো দরকার নেই, সময় কাটছে কি না দেখবার জন্তই ঘড়ি, সময় আপনি কাটে। সুজন কখন আসবে কে জানে? তার কথার দাম আছে। বিজনকে কড়া কথা শোনান ঠিক হয়েছে। ছেলে ভাল, দেখলে সুখ হয়, কথা কয় অনর্গল, ধার নেই—ভার আছে। সুজনের চরিত্রে গাম্ভীর্য্য এসেছে, বিজনের এখনও আসেনি, কখনও আসবে না, টেনিস খেলেই বেশ কাটাবে—তার পর? তার পর বিয়ে থা ক'রে সংসারী হবে—একলা থাকা তার হবে না। সুজন একলা থাকতে পারবে, তার দানা বেঁধেছে। কেনই বা মানুষ একলা থাকবে—একপায়ে সারসের মতন চঞ্চুগুঁজে নিদ্রা যাওয়া মানুষের স্বভাব নয়—কেন? পায়ের তলায় খাল বিল, না পচা পুকুর? সারসগুলো ভারি মজার দেখতে—মাছের লোভে ধার্মিক সাজে···না, সেগুলো বক। খগেনবাবুর চরিত্রে লোভ নেই, কপটতা নেই···বিজন বলছিল আছে আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার। বেশ, তাই ভাল। পুরুষ মানুষে মিন মিনে হলে ঘেন্না ধরে। বিজন ছেলে মানুষ, বোঝে না—খগেনবাবু অন্তর্মুখী, বাইরের সব ব্যাপারকে মাথার মধ্যে এনে যাচাই করতে চান, ঘটনা হয়ে যায় আইডিয়া, আইডিয়ার রীতি অনুসারে বাইরের জীবনটাকে সাজাতে চান—বাধে বিরোধ। অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজেকে ভালবাসে, উনি নিজের ভাবনা ভাবতে ভালবাসেন। বিজন তাঁকে ভুল বুঝেছে, সুজন ঠিক চিনেছে। একবার যে দেখেছে সে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারে না। সুজনকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, বিজনের মত ছেলে মানুষ নয়। সুজন খুব শ্রদ্ধাবান···মেয়েরা বোধ হয় শ্রদ্ধার উপরন্তু কিছু নিতে চায়। ওঁর কৃতজ্ঞতা কে চায়? আগে হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মন্দ লাগত না। আগে রোগীর সেবা ক'রে আত্মতৃপ্তি আসত—কই বিজনের অসুখে সে ভাব এল না ত! সব যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছে।···অসুখ হয় নি ত? ভগবান করুন, যেন সেবার কোন প্রয়োজনই না হয়। সন্ন্যাসী ঠিক বুঝেছেন—সেবার জন্ত অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়—কিছু জানে না। কিন্তু সেবা করতে মন্দ লাগবে না, ও

বাড়ীতে থাকা হবে না, মুকুন্দ মেরে ফেলবে—এখানে সুজনের মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুরা আসবে, সাহায্য করবে—রাত জাগতে তাদের কষ্ট হবে না।

সুজন সাতটার পূর্ব্বেই এসে হাজির হল। ড্রয়িংরুমে চা খেতে খেতে রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, 'বিজনের শরীর কেমন ?'

'শরীর ভাল, মন খারাপ।'

'বড় বাড়াবাড়ি করেছিল কাল।'

'এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে।'

'না, অসুখে কি মন বিকৃত হয় ? এখনও মন তৈরী হয়নি।'

'না হোক, প্রাণের প্রাচুর্য আছে।'

'তার সঙ্গে শ্রদ্ধা থাকলে মন্দ হত না।'

'এখনও ছেলে মানুষ, বয়স হয় নি, যার যা নেই তার জন্য আক্ষেপ করে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

'ঠিক বলেছ।'

'আপনি ত বিজনকে খুব ভালবাসেন জানি—অত সেবা করলেন!'

'তাকে খুব বল—অনেককেই সেবা করতাম।'

'ওর বেলা একটু পার্থক্য ছিল। আপনি যেন যমের হাত থেকে লড়াই করে ওকে ছিনিয়ে আনলেন। আপনার সেবার মধ্যে একটা কোথায় ভীষণ জোর ও দাবী ছিল। সেবা করতে ভাল লাগে না ?'

'দাবী করতে, জোর ফলাতে আর ইচ্ছা হয় না। ভাখ সুজন, আমার 'মধ্যে' বলে কোন বস্তু নেই।'

'আছে, জানেন না।'

'জানতি পারি না।'

'সত্যি বলছি, আছে।'

'বল।'

'ভাল ক'রে বলতে পারি না—খগেনবাবু থাকলে বলে দিতেন।'

'তুমি তাঁকে চেনো ?'

'ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। কাশী যাবার দিন সকালে বই-এর দোকান থেকে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। আত্মসন্ধানী, এযুগে ঐ টাইপ বিরল, তাই তাঁর প্রয়োজন বেশী।'

'কিন্তু সন্ধানের পর পৌঁছান চাই ত!'

'না হয় নাই গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলেন, না হয় নাই কিছু পেলেন—সন্ধানটাই বড়, তাঁর কাছে।'

'সকলের কাছে নয়।'

'তিনি সকল নন। এখন তিনি কাশীতে না?'

'কাশীতেই কি থাকবেন? এধার ওধার যেতেও পারেন।'

'কবে আসবেন?'

'জানি না।'

'লেখেন নি?'

'কই ওসব কথা কিছুই লেখেন নি।'

'কেমন আছেন?'

'কি করে জানব! ভালই নিশ্চয়···কেন?' সুজন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রমলা দেবীর চোখের পানে চেয়ে রইল, রমলা দেবী ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলেন। আর এক পেয়ালা চা দিয়ে তিনি উঠে গেলেন। যখন রমলা দেবী আবার ঘরে এলেন তখন তাঁর হাতে কাগজের তাড়া। সেই তাড়াটি যেন চোখে পড়েনি সুজনকে এমন ব্যবহার করতে হল। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুজন, পাইপ খাও না? বেশ দেখায়···গন্ধটা ভাল লাগে।'

'মনের দুঃখে পাইপ খাব।'

'সুজন, পড়বে?'

'এখন, এখানে?'

'বুঝিয়ে দাও—বুঝতে পারছিনা যে', রমলা দেবী ডায়েরীর খানকয়েক পাতা তুলে রাখলেন।

সুজন পড়তে লাগল—পাতার পর পাতা, পর পর নয়, এলোমেলো, অগোছাল, রমলা দেবী পিছনে দাঁড়িয়ে সঙ্গে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হবার পর সুজন মুখ তুলে চাইলে। রমলা দেবী বল্লেন, 'আরো কয়েক পাতা আছে।'

'থাক!'

'বুঝিয়ে দাও।'

'আমি কি বলব রমাদি!'

'বল না ভাই, তুমি তাঁকে বোঝ, আমি যে বুঝতে পারছি না।'

'ধর্ম হল না, বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, আর্টে তাঁর মুক্তি হবে—এই বিশ্বাস করেন।'

'সম্বন্ধ নিয়ে কি লিখেছেন ?'

'একা থাকা যায় না, সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে চান।'

'সৃষ্টি মানে কি ?'

'স্থাপন হল স্থিতির, সৃষ্টি পরিণতির। নতুন হলে সৃষ্টি হয়।'

'আর্ট মানে ছবি দেখা, গান শোনা ?'

'ঠিক তা নয়, যে আলো আর্টের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় উনি সেই আলো চাইছেন।'

'কার আলো ? আর্টিষ্টের মনের ?'

'আর্টিষ্ট যখন রচনা করে তখনকার আলো নয়, তখন শুনেছি আলোর চেয়ে ধোঁয়া ও আগুনের তাপই বেশী থাকে। ভেতরকার যে আলোয় পূর্ণ রচনা দীপ্ত হয়ে ওঠে উনি সেই আলোর কাঙ্গাল। বাজে জিনিষ পুড়ে যাবার পর যেমন কয়লা জলজল করে, সাদা রং ধরে, incandescent হয়, উনি বোধ হয় নিজে তাই হতে চান। আর্টিষ্ট, জীবনের আর্টিষ্ট, অভিজ্ঞতাগুলি উপাদান, উপকরণ। কি মনে হয় ?'

'আমি কি করে জানব ? আমার শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই।'

'দীক্ষা হয়েছে।'

'দীক্ষা হয়েছে ?'

'হাঁ...উনি বোধ হয় আধ্যাত্মিক কিছু চান।'

'কিন্তু এত কষ্ট কিসের ?'

'এযে Burning of the bush ! কষ্ট হবে না !'

'আমি সহ্য করতে পারি না, কারুর কষ্ট।'

'লিখুন না, চলে আসতে।'

'ঠিকানা জানি না।'

'তাঁর মাসীমা হয়ত জানেন।'

'কাশীতে হয়ত নেই।'

'ঠিকানা বার করা শক্ত নয়। কাশীতে গিয়ে খোঁজ করলেই হয়। যাবো ?'

'না, গিয়ে কাজ নেই—তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে না। আমারও তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে। ভদ্রলোকের বই পড়া সার্থক। তাঁকে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। দেখা হলে ধরে আনবো।'

'তিনি আসবেন না।'

'আপনার জন্যেও না?' সুজন গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপ্রস্তুতে পড়ে কথার মোড় ঘোরাতে গেল—

'আপনি সাবিত্রীর অত বন্ধু ছিলেন, বন্ধুত্বের খাতিরও আছে ত?'

'খাতির আবার কিসের? তাঁর এককালে ধারণা ছিল যে আমিই সাবিত্রীকে নষ্ট করেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ ছিল না, আমি কখনও কুপরামর্শ দিই নি, আমি তাকে ভালোবাসতেই শিখিয়েছিলাম—কি বলতে কি বলেছি, সে কি বুঝতে কি বুঝেছে, আমি চেয়েছিলাম সে যেন স্বামীকে ভালবাসে, নিজে সুখী হয়। তা সে পারল না। এর বেশী আমি ভাই কিছুই চাই নি। তোমার কাছে বলছি—স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল, সেই ঘৃণার বশে আমি হয়ত অন্যায় করে ফেলেছি—কিন্তু আমার হৃদয় যে কাঁটায় ভর্তি, আমি কি করব বল? সাবিত্রীকে শেখাবার মধ্যে আমার প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হয়ত মিশে গিয়েছিল। উনি দেখলেন আমার সেই প্রবৃত্তিটা, কিন্তু আমার অন্তরে কি ছিল আমিই জানি।'

'জানিয়ে দিতে নেই কি?'

'আমার বুঝি আত্মমর্যাদা নেই! কেন বোঝাবো? সে বুঝতে পারে না, যার অত বুদ্ধি।'

'বুদ্ধি এ বিষয়ে হয়ত নেই।'

'হয়ত কেন, নিশ্চয়ই নেই। আমি জানি। শিশু, একেবারে শিশু, সোডার বোতল খুলতে জানে না, শব্দে ভয় হয়। অসুখ করলে কি হবে? ঐ ত মুকুন্দ!'

'আত্মমর্যাদা জ্ঞানটা একটু কমিয়ে ফেল্লে তাঁর উপকার হয়।'

'এখন আর নেই।'

'তবে আমার সঙ্গে কাশী চলুন না কেন?'

'কাশী! কার জন্য? কেন?'

'এই ধরুন নিজের স্বাস্থ্যের জন্য। বিজনের অসুখ এখন সেরেছে—এবার আপনি না পড়েন ভয় করে।'

'আমার দেহের ওপর কোন মায়া নেই। কোথায় উঠব, কার সঙ্গে যাব! একলা গিয়ে যেখানে-সেখানে থাকা যায় না।'

'কেন? আমারও শরীরটা ভাল নয়, বিজনের বন্দোবস্ত করছি, আমার এক আত্মীয় আছেন—সেখানে উঠলে তাঁদের কষ্ট হবে না।'

'হয়ত, সেখানে নেই।'

'বেশত, অনিশ্চিতের পিছনে ছুটতে ভালই লাগবে! সবই কি নিশ্চিত, হাতের আমলকী?'

'কি জন্তে যাব? আমাকে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র। সে পাত্রের দূরে থাকাই ভাল, অন্তত তাতে ক্ষতি হয় না।'

'প্রয়োজন আছে। আপনাকে ভিন্ন…'

কথা বন্ধ হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য।

'তুমি খেয়ে যাও।'

'না, কাশী যাবার যোগাড় করিগে—বিজন একলা থাকবে। একটা তার করে দিই?'

'উনি বোধ হয় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন।'

'বেশীদিন তিনি বাইরে থাকতে পারবেন না।'

'তুমি তাঁকে জান না।'

'নিশ্চয়ই জানি না, কিন্তু কেমন যেন মনে লাগছে যে অল্পদিনের মধ্যে কাশী ফিরে আসবেন, যদি কোথাও গিয়ে থাকেন। কাশী দেখাটাও অন্তত হবে, মন্দ কি?'

'ধর দেখা হল, তার পর?'

'পরের কথা পরে।'

'বিরোধ কাটবে?'

'অন্তরের বিরোধ কাটবে—কিন্তু…'

'কিন্তু কি?'

'বাইরের বিরোধ কাটবে কি? সমাজ…'

'তা হলে যেতে বলছ কেন?'

'জেনে শুনে যাওয়াই ভাল, তবে তাঁর পক্ষে তাঁর অন্তরের বিরোধ সমন্বিত হলেই যথেষ্ট হল না কি? আপনার যথাসাধ্য ততটুকু করা চাই।'

'তুমি এত শিখলে কোত্থেকে—এই বয়সে?'

'দিদি বলে ডাকি বলেই কি নাবালক? এধারে বয়সের গাছ পাথর নেই যে!'

'আচ্ছা, এবার থেকে আমিই না হয় দাদা বলে ডাকব।'

'মানহানি হবে না। তা হলে দাদার কথা শুনুন।'

'শুনুন বলতে নেই ছোট বোনকে, 'শোন' বলতে হয়।'

'আমার কথা শুনুন!'

'শোন।'

'শুনুন, কাশী চলুন।'

'যাব না।'

'কেন?'

'যে কারণে তুমি 'তুমি' বলছ না—আপন করতে জানা চাই।'

'ঐ কারণটার কথাই উল্লেখ করেছিলাম। ঐটাই বাইরের বিরোধ। আপন করার মানে বুঝি তুমি বলা? তাকে পরিপূর্ণ করেই আপনার সার্থকতা—এই হল আপন করা। কৃতজ্ঞ পর্যন্ত হতে দেবার অবকাশ যেন সে না পায়।'

'নিষ্ঠুর! আচ্ছা, সু, কাউকে আপন করা যায় ঐভাবে?'

'চেষ্টা করেই দেখুন না। একমাত্র সাধনা কি বুদ্ধিরই? ভাবের সাধনা নেই বুঝি। তিনি বুদ্ধির দিক থেকে সাধনা করুন, আপনি করুন অন্য দিক দিয়ে। মিলবেন একই জায়গায়।'

'তুমি আপন করেছ?'

'কেন রমাদি, তুমি বিজন কি আমার আপন নও?'

রমলা দেবীর চোখে জল এল, 'আচ্ছা তাই যাব, কিন্তু যদি আপন না হয়?'

'আপন সম্পত্তি হবে না—না হয়েও আপন হবে—তিনি হবেন তখন তোমার সৃষ্টি।'

'তুমিই তাঁর কথা বুঝেছ, আমি বুঝিনি। বিদুষী নই।'

'বিদ্যের কথা কোথায় পেলেন? যেই মন এবং প্রাণ দিয়ে দেখবে সেই বুঝবে,, প্রত্যেকেই বোধগম্য—অবশ্য যদি ইচ্ছে না হয়, তা হলে অন্য কথা।'

'যদি আপন না করে?'

'তবু আপন হবে।'

'পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবেন, তবে বড় কষ্ট। কিন্তু আপনি বলতে হবে, পারবেন ত?'

রমলা দেবী আনতমুখে বসে রইলেন···'কাশী যাব না।'

'এইটুকুই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা—তিনি এত কষ্ট করেছেন নিজেকে বাঁধতে, আর আপনি পারবেন না?'

'শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শ্রদ্ধাই দিতে চাই না।'

'সবই না হয় দেবেন—চলুন।'

রমলা দেবী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন—'কি বলছ, সুজন!'

'তা হলে, আপনি—চিরকালই আপনি।'

'আমি যাব না।'

'আমার অনুরোধ তাঁর জন্য।'

'আমি মেয়েমানুষ নই?'

'বুঝিয়ে দেবেন চলুন—মেয়েদের ভালবাসা কি ধরণের? তাদের আপন করার পদ্ধতি অন্য রকমেরই—তাদের মানে, তাদের মধ্যে ভালোদের।'

'অর্থাৎ তাদের মধ্যে অস্বাভাবিকদের!'

'ভদ্রতা মানেই তাই! স্বভাব মানে বুঝি যেটা অধোমুখী? ঊর্ধ্বমুখী স্বভাব বুঝি স্বভাব নয়। দুইই প্রকৃতিতে আছে।'

'যদি না পারি? ভরসা দিচ্ছ ত?'

'আমি ভরসা দেবার কে রমাদি? সাবধান করে দিতে পারি? কাল বিকেল পাঁচটার সময় আসছি—তৈরী থাকবেন।' রমলা দেবী চুপ ক'রে বসে রইলেন।

১১

হাওড়া স্টেশনে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন গাড়ি ছাড়বার বিলম্ব আছে।

'ইণ্টার ক্লাসের দু'খানা সিংগল কিনো।'

'পারবেন না, ভিড়ে কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে না, তোমার গাড়িতে যাব।'

'মেয়েদের গাড়িতে ভিড় কম।'

'মেয়েদের গাড়ি বড় নোংরা, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব।'

সুজন যখন টিকিট কিনতে গেল তখন রমলা দেবী হুইলারের ষ্টল থেকে একটা ষ্ট্রাণ্ড ও লেডীজ জার্ণাল এবং এক শিশি জেনাসপিরিন কিনলেন। পাশেই একটি রেলওয়ে ফিরিঙ্গী কর্মচারী বায়স্কোপের পত্রিকা দেখছিল। রমলা দেবী একটু সরে দাঁড়ালেন, লোকটি আবার কাছে এল—তিনি কাগজ কিনে সরে এলেন, লোকটি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে লাগল। সুজন টিকিট কিনে ফিরে আসতেই রমলা দেবী প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যেতে চাইলেন—কিন্তু গেট তখনও খোলা হয়নি। প্ল্যাটফর্মের আলো জ্বলে উঠল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি অল্পবয়সী মেয়ে

নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন। মেয়েটির কোলে শিশু, 'কখন গেট খুলবে বলতে পারেন?'

'ঠিক জানি না।'

শিশুটি কেঁদে উঠল—গেট খুলে গেল। প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে পিছু হটে গাড়ি প্রবেশ করছে।

'রমাদি, মেয়েদের গাড়িতে উঠুন না।'

'তোমাদের গাড়ি খালি।'

'এখনই ভরে যাবে।'

'ভিড় হলে চলে আসব।'

ভদ্রলোক স্ত্রীলোকটিকে ইণ্টার ক্লাসের মেয়ে-গাড়িতে তুলে দিলেন। ওঠবার সময় বালতী থেকে দুধের ঘটিটা সশব্দে পড়ে গেল 'অকর্মার ধাড়ি, এখন দুধ পাবে কোথায়? গেলাবে কি?' ক্রমে ট্রেণ গেল ভরে—সুজন আবার রমলা দেবীকে মেয়ে গাড়িতে যাবার অনুরোধ করলে।

'তুমি দেখে এস, ওখানে ভিড় আছে কিনা।'

সুজন নেমে গেল। রমলা দেবীর পাশে একটি সাত আট বছরের ছেলে এসে বসল—তার পিতা স্টেশনে পায়চারী করছেন—ছেলেটি হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে দাঁত দিয়ে খুললে, তার পর এধার ওধার দেখে জুতোর তলায় শান দিলে, খানিক পরে আবার চারধার দেখে বিছানা বাঁধা দড়ির ওপর ধার পরীক্ষা করতে লাগল—রমলা দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পরীক্ষার ফল জানা হল না। গাড়িটার সামনে সেই ফিরিঙ্গী যুবক বেড়াচ্ছিল, অন্য সীটের এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন।

সুজন ফিরে এসে বল্লে, 'গাড়িতে কোন ভিড় নেই, যান না, মহিলাটি বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—বাচ্ছা ভীষণ চেঁচাচ্ছে, ভদ্রলোকটি ভীষণ বকছেন...'

সামনের সীটের ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন—'যান না, যান না, মেয়েদের গাড়িতেই ভাল—বেশ স্ফ্রী হবেন, হাত পা মেলে বসতে পাবেন, এখানে অসুবিধে হবে আপনাদের।'

রমলা দেবী এণ্ডির চাদরটা জড়িয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। রমলা দেবী সুজনকে বল্লেন, 'এইবার যাও, সারারাত বসে থাকতে হবে। খাবার কখন খাবে?'

'বর্দ্ধমানে। এরি মধ্যে খোকাকে আপন করেছেন?'

'খুকী বড় নখখি মেয়ে।'

সুজন চলে গেল—আবার ম্যাগাজিন ছুটো ও কুঁজো নিয়ে ছুটে এল।

'ও নিয়ে কি করব?'

'লেডীজ জার্ণালটা রাখুন।'

'তুমিই দেখ, কাজ রয়েছে এখানে। ব্যাণ্ডেলে কেলনারের দোকান থেকে পোয়াটাক তাজা দুধ এন।'

মহিলাটি বলে উঠলেন—'ওরা মোছলমান—হিন্দুদের দোকানে…না দরকার নেই।'

'আচ্ছা, খানিকটা জল ও একটা হরলিকস দিয়ে যেও, টিফিনক্যারিয়ার থেকে পেয়ালাপিরিচ আর চামচেটা দিও—ক্যারিয়ারটাই দিয়ে যেও, এখন নয়, যাও, গাড়ি ছাড়ল।'

গার্ড সাহেবের বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সবুজ নিশান উড়ল। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে গাড়ি ছাড়ল, খুকী ঘুমিয়েছে।

ব্যাণ্ডেলে সুজন গরম জল, হরলিকসের নতুন কৌটা ও খাবারের বাক্স এনে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল। মহিলাটি হরলিকস খুকীকে খাওয়ালেন না, বিকেলে দুধ খাইয়ে এনেছেন, এবং সারাক্ষণই খাচ্ছে—বর্ধমানেই নেমে যাবেন। বর্ধমানে গাড়ি খালি হল—মহিলাটি হরলিকসের কৌটা নিলেন না, 'দরকার নেই, বিলিতী ওষুধ খাওয়ালে খুকীর অসুখ করবে, উনি রাগ করবেন।'

সুজন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে নিলে। কুঁজো থেকে জল ঢালার সময় বাঁশী বাজল। রমলা দেবী নামতে দিলেন না—'কেউ কিছু বলবে না, গাড়িতে আমি একলা, তা ছাড়া নিয়মও আছে, কেউ এলে নেমে যেও।' অগত্যা সুজনকে বসতে হল। রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা সুজন, আপনি ছাড়া তুমি বলতে নেই কেন?'

'একটু দূরে দূরে থাকতে হয়, দূরে দূরে রাখতে হয়, নচেৎ চোখে পড়ে না। দূরে রাখাই আর্টিষ্টের সাধনা।'

'তাতে যে প্রাণে ধরে না।'

'তা হলে 'তুমি' বলবেন।'

'তুমি আমাকে 'তুমি' বল।'

সুজন অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসু নয়নে বসে রইল। রমলা দেবী বাইরে চোখ ফেরালেন। অগণিত তারা, ঐ দূরে কাল ছোট্ট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে মাঠের বুক

চিরে আগুন বেরুচ্ছে, কয়লার খনি। রমলা দেবীর হাতটা সুজনের গায়ে ঠেকল, 'বলনা সু।'

'কেন ?'

'বড় ইচ্ছে করছে কেউ আমাকে আপন ভাবুক !'

'কেউ ?'

'ধর তুমি।'

'আমি কেন ?'

'তুমি ওঁর শিষ্য, বিজন বলেছে, তাইত তুমি অত সহজে আমাকে চিনেছ।'

'ও।'

'ও' কেন ?' প্রশ্নের উত্তর এল না···রমলা দেবী চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

'তুমি বল্লে কি হয় জানেন ?'

'কি ?'

'এই যে নিজেই বল্লেন !'

'কি বল্লাম ?'

'আপন হয়ে যায়। আমি ত আপনার খুবই আপন, আপনার কত স্নেহ পেয়েছি।'

'তা নয়—কি জানি।'

গাড়ির বেগ বেশ মন্দা হয়েছে। সুজন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'এইবার নামতে হবে, গোলমাল করবে নাহলে।'

'বোসো না।'

'কোন ভয় নেই, ঠিক পাশের গাড়িতেই আছি, ডাকলেই পাবেন, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।'

'তুমিও ঘুমিও—জায়গা পেলে।'

গাড়ি থামবার পূর্বেই সুজন নেমে পড়ল। ছোট্ট স্টেশন, নীচু প্ল্যাটফর্মে সুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবী বল্লেন, 'উঠেই পড় না সুজন।'

'না রমলাদি, ডাকবেন না অমন ক'রে, আমার ঘুম পেয়েছে।'

'আমার যে ঘুম পায়নি—ভাল লাগছে না।'

'ঘুমুতে চেষ্টা করুন।'

ছাড়বার বাঁশী না বেজেই গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে তখন সুজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রমলা দেবীর মুখ দেখতে পেলে,

বাইরে চেয়ে আছেন। নিজের মুখে হাত আড়াল ক'রে একটু আস্তে বল্লে—'রমলাদি, 'তুমি' বোলো না, 'আপনি' বোলো, প্রাণ না ভরলেও। ঘুম না এলে এই চিঠিটা প'ড়ো।'

রমলা দেবী হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। হাতে করে বসে থাকবার পর খাম খুলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

সুজন বাবু,

কেবল প্রতিজ্ঞা পালন করেছি ভাবলে আমার ওপর অন্যায় করা হবে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প, তবু যেন মনে হয় কয়েক ছত্র লিখলে শান্তি পাব। আপনার সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কথা কয়েছি, কিন্তু তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সেদিন আপনাকে আমার বক্তব্য বোঝাতে পারি নি। আপনারও প্রশ্ন করা হল না, আমারও উত্তর দেওয়া হল না। যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি, এরই মধ্যে হয়ত উত্তর পাবেন। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা প্রশ্নের আধিক্যই আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে, যদিও জিজ্ঞাসার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে চিন্তাস্রোতকে বন্ধ করব না। মৈত্রী আমার কাছে এতদিন ছিল কথার কথা। রমলা দেবীকে বন্ধু হতে বলেছিলাম—তিনি রাগ করেই উঠে চলে যান। এতদিন যিনি সম্বন্ধহীন, নিরালম্ব হয়ে দিন কাটিয়েছেন তাঁকে আমি কি না দিতে গেলাম মনঃকাল্পত গুণবাচক শব্দ! শব্দ নিয়ে তিনি কি করবেন! তাই বুদ্ধিমতীর মতন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বুঝলেন যে আমার মৈত্রী অর্থহীন। তাতে আমি লজ্জিত। তখন বুঝি নি। এখন বুঝেছি। মন আমার কচি লাউ ডগার মতন ছোট ছোট তন্তু দিয়ে ওপরে উঠতে চায়। লতাতন্তু কাটলে লতাই যায় মরে। আমার লতা যাচ্ছিল মরে, আপনাদের যত্নে আমার কচি পাতা বেরিয়েছিল, আমি হয়েছিলাম সজীব—কিন্তু এখানে আপনারা নেই, কাকে আশ্রয় করে বাঁচব?

অর্থাৎ আমি এখন মৈত্রীর অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। নিরালম্ব হয়ে থাকা যায় না—আমি পারলাম না। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা ঠিক নয়। আপনি বলেছিলেন, মৈত্রী মানে ঘটকালী করা, catalysis। হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে সত্য নয়। অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনকার্যে নিজেকে নিঃশেষিত করতে পারি না। আমি কেবল সম্বন্ধের যোগ-সমষ্টিই নই। ক্যাটালিসিসের পরিবর্তন মাত্র অসম্পূর্ণ গুণাত্মক। আমার মিলনে মিলনকর্তা আছে, সেটি আমি নিজে। নিজেকে মিলনের জন্য উপযুক্ত করা চাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে মিলন

ঘটিয়ে আপনি তৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারেন কি? মিলন করতে গেলেই দেখবেন নিজেই মিলিত হচ্ছেন, কিন্তু সেটা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—কাব্য জগৎ থেকে। সমালোচকেরা বলেন শ্রেষ্ঠ কবিতার চিহ্ন তার স্বতঃস্ফূর্তি, অর্থাৎ পাঠক নিজের ইচ্ছা শক্তি না খাটিয়ে সেই কবিতা থেকে রসানুভব করতে যদি পারেন তবেই সেটা ভাল কবিতা হবে। কিন্তু লেখকের কথা ভাবুন—তাঁর লেখবার সময় কি নিজের শক্তি খরচ হয় না? লোকে ভাবে—'কবির মনে ভাব এল, ভাষার সঙ্গে মিলন হল চিন্তার, অমনি কবিতা লেখা হয়ে গেল। যে কবিতা লেখে সেই কবি- সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও এই রসচক্রের মধ্যে বাসা বাঁধলে—গড়ে উঠল মধুচক্র। যেন একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত বিনা আয়াসে রচিত হল।' তা হয় না, হয় না, অতি সহজে মিলন হয় না। জনসাধারণের কাছে মৈত্রীর অর্থ বৃত্তের মধ্যকার আন্তরিক সম্বন্ধটুকু। কিন্তু তাঁরা কি দেখেন যে আন্তরিক সম্বন্ধস্থাপনে কত কষ্ট পেতে হ —একটা লাইন মেলাতে কত রাত জাগতে হয়। জীবনটা কি বটতলার নভেল? মিলের জন্য, মিলনের জন্যও সাধনার প্রয়োজন।

ঘটক ঠাকুরের প রবার্বর্গ আছে শুনেছি। আপনার পরিবারবর্গ বিজন, রমলা দেবী—আপনি মামার ভাগ্নে, বিজনের পসতুতো ভাই, স্নেহের পাত্র, হাতে ভিখারী তাই মলা দেবীর বন্ধু কিন্তু এই সম্বন্ধস্থাপনে কি আপনার কোন কিছু ত্যাগ করতে হয় নি, সবই কি সহজে সম্পন্ন হয়েছিল? বার্থ নব তিন হাত বাঁধা, চতুর্থটি না বাঁধা পড়া পর্যন্ত আপনি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণতার সন্ধানের নামই মৈত্রীসাধনা কাবের ভাষায় crea ive unity—যেটি মনুষ্যত্বের একমাত্র তাৎপর্য। কিন্তু হলে, বাঁধা না পড়ে কি উপায় নেই? স্বাধীনতার অর্থ কি? অর্থ ঠিক কি জানি না, কখন স্বাধীন হইনি। তবে স্বাধীনতার প্রয়োজন কি বলতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি নানা কারণে কর্মে পরিণত হতে পারে না, অথচ পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। তর্কবুদ্ধির শান্তি সঙ্গতি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কর্ম পরিণত হবার সুযোগ চাই, নচেৎ অশান্তি। এই হল স্বাধীনতার প্রয়োজন।

এই প্রকার বাধাবিপত্তি বিঘ্ন প্রপঞ্চের অতিরিক্ত একপ্রকার স্বাধীনতা আছে। যেদিন কোন ব্যক্তির অনুভূতি জন্মাবে যে এই বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে একটি সনাতন শাশ্বত সত্তা আছে, এবং সেই সত্তায় তদ্গত হলেই তার জীবনের সার্থকতা, সেই মুহূর্তে সে হবে স্বাধীন, স্বরাট। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, কারণ তখন

আর বিরোধ রইল না। এই অনুভূতিতে বাইরের বাধা রইল না, যে সব বাধা উদ্দেশ্যকে পরিণত হতে না দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছিল। এই প্রকার অনুভূতি স্বপ্রমাণিত। অন্তরের বাধাও এখানে লোপ পেল, সত্যোপলব্ধির তাগিদও মিটল, বুদ্ধির বাধাও ঘুচল।

শাশ্বত সত্য আছে কি নেই প্রশ্ন উঠছে না। না থাকলেও অনুভূতি সম্ভব—কারণ মানুষের Universal এর দিকের প্রগতিটাও এক প্রকার প্রবৃত্তি। নভেলিষ্টরা সেটা ধরেন না। আমি সব রকম অনুভূতির অস্তিত্ব ও প্রয়োজন মানি না। মাত্র ঐটুকু অনুভূতির প্রয়োজন স্বীকার করি—না ক'রে উপায় নেই—অতএব তার অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া ঐ প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় কিসে? জ্যোতির্বিদ ঐ উপায় প্রথমে অবলম্বন করার পর যন্ত্র দিয়ে নতুন তারা আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু আমার সমস্যা, মাত্র স্বীকার করা নয়, অর্জন করা, অস্থায়ীকে স্থায়ী করা, পরকে আপন করা, বাহিরকে অন্তরে আনা, প্রয়োজনকে অস্তিত্বে পরিণত করা। কিন্তু আমার যে বাধা অনেক। মৈত্রী-সাধনের ফলে বাধ ঘুচবে? ধরুন আবার যদি কোলকাতায় ফিরি, কিংবা আপনারা যদি এখানে আসেন তা হলে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার অনুভূতি দৃঢ় হবে? আমার শান্তি আসবে? আমি অসম্পূর্ণ, তাই অশান্ত।

আজ বিশেষ ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। শান্তি আর সম্পূর্ণতা কি এক বস্তু? আপনিই উত্তর দিন না? আচ্ছা, রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করবেন—তাঁর কাছে আমার উত্তর বন্ধক আছে। বন্ধকটা ছাড়িয়ে নেবেন।

আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবার সপক্ষে একটা যুক্তি আছে।

মৈত্রী স্থাপনে ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হয় না, এটা জনতায় আত্মবিসর্জন নয়—সেই জন্য বৈচিত্র্যও বজায় থাকে। ভিড় আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু বন্ধুত্ব কি চাইলেই পাওয়া যায়? পূর্বে লিখেছি—পাওয়া যায় না। তবে তখনকার চাওয়া আর এখনকার চাওয়া এক নয়।

তখন পাইনি বলে আমি কাশী চলে আসি। এখনও আমি অসম্পূর্ণ, তবে অন্য ধরণের—কারণ আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই—আজ আপনাদের এখানে আসতে লিখছি। যদি সুবিধা হয় অবশ্য।

শাশ্বত অতিশয় কনকনে ঠাণ্ডা, কষ্টিপাথরের মূর্তির মতন মনে হয়। পীপ্‌

ম্যাক্সিমনের গল্প মনে আছে? এই মূর্তিকে কে প্রাণবন্ত করবে? আমার ধ্যানে যে জীবনদান সম্ভব সে জীবন ক্ষণস্থায়ী। পাথরের অন্তর থেকেও কম্পন আসা চাই, রোঁদ্যার ভাস্কর্যের মতন।

দেখুন প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি নয়। দুইই অনাদি ও অনন্ত। অতএব তাদের সম্বন্ধও অনাদি ও অনন্ত। তবু প্রকৃতি দেবীর প্রথম কম্পনের কথা কল্পনা করতে ভালো লাগে—গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বনানীর মধ্যে বনদেবতার একটি নিঃশ্বাসে পাতা-শিহরণের মতন। জাগরণ নয়, শিহরণ। জাগরণ সকলে সহ্য করতে পারে না, আমি পারব না। জাগ্রত অবস্থা বড়ই স্পষ্ট, বড়ই খোলাখুলি—ইন্দ্রিয় তখন অতি ক্রিয়াশীল।

আমি চাই সুষুপ্তি—তামসিক তন্দ্রা নয়, রাজসিক জাগরণও নয়। সেখানে সব আছে—নির্যাসের অবস্থায় ঠিক নির্যাসও নয়, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ—অন্ধ হয়ে নয়, বাইরে চোখ বুজে, তৃতীয় নেত্র খুলে। লোকে ভাবছে ঘুমুচ্ছে!

শিবঠাকুরকে আমার বড় ভাল লাগে। রবিবাবুও লাগে। বিশ্বনাথরূপে নয়, রুদ্ররূপে নয়, হরপার্বতী রূপে। নন্দলালবাবুর ছবিটা আমার বড় প্রিয়, great, great, great!

ঐ ছবিটা কি মৈত্রী সাধনের প্রতিমূর্তি নয়? কিন্তু নন্দী ভৃঙ্গী ওখানে নেই। আছে? অন্তরালে?

ইতি

খগেন্দ্রনাথ

পুঃ—রমলা দেবী কেমন আছেন? তাঁর জন্য কখনও কখনও মন ব্যস্ত হয়। তাঁর কাছে রোজ যাবেন। উত্তর জেনে লিখে পাঠাবেন।

ইণ্টার ক্লাসের ক্ষীণ আলোতে রমলা দেবী চিঠিটা পড়লেন—ক্রমেই আলো ক্ষীণ হয়ে এল, হাত স্থির থাকছে না, চিঠির লাইনগুলো নড়ছে—লেখার ওপর পর্দা পড়ে আছে···চক্‌চকে পর্দা, অভ্রের মত—গাড়িটা বড়ই দুলছে, হাতটা নড়িয়ে দিচ্ছে—সুজন তাই অত বোঝে···এঞ্জিনটা বড় হুসহুস শব্দ করছে···বোধ হয় গাড়িটা ওপরে উঠছে—চড়াই বুঝি।

সমাপ্ত